বেঁতবনে ঝড়

লবঙ্গবনে ঝড়

মণ্ডল বুক হাউস ● ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড ● কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ
জন্মাষ্টমী ১৩৬৭
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
মণ্ডল বুক হাউস
৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ শিল্পী
শ্রীগণেশ বসু
৫৯৫ নেতাজী সুভাষ রোড
হাওড়া-৪
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
ব্লক নির্মাতা
মডার্ণ প্রসেস
১৩ কলেজ রো
কলকাতা-৯
গ্রন্থন
শংকর বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
১৫/১/এ, যুগল কিশোর দাস লেন
কলকাতা-৬
মুদ্রক
রতিকান্ত ঘোষ
দি সত্যনারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ, বিধান সরণী
কলকাতা-৬

সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমসাময়িক ইতিহাস বিচার করা যেরকম দুরূহ, লেখাও সেইরকম কঠিন। ঘটনাবলী এত দ্রুতলয়ে ঘটে যেতে থাকে যে তার সঠিক কার্যকারণ নিরূপণ করা ঠিক সেই সময়ে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে এবং মানুষ সহজেই ভাবাবেগে ঘটনার প্রচারের কৌশলে এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। ইন্দোনেশিয়াও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়।

ইন্দোনেশিয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে ৩০শে সেপ্টেম্বর সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক দিন। বিশ বছর ব্যাপী ক্ষমতা অধিকারের সংগ্রাম, স্বার্থদুষ্ট উচ্চাশা, জন-সাধারণের সুখ-দুঃখ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সেইদিন হল এক ভয়াবহ এবং মর্মন্তুদ পরিণতি। এক মহান্ সংগ্রামী জাতির মৃত্যু হল সেইদিন। এই ইতিহাস এত সাম্প্রতিক, এত সমসাময়িক যে আজ পাঁচ বছর পরেও তার নিরপেক্ষ বিচার সম্ভব নয়। রহস্যময় ঘটনাবলীর প্রকৃত রূপ উন্মোচন না হওয়া পর্যন্ত যথার্থ সত্য রহস্যের কুয়াশায় অবলীন হয়েই থাকবে।

ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাস প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডির সব কটি উপাদান নিয়েই গঠিত। এই নাটকের প্রধান নায়ক হয়েছেন প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ স্বয়ং। এই নাটকে রয়েছে তাঁর সগৌরব উত্থান এবং সকরুণ পতন, আছে প্রচুর বাগাড়ম্বর, বিভিন্ন চরিত্রের প্রবেশ ও প্রস্থান, উত্তেজনাময় এবং লঘু পরিস্থিতি, বীভৎস, করুণ এবং আনন্দমুখর ঘটনা, সৎ-অসতের দ্বন্দ্ব, নাটকীয় ঘাত-সংঘাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ষড়যন্ত্র-বিপ্লব-বিদ্রোহ, রক্তপাত এবং পরিশেষে 'সত্যমেব জয়তে'র আশ্বাস।

'আমিই ইন্দোনেশিয়া'—প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের সদম্ভোক্তি হতে পারে, কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে সুকর্ণকে কেন্দ্র করেই ইন্দোনেশিয়ার সমস্ত ইতিহাস রচিত হয়েছে। এমন কোন উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে নি যার সঙ্গে সুকর্ণের যেগাযোগ নেই। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু থেকে তিনিই সর্ববিষয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছেন : তিনিই দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, তিনিই দেশকে একতাবদ্ধ করেছেন, তিনিই দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন, বিশ বছর ধরে খেয়ালখুশি মতো রাষ্ট্রপরিচালনা করেছেন এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে তিনিই স্বহস্তে দেশকে সর্বস্বান্ত করেছেন। লীয়রের মতো তিনিও পৃথিবীকে সজোরে নাড়া দিয়ে যাবার দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন।

বাক্-সর্বস্ব, অপরিণামদর্শী এবং রাষ্ট্রপরিচালনায় একান্ত অজ্ঞ সুকর্ণ নিজের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, নিজের জেদ বজায় রাখার জন্য স্বদেশ এবং স্বদেশবাসীকে বলি দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নি। নিজের কূট-কৌশলে ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস, কিন্তু সেই অতি-চাতুরীই তাঁর কাল হয়ে দাঁড়াল।

স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার জন্ম থেকেই শুরু হয়েছে ক্ষমতা-অধিকারের দ্বন্দ্ব। একদিকে কমিউনিস্ট পার্টি চেয়েছে ছলে-বলে-কৌশলে দেশের শাসন-ক্ষমতা অধিকার করতে, অপরদিকে সামরিক কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করেছে বার বার তাদের বাধা দিতে। সুকর্ণ এই দুই বিবদমান দলকে সংযত না করে পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে নিজের পদ-মর্যাদা এবং ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই ঘৃণ্য নীতির পরিণাম যা হয় তা-ই ঘটেছিল সুকর্ণের ভাগ্যে। এই দুই দলের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে সুকর্ণ যে শুধু সর্বক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হলেন তা-ই নয়, তাঁর সমস্ত গৌরব এবং মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে আমৃত্যু তাঁকে বন্দী-জীবন ভোগ করতে হয়েছিল।

এত অল্পদিনে এত রক্তপাতের ঘটনা বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাসে শোনা যায় না। সুদীর্ঘদিনব্যাপী ভিয়েৎনামের যুদ্ধে যে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় নি, তার অনেক অনেক বেশি হয়েছে ইন্দোনেশিয়ায় মাত্র কয়েক মাসে। অথচ এই রক্তপাতের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ সোচ্চার হয় নি, একটি প্রতিবাদ আন্দোলন গঠিত হয় নি—প্রতিটি দেশ, প্রতিটি জাতি পরম ঔদাসীন্যে এই হত্যাকাণ্ডকে নীরবে সহ্য করেছে।

১৯৬৫ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বরের বিদ্রোহের নেতা কারা এবং এই বিদ্রোহ কেন এবং কার বিরুদ্ধে—আপাতদৃষ্টিতে তা সর্বজনবিদিত হলেও সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। এই বিদ্রোহ সফল হলে বর্তমান বিজয়ী দলের ললাটেই এই কলঙ্কতিলক আঁকা হত। সাম্প্রতিক ইতিহাস বিজয়ীর ভাষ্যেই উজ্জ্বল হয়ে থাকে, সঠিক মূল্যায়ন হতে পারে বেশ কিছুদিন পরে, ভাবাবেগ যখন স্তিমিত হয়ে আসে। সুতরাং এই বিদ্রোহের বর্তমান ইতিহাস সত্যও নয়, সম্পূর্ণও নয়। বিজয়ী সামরিক দলে প্রবল প্রতিপক্ষ বলেই যে কমিউনিস্ট পার্টি সামরিক বাহিনীর অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করেছিল এবং এ-ও অস্বাভাবিক নয় যে সামরিক বাহিনীর একাংশের বিদ্রোহের অজুহাতে সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের চির-শত্রু কমিউনিস্ট পার্টিকে নিশ্চিহ্ন করার সুযোগের অপব্যয় করতে কার্পণ্য করে নি। সামরিক কর্তৃপক্ষ যে-রকম এই বিদ্রোহে চীনের

প্রচ্ছন্ন হাত লক্ষ্য করেছে, সামরিক কর্তৃপক্ষের এই নিষ্ঠুর কমিউনিস্ট-নিধন-যজ্ঞে আমেরিকার হাতকেও অবিশ্বাস করা যায় না।

ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ভুল করেছিল। তাদের সর্বপ্রধান ভুল হয়েছে যাদের তারা প্রতিক্রিয়াশীল বলে জানত এবং বিশ্বাস করত, তাদের সঙ্গে সাময়িক সুবিধার জন্য আপোষ করা। সুকর্ণ এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির সঙ্গে আপোষ করে মন্ত্রীসভায় যোগদান করে তারা তাদের সংগ্রামী ভূমিকা ত্যাগ করেছিল। এই ভুল তারা আর শোধরাতে পারে নি। আর ভুল করেছিল দল-বহির্ভূত জন-সাধারণের আন্দোলন-প্রবণতাতে বিশ্বাস করে। ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির যারা ছিল সমর্থক, তারাই ক্ষমতাসীন সামরিক কর্তৃপক্ষের পক্ষাবলম্বন করে কমিউনিস্ট-শিকারে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে ওঠে।

আজ ইন্দোনেশিয়ায় একটি কমিউনিস্ট নেই। অন্ততঃ ক্ষমতাসীন সামরিক কর্তৃপক্ষ একটি কমিউনিস্টও রাখতে নারাজ। আজও তাই ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট সুহারতোর নির্দেশে : যে সাধারণ নির্বাচন হবে তাতে মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী কোন লোক বা দল যোগ দিতে পারবে না। অবশ্য সামরিকবাহিনীর লোকেরও নির্বাচনে দাঁড়াবার অধিকার থাকবে না।

বন্দুকের গুঁতোয় মার্ক্সবাদকে দূরে রাখা যেতে পারে, কিন্তু অনাচার-অনাহারকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। আজ আবার এক আন্দোলন শুরু হয়েছে এবং শুরু করেছে সামরিক কর্তৃপক্ষের একদা-দক্ষিণ হস্ত ছাত্রদল। জেনারেল সুহারতোর শাসনের বিরুদ্ধেই আজ তাদের আন্দোলন : খাদ্য দাও, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ কর, কলুষতা দূর কর। এইবারে জেনারেল সুহারতোর পরীক্ষা!

'লবঙ্গবনে ঝড়' ইন্দোনেশিয়ার সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়, একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস—ইন্দোনেশিয়া তার পটভূমি। ইন্দোনেশিয়ার চিত্রময় দ্বীপগুলি আমাকে মুগ্ধ করেছে, তার ঐতিহ্য আমাকে সম্মোহিত করেছে, তার প্রাণশক্তি আমাকে বিস্মিত করেছে এবং তার আত্মক্ষয়ী রক্তাক্ত অন্তর্যুদ্ধ আমাকে বিচলিত করেছে। সেই ঘটনাগুলি গ্রথিত করেই 'লবঙ্গ বনে ঝড়'-এর-কাহিনী, তার বেশি নয়।

—ইন্দ্রজিৎ সেন

A great civilization never goes down
unless it destroys itself from within.

Arnold Toynbee.

লেখকের অন্য বই

আরব-কাঁটা ইজরায়েল

বিক্ষুব্ধ রোডেসিয়া

ফেড ইন ফেড আউট

১

এতক্ষণ সারা লাউঞ্জটা একটা মিষ্টি গন্ধে ভরে ছিল।

সিগারেটের উগ্র গন্ধে হঠাৎ চমকিয়ে উঠলাম।

তাকিয়ে দেখি টেবিলের ওপরের এ্যাশ-ট্রেতে একটা সিগারেট কখন পুড়ে ছাই হয়ে যেতে যেতে পড়ে-থাকা অন্যান্য কয়েকটা সিগারেটের শেষাংশকে অগ্নি-সংযোগ করে দিয়েছে। তারই থেকে হাল্কা একটা সাদা ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে, রেখে যাচ্ছে তামাক পোড়ার কড়া উগ্র গন্ধ। এরই জন্য এতক্ষণের সেই মিষ্টি গন্ধ এত তাড়াতাড়ি হারিয়ে গেল।

এ্যাশ-ট্রেতে একটু জল ঢেলে দিলে এই গন্ধের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, কিন্তু এক বিমর্ষ আলস্যে সারা দেহ-মন এমন ক্লান্ত, এত অবসন্ন করে ফেলেছে যে হাত বাড়িয়ে গেলাসটা ধরতেও ইচ্ছা করল না। তাকিয়ে তাকিয়ে সেই সিগারেটের টুকরোগুলোকে দগ্ধে ছাই হয়ে যেতে দেখতে লাগলাম।

সিগারেটের টুকরোগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তামাকের গন্ধও এক সময়ে কেটে গেল ; তবু সেই মিষ্টি গন্ধ আর ফিরে এল না। সে গন্ধ চিরকাল থাকবার মতোও নয়, যেমন থাকে নি এই মিষ্টি গন্ধের অধিকারিণী সিণ্টা ডেউই। সিণ্টা ডেউই বাঙলা অর্থে সীতা দেবী।

সিতি সিণ্টা বা কুমারী সীতা এসেছিল বিকেল বেলায়। সঙ্গে এসেছিল হরাতোনো। অনেকদিন আগেই সিণ্টা আমাকে কথা দিয়েছিল যে প্রথম সুযোগেই সে হরাতোনো বা তার রাতোনোর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবে। সেই কথা রাখবার জন্যই আজ তার আগমন।

জাকর্তায় এসে পৌঁছোনোর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সে রাতোনোকে নিয়ে হাজির হয়েছে।

তাদের নিয়েই কেটে গিয়েছিল কয়েক ঘণ্টা। ভাঙা মালয়ী, ভাঙা বাহাসা (ভাষা) ইন্দোনেশিয়া, ভাঙা ইংরেজি মিশিয়ে তিনজনেই আলাপ করছিলাম। সিণ্টা আর আমি এই জগা-খিচুড়ি ভাষায় অভ্যস্ত, প্রথমে অসুবিধা হচ্ছিল হরাতোনোর; কিন্তু বিশুদ্ধ বাহাসা ইন্দোনেশিয়া আমার বোধগম্যের বাইরে বুঝতে পেরে এই খেলা সে-ও মেনে নিল। ইন্দোনেশিয়া 'আদত'-এর পীঠস্থান। প্রতিটি ইন্দোনেশীয় আদতকে সবচেয়ে ওপরে স্থান দেয়। সামাজিক আদত অনুযায়ী বিদেশী বন্ধুর সুখ-সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রধান কর্তব্য। আমি একজন ভারতীয় জেনেও তাই তারা দুজনেই আমাকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছে, সৌহার্দ-জনক ব্যবহার করেছে। তবু কেমন যেন আমার মনে হয়েছিল, হরাতোনো আমার কাছ থেকে দূরত্ব রাখাতেই ব্যস্ত। মুখে হাসি ফোটালেও অন্তরে প্রীত হয় নি।

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে যেন সে আমার দিকে তাকাচ্ছিল, চোখে চোখ পড়ামাত্র বার বার সে এক অস্বস্তিতে চোখ নামিয়ে নিয়েছে। আমার শুধুই মনে হয়েছে যেন সে তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আমার মনের কথা পড়বার চেষ্টা করছে।

আমার এই ধারণা ভুলও হতে পারে। আমি জাকর্তায় তাজা-আওর্দ বা নবাগত। ইন্দোনেশিয়ার চিরাচরিত আদত অনুযায়ী সৌজন্য-প্রকাশে হরাতোনোর কোনরকম কার্পণ্য দেখি নি; কিন্তু একেবারে অপরিচিত বিদেশীর সঙ্গে প্রথম দর্শন এবং পরিচয়েই অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে ওঠাও তার পক্ষে সম্ভব হয়তো হয় নি। একটু দূরত্ব রেখে যতখানি ভদ্র এবং অন্তরঙ্গ ব্যবহার করার তা সে করেছে। আর তাছাড়া আমি যে-সময়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি তখন ভারত আর ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক সম্পর্কও তো প্রীতিকর নয়!

অথচ বছর পাঁচেক আগে এ দেশে এলে এ কথা বলবার আমার সুযোগ হত না। সেই সময়ে ভারত আর ইন্দোনেশিয়া ছিল ভাই-ভাই—হিন্দী-চিনী ভাই-ভাই-এর মত, নেহরু এবং সুকর্ণ তখন হরিহর-আত্মা। আমাকেও তখন যে-কোন ইন্দোনেশীয় ভাই বলে জড়িয়ে ধরতে দ্বিধাবোধ করত না। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখন ভারত 'নেকোলিম' (NEKOLIM), নিও-কলোনিস্ট —অবশ্য প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের মতে। সুকর্ণ এবং তাঁর 'নাসাকোম' (NASAKOM) সরকারের প্রধান সমর্থক পি. কে. আই বা কমিউনিস্ট দল সারা ইন্দোনেশিয়ায় নেকোলিম-জুজুর ভয় দেখিয়ে যাচ্ছেন। চারদিকে নেকোলিমের ষড়যন্ত্র—নাসাকোম বিপন্ন। গান্টুঙ (মুর্দাবাদ) নেকোলিম। হিতুপ (জিন্দাবাদ) নাসাকোম।

চীনের সঙ্গে ভারতের বিরোধের পর থেকেই ভারত হয়েছে নেকোলিম। তারপর ইন্দোনেশিয়া এবং সুকর্ণের মালয়সিয়ার সঙ্গে ঐতিহাসিক 'কনফ্রন্টাসি'—গঞ্জাঙ মালয়সিয়া—'মালয়সিয়া' চূর্ণ কর' অভিযান। সুকর্ণের নেতৃত্বে, সুবন্দ্রিয়োর পরিচালনায় এবং পি. কে. আই ও সামরিক কর্তৃপক্ষের অকুণ্ঠ সমর্থনে মালয়সিয়ার বিরুদ্ধে সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার গত কয়েক বছর ধরে সমর-অভিযান।

ভারতের গুরুতর অপরাধ। চীনের সঙ্গে বিরোধ তার প্রধানতম। তারপর মালয়সিয়াকে তার সমর্থন। এবং সবশেষে পাকিস্তানের ভারত-আক্রমণের যোগ্য প্রত্যুত্তর দেওয়া। পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধে ভারতকে ইন্দোনেশিয়া হয়তো ক্ষমা করতে পারত, কিন্তু চীনের সঙ্গে বিরোধ অক্ষমণীয়। তার ওপর মালয়সিয়াকে সমর্থন তো ইন্দোনেশিয়ার সম্মুখ শত্রুতা। তারই জন্য আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীসোন্ধিকে এই ইন্দোনেশিয়ায় নিগৃহীত এবং অপমানিত হতে হয়। ১৯৬২ সনের অগাস্ট মাসে এশিয়ান গেমসের ফুটবল খেলার ফাইনালে ভারতীয় দল জয়লাভ করার পর পঞ্চাশ

'হাজার ইন্দোনেশীয় দর্শকের গালাগাল, অপমান, ভীতি-প্রদর্শনে মাঠের মধ্যে থরথর করে কাঁপতে থাকে। তারই জন্য 'এয়ার ইণ্ডিয়া' অফিস ভেঙে তছনছ করে দিয়ে গিয়েছিল ইন্দোনেশিয়ার যুবকদল। তারই জন্য ভারতীয় দূতাবাসের সামনে প্রতি-নিয়ত বিক্ষোভ-মিছিল।

এই পরিস্থিতিতে ইন্দোনেশিয়ায় আমার আসাই কি সম্ভব ছিল ?
ভাগ্যেনৈতদ্ সম্ভবতি। এই বছরেরই অগাস্ট মাসে অর্থাৎ দিন কুড়ি আগে মালয়সিয়ার গাঁটছড়া খুলে সিঙ্গাপুর পৃথক হয়ে গেল। সিঙ্গাপুরের প্রধান মন্ত্রী লী কুআন ইউ মালয়সিয়ার প্রধান মন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করলেন। সুকর্ণের প্রধান শত্রু টুঙ্কু, সুতরাং সিঙ্গাপুরকে সুকর্ণ সাদরে কোল দিলেন।
আমি ছিলাম সেই সিঙ্গাপুরে।
সিঙ্গাপুরের চলচ্চিত্রশিল্পে চিত্র-পরিচালনার ব্যাপারে মাঝে মাঝেই ভারতীয়রা এসেছেন। বোম্বে থেকে গিয়েছিলেন ফণী মজুমদার, পি. এল. সন্তোষী ; বাঙলা দেশ থেকে ধীরেশ ঘোষ। আমিও সেই সূত্রে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম চিত্র-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে। ছবির কণ্ট্রাক্ট শেষ হয়ে গিয়েছিল অগাস্ট মাসে। ভারত-প্রত্যাবর্তন উদ্যোগ-পর্ব শেষ করতে করতেই মাসকাবার হয়ে গেল। এরই মাঝে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার 'কনফ্রণ্টাসি' শেষ হয়েছে—এখন ইন্দী-সিঙ্গী ভাই ভাই। সিঙ্গাপুর থেকে ইন্দোনেশিয়ায় যাতায়াতে কোন বাধা নেই।
ভারতীয় বলে আমার যে যাওয়ার কোন অসুবিধা ছিল না, তা নয়। সেইজন্যই ইন্দোনেশিয়া ঘুরে দেখার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি তার জন্য কোনরকম চেষ্টা করি নি। টাকা-পয়সার হিসাব মিটিয়ে ভবিষ্যতে আর একটি ছবি পরিচালনার আশ্বাস নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফেরবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম।

এই সময়ে একদিন সিতি সিণ্টা আমার আস্তানায় এসে হাজির হল। সঙ্গে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, দেখলেই মনে হয় চীনা। আমার পরিচালিত ছবি 'তাঞ্জঙ' (অন্তরীপ)-এর নায়িকা ছিল সিণ্টা। সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে সিণ্টা পরিচয় করিয়ে দিল। নাম, কিম উ তান। কিম 'তাঞ্জঙ' ছবিটির ইন্দোনেশিয়ায় পরিবেশনা এবং প্রদর্শনের স্বত্ব কিনে নিয়েছেন।

কিম-ই আমাকে ইন্দোনেশিয়ায় যাওয়ার নিমন্ত্রণ জানালেন।

বললেন—চলুন না আমাদের দেশে মিস্টার সেন। আপনার ছবির মুক্তির সময়ে আপনি উপস্থিত থাকলে আমরা খুব খুশি হব। ছবির পাবলিসিটিও হবে, আপনার আমাদের দেশ-দেখাও হবে। সমস্ত খরচ আমরাই বহন করব।

খরচের সমস্যা এত সহজে সমাধান হলেও সংশয় যায় নি। কিন্তু কিন্তু করেই বললাম—আপনাদের দেশ দেখার আগ্রহ আমার অনেক দিনের, কিন্তু ব্যাপারটা হয়েছে—

আমাকে চুপ করে যেতে দেখে সিণ্টা বলে উঠল—দেশে কয়েকদিন পরেই না হয় ফিরলেন, বুঙ (ভাই) সেন!

কিম প্রশ্ন করলেন—দেশে কি এখনই কোন ছবি তুলতে হবে?

উত্তর দিলাম—না। এর পরের ছবি হয়তো সিঙ্গাপুরেই করতে হবে। তার মাঝে কয়েকদিন দেশে ঘুরে আসব মনে করছি।

কিম বললেন—আমার আর একটা প্রস্তাব আছে। আমিও একটা ছবি তুলতে চাই। গল্প ঠিক করে রেখেছি—মারাঃ রুসলি'র 'সিতি নুরবায়া'। ইন্দোনেশীয় আধুনিক সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। সিতি সিণ্টা নায়িকা হতে রাজি আছে। তাছাড়া নুরবনী ইউসুফকেও একটা ভাল ভূমিকা দেওয়া যাবে। আপনি যদি এই ছবিটা পরিচালনা করেন—সিণ্টা-ই আপনার কথা আমাকে বলেছিল।

কিমের দুটো প্রস্তাবই আমাকে বিশেষ চিন্তিত করে তুলেছিল।

পরের খরচে একটি নতুন দেশ দেখা, তার ওপর একটা ছবি শেষ হতে না হতেই আর একটা ছবির কণ্ট্রাক্ট—এ লোভ ছাড়াও কঠিন; কিন্তু মুস্কিল হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার উগ্র ভারত-বৈরী মনোভাবের মধ্যে সে দেশে কোন ভারতীয়ের থাকার সমস্যা।

কথাটা বলেই ফেললাম। সিণ্টা এই সমস্যার কথা এর আগে চিন্তা করে নি, কিমও একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

তারপর কিম বললেন—এ এমন কিছু সমস্যা নয়, মিঃ সেন। আপনার সমস্ত রকম নিরাপত্তার ভার আমি নিচ্ছি। ইন্দোনেশিয়ায় যাওয়ার 'ভিসা'রও কোনরকম অসুবিধা হবে না, সব ব্যবস্থা আমি-ই করব। ব্যবসা এবং দেশের সমৃদ্ধির জন্য কোন ভারতীয় গেলে ইন্দোনেশীয় সরকার কিছু মনেও করে না। আর তাছাড়া, সব দেশেই ছেলেমেয়েরা সিনেমা-পাগল। আপনি ফিল্ম ডাইরেক্টার শুনলে লোকে আপনাকে খাতিরই করবে।

সেইদিনই নতুন ছবির চুক্তিপত্রে সই করলাম, অগ্রিম দক্ষিণাও পেলাম। তা ছাড়া কিম আমার 'ভিসা' এনে দিয়ে জাকর্তায় যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিয়ে বিদায় নিলেন।

সিণ্টার সঙ্গেই জাকর্তায় এসে উপস্থিত হয়েছি মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে। কিম সাদরে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসে তুললেন এই হোটেলে —হোটেল ইন্দোনেশিয়া।

হোটেল ইন্দোনেশিয়া।

বিশ্বাসই হবে না যে পাশ্চাত্য জগতের বাইরে দূর-প্রাচ্যের অর্থ নৈতিক বিপর্যস্ত দেশের একটি হোটেল। ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকর্তার শ্রেষ্ঠতম বিস্ময় এই চৌদ্দ-তলা হোটেলটি। জাকর্তার এক নম্বর দ্রষ্টব্য স্থান। জাকর্তার বুলেভার্ডের ওপরে দাঁড়ানো এই অপূর্ব-সজ্জিত

অপরূপ-দর্শন প্রাসাদোপম হোটেল দেখার ভিড় ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যেই শুধু সীমিত নয়, বহু বিদেশীকেও এখানে থমকিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি।

হোটেলের সামনেকার প্রশস্ত বুলেভার্ড পার হলেই 'ফ্রেণ্ডশিপ স্কোয়ার' —সুন্দর সাজানো একটি পার্ক। তার পরেই যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস। জাকর্তার সবচেয়ে অভিজাত সড়ক জালান দীপোনেগোরোর ওপরে যদিও অবস্থিত নয়, কিন্তু এই হোটেলের আভিজাত্য সমস্ত পল্লীটিকে গরিমামণ্ডিত করে তুলেছে।

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট হাজি রাদেন সুকর্ণ পাশ-করা স্থপতি, একজন Dr. Ir. ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার। রাজনৈতিক জীবনের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথে দীর্ঘদিন পরিক্রমার পর ইন্দোনেশিয়ার একমাত্র ভাগ্য-বিধাতার গৌরব-তিলক ধারণ করেও তাঁর যৌবনের স্বপ্ন তিনি ভুলতে পারেন নি। প্রথম যৌবনের যে এঞ্জিনিয়ারিং অফিস দেশপ্রেমের সুমহান্ প্রেরণায় ত্যাগ করে স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন, জীবনের প্রান্তসীমায় এসে সেই এঞ্জিনিয়ারিং-এর নিদর্শন তিনি ইন্দোনেশিয়ায় একে একে রেখে যেতে চান।

সেই স্বপ্নেরই ফল এই 'হোটেল ইন্দোনেশিয়া'। এই হোটেলে নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছে দশ কোটি টাকা, সাজাতে আরও পাঁচ কোটি— টাকা, ইন্দোনেশিয়ার 'রুপিয়া' নয়। খরচের অঙ্কটা একটু বেশিরকমেরই বেশি; কিন্তু তাতে কি হয়েছে? সমগ্র বিশ্ব-পরিক্রমা করে 'বুঙ্গ' কর্ণ দেখে এসেছেন যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতির সঙ্গে সম-মর্যাদায় দাঁড়াতে হলে চাই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হোটেল! দেশ-বিদেশের মান্য-গণ্য ব্যক্তিরা তাঁর দেশে হোটেলের সর্ববিধ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য না পেলে সহজে আসতে চাইবেন কেন? অথচ তাঁদের আনতেই হবে, আসতেই হবে; কারণ বুঙ্গ কর্ণ আর এক স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন।

সারা বিশ্ব দুটি বিরাট শক্তির প্রকোপে সন্ত্রস্ত। এই দুটি সমান্তরাল

অক্ষ-শক্তির চাপেই পৃথিবীতে এত অশান্তি, এত সংঘর্ষ,—কারণ পরস্পর বিরুদ্ধধর্মী ক্যাপিট্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট শক্তি কখনও কোনও এক বিন্দুতে এসে মিলতে পারে না। সুকর্ণের স্বপ্ন : এই দুই পরস্পর-বিরোধী শক্তিকে একটি বিন্দুতে মিলিত করা, এবং সেই শীর্ষ-বিন্দু হবে ইন্দোনেশিয়া।

সেই উৎসাহে তিনি দল-নিরপেক্ষ তৃতীয় শক্তি সংগঠনে নেহরুর সঙ্গে কলোম্বো সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন, বান্দুং সম্মেলনও সেই কারণেই, কিন্তু যে আন্তর্জাতিক দূরদৃষ্টি, বিচারবুদ্ধি এবং ঔদার্য নেহরু কিংবা টিটোর ছিল, তার অভাবেই সুকর্ণ পিছিয়ে পড়েছিলেন। নেহরুর ব্যক্তিত্ব তিনি সহ্য করতে পারেন নি বলেই শেষ পর্যন্ত তিনি ভারতবিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন।

আন্তর্জাতিক ত্রিভুজ গঠন করতে ব্যর্থ হলেও আভ্যন্তরীণ ত্রিভুজ তিনি গঠন করেছেন। এই ত্রিভুজ হয়েছে তাঁর বর্তমান মন্ত্রীসভা—NASAKOM, NAS হল Nasional, A হল Agama, Kom—হল Kommunis. জাতীয়তাবাদী, ধর্মীয় এবং কমিউনিস্ট দল নিয়ে তাঁর মন্ত্রীসভা। তাঁর প্রবর্তিত 'গাইডেড ডেমোক্রেসি'র খড়্গতলে অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দল নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। রাশিয়া ও চীন পরিভ্রমণ করে তিনি New Emerging Forces-এর আবির্ভাবে উৎসাহ-মুখর। তাদের আবাহনে সমর্পিত-প্রাণ।

সেই নব অভ্যুদিত শক্তির আবাহনের পীঠস্থান ইন্দোনেশিয়াতে প্রধান পুরোহিত সুকর্ণ বসিয়েছেন CONEFO (Conference of New Emerging Forces)র জন্য বিরাট অট্টালিকা, খরচ হয়েছে ত্রিশ কোটি। GANEFO (Games of New Emerging Forces)-এর জন্য পঁচাত্তর কোটি টাকা খরচ করে গড়ে তুলেছেন স্টেডিয়াম। সাড়ে বাইশ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় মসজিদ। মের্ডেকা স্কোয়ারের মাঝখানে ন্যাশানাল

মনুমেণ্ট নির্মাণ করতে খরচ হয়েছে পঁচিশ লাখ টাকা। তা ছাড়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পড়ে রয়েছে অর্ধ-নির্মিত প্রেস হাউস (সাংবাদিকদের আবাস), সর্বাপেক্ষা বড় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর এবং আরো অনেক বাড়ি। অর্থাভাবে শেষ হতে পারে নি।
বিদেশ থেকে ইন্দোনেশিয়া যত ঋণ পেয়েছে তার অধিকাংশ ব্যয়িত হয়েছে এইভাবে সুকর্ণের খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করতে। দেশের শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য অর্থাৎ কোনরকম উন্নয়নে লাগে নি সে টাকা। দেশের অতুল কৃষি এবং খনিজ সম্পদ অবহেলিত। চারদিকে দারিদ্র্য ও অনাহার। এই নিউ এমার্জিং ফোর্সের স্বপ্নই কি দেখেছিলেন সুকর্ণ?

পথ হারিয়ে গিয়েছিলাম। কড়া তামাকের গন্ধে পথচ্যুত হয়ে ভুলে গিয়েছিলাম সেই মিষ্টি গন্ধের কথা। হরাতোনোকে নিয়ে এসেছিল সিণ্টা। 'তাঞ্জঙ' ছবি তোলার সময়েই সিণ্টার কাছে শুনেছিলাম হরাতোনোর কথা। সিণ্টা বলী দ্বীপের হিন্দু মেয়ে, হরাতোনো যবদ্বীপের মুসলমান। ধর্মের গোঁড়ামি নেই এ দেশে। এত সুন্দরভাবে সর্বধর্মের সমন্বয় পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই। সিণ্টা আর হরাতোনোর ভালবাসায় তাই কোন পক্ষ থেকে বাধা আসে নি। অনেক আগেই তাদের বিয়ে হয়ে যেত, কিন্তু হঠাৎ দেশে এল আকাল। হরাতোনোর খেতখামার শূন্য। বিয়ে করবে কি, সংসারের অন্ন-সংস্থানের চিন্তায় সে তখন পাগল। খেত ছেড়ে হরাতোনো এল জাকর্তায় কাজের সন্ধানে। কাজ সে পেল, রূপিয়ার অঙ্ক অনেক হলেও মুদ্রাস্ফীতির জন্য তাতে তার একার সারা মাস চালানোই দায়। এইজন্যই স্কুলের শিক্ষকতা করতে সিঙ্গাপুর আসে সিণ্টা। সেখান থেকে চলে আসে চলচ্চিত্র-রাজ্যে। সিণ্টার এখন যা আয়, তাতে দুজনের সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে চলে যাওয়ার কথা; কিন্তু স্ত্রীর উপার্জনে থাকার কথায় হরাতোনোর আত্মসম্মানে ঘা লাগে। তারই ফয়সালা করতে এসেছে সিণ্টা।

হরাতোনোর এত কথা আমি সিণ্টার কাছে শুনেছি যে সে আমার প্রায় চেনা হয়ে গিয়েছিল। ছবির স্যুটিং-এর ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই সে এসে বসত আমার পাশে, আপন মনে বলে যেত হরাতোনোর কথা। কিছু কানে যেত, কিছু যেত না। পনের বছর ধরে চিত্রশিল্পে থেকে কত ছেলেমেয়ের কত মনের কথা শুনেছি, কত হা-হুতাশ চোখের জল ফেলা দেখেছি—এখন আর মনে তেমন দাগ কাটে না। প্রায়-নির্বান্ধব সিঙ্গাপুরে সিণ্টা-ই আমাকে নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতে দেয় নি। ছবির পরিচালক বলেই যে আমার ওপর তার এই সজাগ দৃষ্টি, এই পক্ষপাতিত্ব—তা নয় ; কারণ সে জানত যে সিঙ্গাপুরে এইটাই আমার প্রথম এবং শেষ ছবি। সিঙ্গাপুরে থাকার জন্য আমি আসি নি, ভারত-বর্ষের কর্মহীন কয়েকটা মাস শুধু এখানে সকর্মক হয়ে থাকা—প্রথম সুযোগেই টা-টা, বাই-বাই।

সে সুযোগও এসে গিয়েছিল। কাজের অভাবে যে-বোম্বে ছেড়ে এসেছি এই দূর-প্রাচ্যে, সিঙ্গাপুরে, সেই বোম্বে আবার ডাক দিয়েছে। এবারে লায়াজোঁ'র কাজে—মধ্য-প্রাচ্য সফরে। আরব দেশে ভারতীয় হিন্দী ছবির চাহিদা কেমন জানার জন্য মার্কেট সার্ভে, হিন্দী ছবি প্রদর্শনের প্রচার এবং প্রসার-বৃদ্ধির পরিকল্পনা—অর্থাৎ কমার্শিয়াল ভাষায় চীফ মার্কেটিং ম্যানেজার। এখানকার কাজ শেষ করেই আমার ফিরে যাওয়ার কথা।

সিঙ্গাপুরের কাজ শেষ হল, কিন্তু ফেরা হল না। আরও ছ'মাস থাকতে হবে এখন ইন্দোনেশিয়ায়। এখানকার ছবি শেষ করে মার্চ মাসে ফিরব বোম্বেতে—এ কথা জানিয়ে দিয়ে উপস্থিত হয়েছি জাকর্তায়।

হোটেলের লাউঞ্জে একা একা বসে থাকতেও কেমন তখন অস্বস্তি লাগছিল।

হোটেল ইন্দোনেশিয়ার সম্মুখের প্রশস্ত বুলেভার্ড মের্ডেকা স্কোয়ার থেকে ছুটে চলে গেছে কেবাজোরান পর্যন্ত। পথের দু-ধারে তালগাছের সারি এক অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে রেখেছে। আলোর মালায় ঝলসিয়ে উঠেছে সারাটা পথ। উদ্দাম বেগে এদিক ওদিক ছুটে চলেছে মোটর গাড়ি আর বেচা (তিনচাকার রিক্স)। এই পথে সাদো (টাঙ্গা) দেখা যায় না। বড় বড় পাসার (বাজার) বা তোকো (দোকান)-য় ভিড়, তবে বেচা-কেনা খুব কম। মনের মতো জিনিষ দেখা আর দর-দস্তুর করাই সার। ইন্দোনেশিয়ার রূপিয়াতে কিছু ছোঁয়ার উপায় নেই।

এখানে দাঁড়িয়ে দূরের এশিয়ান গেমস্ স্টেডিয়ামের ধার দিয়ে অতিকায় লবঙ্গ-পাতার আকারের ওপর দিয়ে হাই-ওয়ের আলোক-সজ্জা দেখা যাচ্ছে। এটিও এক পরম বিস্ময়। যত দূরে চোখ যায়, শুধু আলোর ছটা, শুধু কলরব—কিন্তু এই আলোর ওপারে গহন অন্ধকার, এই আনন্দ-কল্লোলের বাইরে বেদনার আর্তি—জাকর্তার বিলাস-শয্যায় শুয়ে যা দেখা যায় না, শোনা যায় না।

সেই দেশই হয়েছে প্রকৃত ইন্দোনেশিয়া।

২

ইন্দোনেশিয়া !

পৃথিবীর মানচিত্রে আর কতটুকু স্থান !

ছ-পাতা ভরানো পৃথিবী জুড়ে বড় বড় দেশ, বড় বড় নাম। খুঁজতে খুঁজতে যখন চোখ ক্লান্ত হয়ে আসে, তখন হয়তো একেবারে পূব-কিনারে মানচিত্রের নীচের দিকে এই নামটি খুঁজে পাওয়া যাবে।

দেশ তো নয়, একটি রঙীন চন্দ্রহার।

ভাল করে দেখতে হলে, ভাল করে চিনতে হলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানচিত্রটি চোখের সামনে খুলে ধরাই ভাল। ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, কাম্বোডিয়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, মালয়সিয়া, সিঙ্গাপুর, তারপর···

হ্যাঁ, তারপর ইন্দোনেশিয়া।

ভূতপূর্ব নেডারল্যাণ্ডশ্ ইণ্ডি, ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ, ইস্ট ইণ্ডিয়ান আর্চি-পেলাগো বা পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ।

এবার চন্দ্রহারের রঙ আরো উজ্জ্বল, মণি-মুক্তো-চুনী-পান্নার সংখ্যা আরো বেশি। আরো অনেকখানি জুড়ে তার বিস্তৃতি। কিন্তু তবু সম্পূর্ণ নয়। মানচিত্র এই দেশকে ধরে রাখতে পারে নি। প্রায় আট হাজার ছোট-বড় দ্বীপ নিয়ে এই ইন্দোনেশিয়া—তিনটি বিধ্বংসী ঘুর্ণীঝড় নিয়ে যার ইতিহাস। সুমাত্রা দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম কোনের ক্ষুদ্র দ্বীপ সাবাঙ থেকে একেবারে পূর্ব-প্রান্তে অস্ট্রেলিয়ান নিউ গিনির গা-ঘেঁষা মেরোকে পর্যন্ত ছড়ানো ছিটোনো শুধু দ্বীপের মিছিল, সবুজ দ্বীপের একটি রমণীয় চন্দ্রহার ;—নীল সমুদ্রের জল দিয়ে গাঁথা।

মুগ্ধ স্কট-ফিটজেরাল্ডের প্রশস্তি : Fresh, green breast of the new world.

দারুচিনি দ্বীপ। লবঙ্গ বন।

স্পাইস্ আইল্যাণ্ড। মশল্লা দ্বীপ।

ভারতবর্ষের কোল থেকে যে শান্ত সমুদ্রের নীলাম্বরী সারা মানচিত্র জুড়ে রয়েছে, তাকেই ভারত মহাসাগর বলে। এই মহাসাগর শেষ হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার দারুচিনি-লবঙ্গ-এলাচ-জায়ফল-জয়িত্রির বনের কোল ঘেঁষে।

এই পথেই একদিন দেড় হাজার বছর আগে ভারতবর্ষ থেকে প্রথম অভিযাত্রী দল এসেছিল এই দেশে। বাংলা দেশ থেকে হাজার হাজার বোহিত, নাওড়ি এই মহাসাগরের বুকে ভেসে এসে উপস্থিত হয়েছিল এই মশল্লা দ্বীপে। গুজরাত থেকে এসেছিল ব্যবসায়ীরা কাটিয়া ও নৌরি চেপে, দক্ষিণ ভারত ও কলিঙ্গ থেকে এসেছিল হাজার হাজার কপ্পল, তোনী, সঙ্গাত, কুল্ল এবং পডগু। এই বৃহত্তর ভারতে তাই উত্তর ভারতীয়েরা পরিচিত 'বাঙ্গালী' এবং দক্ষিণ ভারতীয়রা 'ক্লীঙ্গ' (কলিঙ্গ-এর অপভ্রংশ) নামে। ভারতীয়েরা আসে নি উন্মুক্ত তরবারি হাতে এই দেশ ভারতবর্ষের পদানত করে শোষণ করতে। তারা এসেছিল ধর্ম-জ্ঞান-শিল্প-সংস্কৃতি প্রচার করতে, নবলব্ধ আলোকে এই দেশকেও আলোকিত করতে। তাই আজ প্রায় দেড় হাজার বছর পরেও এই দেশের সর্বত্রই—দেশ, লোক, নদী প্রভৃতির নামে, ভাষায়, ধর্মে, সংস্কৃতিতে—ভারতীয় চিহ্ন খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। বৃহত্তর ভারত ভারতীয় ঐতিহ্যকে সহজেই আপনার করে নিয়েছে।

আবার এই পথেই একদিন আরব ব্যবসায়ী এবং ধর্ম-প্রচারকেরা এসেছিলেন এই দেশে। তাঁরাও এ দেশের অতীত সভ্যতা, ধর্ম, ইতিহাস

ও ঐতিহ্যকে আপনার করে নিয়ে এক নতুন ধর্ম, এক নতুন ঐতিহ্যের সৃষ্টি করলেন। তাঁরাও রয়ে গেলেন এই দেশে।

এই পথ দিয়েই সুবর্ণভূমি[১], হংসাবতী[২], দ্বারাবতী[৩], কম্বোজ[৪], চম্পা[৫], নগর শ্রীধর্মরাজ[৬], কটাহ দেশ[৭] থেকে দলে দলে লোক আসত সুবর্ণদ্বীপ[৮], যবদ্বীপ এবং বলী-অঙ্কে[৯]। তাদেরও অনেকে এই দেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে এখানকার অধিবাসী হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এপথে মাত্র সাড়ে তিন শ' বছর আগে এসেছিল স্পেন, ব্রিটেন এবং হল্যাণ্ড কামান-বন্দুক-সৈন্য নিয়ে। এসেছিল এই দেশকে লুণ্ঠন করতে, শোষণ করতে এবং এই দেশের নরনারীকে দাসত্বের শৃঙ্খলে চির-আবদ্ধ করে রাখতে। তারাই শুধু শেষ পর্যন্ত থাকতে পারে নি। যে পথ দিয়ে তারা এসেছিল সেই পথেই তাদের একদিন ফিরে যেতে হয়েছে—একতাবদ্ধ মৃত্যুঞ্জয়ী শৌর্যের কাছে পরাজিত হয়ে, বর্বর নরহন্তা দস্যুর কলুষ কলঙ্ক নিয়ে।

এই সেই ইন্দোনেশিয়া।

এত প্রাচীন দেশ, এত প্রাচীন সভ্যতা—অথচ এই দেশের বর্তমান নামটির বয়স এখনও একশ বছর হয় নি, মাত্র আশি'র কোঠায়। ইউরোপীয় অভিযানের পূর্বে এই সাত হাজারেরও অধিক দ্বীপাবলী পৃথক পৃথক নামে পরিচিত ছিল। বৃহদাকারের দ্বীপগুলিতে ছিল আবার একাধিক রাজ্য। সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ একত্র হয় নি কখনও, সেইজন্য সমষ্টির একটি নামেরও প্রয়োজন হয় নি।

ওলন্দাজদের অধিকারে এই সমস্ত দ্বীপ আসার পর ওলন্দাজেরা এই

১. ব্রহ্মদেশ, ২. দক্ষিণব্রহ্ম, ৩. দক্ষিণ শ্যাম, ৪. কাম্বোডিয়া ৫. কোচিন চীন, ৬. ক্রা-সংযোগ, ৭. মালয় উপদ্বীপ, ৮. সুমাত্রা, ৯. বলী-দ্বীপ।

রাজ্যের নামকরণ করল—নেডারল্যাণ্ডশ্ ইণ্ডি। ইংরাজিতে বলা হত ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ্, বাঙলায় পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। পরাধীন জাতির 'নেডারল্যাণ্ডশ্ ইণ্ডি' নামে ছিল তীব্র ঘৃণা, প্রতিমুহূর্ত নেদারল্যাণ্ডের দাস বলে তাদের স্মরণ করিয়ে দিত।

এই দেশের নামকরণ সমস্যা ইউরোপীয় মনীষী মহলেও দেখা গেল। Nederlandsche Indie কিংবা East Indian Archaepellago নাম দুটি তাঁদের কাছে এই দেশের পক্ষে সুখদ এবং সুবিধাজনক বলে মনে হল না। তখন থেকেই তাঁরা এই দ্বীপগুলির জন্য সুন্দর অথচ সর্বজনগ্রাহ্য একটি নামের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলেন। সভ্যতা এবং সংস্কৃতির দিক দিয়ে ভারতের সঙ্গে এই দ্বীপগুলির অবিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করে তাঁরা এমন একটি নাম চাইছিলেন যাতে ভারতের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে এক ওলন্দাজ মনীষী এই দ্বীপগুলির নাম রাখেন Insulindia, লাতিন ভাষায় Insul শব্দের অর্থ দ্বীপ, অর্থাৎ দ্বীপময় ভারত। এই নামটি গ্রহণের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু মতামত ধ্বনিত হল। সেই শতাব্দীরই আশির দশকে জার্মান মনীষী ব্যাস্টিয়ান শেষ পর্যন্ত এই দ্বীপগুলির নাম রাখলেন Indonesia. গ্রীকভাষায় Nesos শব্দের অর্থ দ্বীপ, Indo-nesos থেকে Indonesia অর্থাৎ দ্বীপময় ভারত। 'ইন্দোনেশিয়া' নামটিতে 'নেদারল্যাণ্ড' বা 'ডাচ' শব্দ যুক্ত না থাকাতে এই দেশের অধিবাসীদের এই নামটি গ্রহণ করতে আপত্তি হল না। সেই থেকে 'ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ' পরিচিত হয়েছে 'ইন্দোনেশিয়া' নামে।

আশ্চর্য দেশ ইন্দোনেশিয়া।

পশ্চিম প্রান্ত-দ্বীপ থেকে পূর্ব-প্রান্তসীমা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য তিন হাজার মাইল, সব শুদ্ধ সাত হাজার নশো দ্বীপ ছড়িয়ে রয়েছে। লোক-সংখ্যা প্রায় বারো কোটি—চীন, ভারত, রাশিয়া এবং আমেরিকার পরেই বিশ্ব-জনসংখ্যায় ইন্দোনেশিয়ার স্থান। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদে

এবং সৌন্দর্যে এই দেশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতে পারে।

আগ্নেয়গিরির রাজত্ব এই অঞ্চলে। সীসমোগ্রাফে প্রতিদিনই তিন চারটে ভূমিকম্পনের সংবাদ ধরা পড়ে। ওপর আকাশ দিয়ে উড়ে যেতে যেতে কালো মেঘ ভেদ করে প্রকাণ্ড বড় বড় আগ্নেয়গিরির মুখ দেখা যায়। এক যবদ্বীপেই ছ' হাজার থেকে দশ হাজার ফুট উঁচু চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশটি আগ্নেয়গিরি দেখা যায়। চোদ্দ পনেরটি তার চেয়েও উঁচু। যবদ্বীপের মেরাপি আগ্নেয়গিরি এখনও মাঝে মাঝে অগ্ন্যুৎপাৎ সৃষ্টি করে। যবদ্বীপের পূর্ব-কোনে বলী দ্বীপে গুনোঙ আগুঙ আগ্নেয়গিরির উচ্চতা দশ হাজার ফুট, গুনোঙ রিঞ্জানির উচ্চতা বারো হাজার ফুট। মাত্র কয়েক বছর আগে ১৯৬৩ সনে গুনোঙ আগুঙ অগ্নিবর্ষণ করে প্রচুর জন-ধন-সম্পদ ক্ষতি করে। দেশবাসীরা এই আগ্নেয়গিরিকে ভয় করে, কিন্তু তারই চারপাশে ভিড় করে থাকতে ভালবাসে। অগ্ন্যুৎপাতের পর জমি অনেক উর্বর হয়ে ওঠে, দরিদ্র চাষীরা সেই ক্ষেতে চাষ করে। এত খনিজ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়া এখনও পর্যন্ত কৃষি-প্রধান, এত বড় বড় অট্টালিকা থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত দরিদ্র! যন্ত্রশিল্পের প্রসার আশানুরূপ হয় নি।

পশ্চিম যবদ্বীপের বোগোর অঞ্চলে ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রায় সব সময়ে লেগেই রয়েছে। সুমাত্রার কিছু অঞ্চল, কালিমান্তান এবং পশ্চিম ইরিয়ানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত দু'শ ইঞ্চির চেয়েও বেশি এবং পদঙ তিঙ্গি বোটানিক্যাল গার্ডেনে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত—প্রায় চারশ' ইঞ্চি।

দেশময় পাহাড়-পর্বত-বন-জঙ্গল-গাছপালা-খরস্রোতা নদী। এক একটি দ্বীপকে ঘিরে উত্তাল সমুদ্র। তারই ফলে এক একটি অঞ্চলে পৃথক-পৃথক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে আদি কাল থেকে। তাদের জীবন থেকে আজও তারা মাটি, বাতাস, জল, সূর্য প্রভৃতি দূর করতে পারে নি। প্রাকৃতিক শক্তিতে তাদের বিশ্বাস আজও অটুট।

প্রায় আট হাজার দ্বীপের অধিবাসীদের পৃথক জাতি, পৃথক ভাষা, পৃথক সংস্কৃতি, পৃথক ধর্মবোধ, পৃথক আচার—তবু তারা সকলে একত্র হয়ে একটি দেশ, একটি জাতি এবং একটি ভাষায় এসে মিলিত হতে পেরেছে। এ যে কত কঠিন তা আমরা ভারতবাসীরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন প্রাক-স্বাধীনতা যুগের রাজনৈতিক নেতারা। ইন্দোনেশিয়া সরকারের 'কোর্ট অব আর্মস'-এ আঁকা পাখা মেলে দেওয়া একটি বীরদর্পী গরুড়, তার মখে গাঁথা একটি ফিতে। এই ফিতের ওপরে লেখা—"ভিন্নেকা তুঙ্গল ইকা"—বিভিন্নতার মধ্যে একতা। এই গরুড়ের বুকের একদিকে আঁকা লম্বা শিংওলা বান্তেঙ বা বন্যমহিষ—জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক, অপর দিকে একটি ওআরিঙিন গাছ—জাতীয় চেতনার প্রতীক। মধ্যস্থলের স্বর্ণ তারকা ভগবানে বিশ্বাস-এর প্রতীক।

ভিন্নেকা তুঙ্গল ইকা-ই হল ইন্দোনেশিয়ার প্রাণ-সম্পদ। সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে সমস্ত বিরোধ ফেলে এগিয়ে আসবে প্রতিবেশী। চাষ-বাস, ঘর তৈরি, সামাজিক কাজকর্মে পাশে দাঁড়ানোর জন্য আছে প্রতিবেশী। গোতোঙ রোয়ঙ বা পরস্পর সহযোগিতা তাদের ঐতিহ্যময় আদত-এর একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। যেমন যে-কোন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য মুসায়ারা—সমবেত আলাপ-আলোচনা। ভোটাধিক্যে কোন সমস্যার নিষ্পত্তি হওয়ার উপায় নেই, তাতে বিরোধ থেকেই যায়। যতক্ষণ না সকলে একমত বা মুফাকৎ বা চোচোগ-এ আসে ততক্ষণ আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে।

ইন্দোনেশিয়া মুসলমান-প্রধান দেশ। জন-সংখ্যার শতকরা নব্বই জন মুসলমান। প্রায় বারো কোটির মধ্যে দশ কোটিই হয়েছে মুসলমান।

তার পরে খৃষ্টিয়ান প্রায় পঁচাত্তর লক্ষ এবং হিন্দু পঁচিশ লক্ষ। সামান্য কিছু সংখ্যক আদিম অধিবাসীও আছে। মুসলমান-প্রধান দেশ হলেও ইন্দোনেশিয়া ঐসলামিক রাষ্ট্র নয় পাকিস্তান বা অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের মতো। ইন্দোনেশিয়া সম্পূর্ণ ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং ধর্মের বিভিন্নতা কোনদিন সাম্প্রদায়িক প্রীতি ক্ষুণ্ণ হতে দেয় নি।

তার কারণ আছে। ইন্দোনেশিয়ার আদত-এর প্রভাবে দেশবাসী এমন আচ্ছন্ন যে আদত-এর বিরোধী কোন কাজ করতে তারা পারে না। যখন যে ধর্ম এসেছে, তাকে তারা সাদরে গ্রহণ করেছে এবং নিজেদের আদতের আলোয় নিয়ে মুসায়ারার মধ্য দিয়ে নতুন করে নিয়েছে। এ দেশের ইসলাম ধর্মের সঙ্গে আরবদেশের ইসলাম ধর্মের পার্থক্য অনেক। এখানকার মুসলমানেরা সুফী-দর্শনের অনুসারী। তারা হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের অনেক আচার-অনুষ্ঠানই মেনে চলে। তারা রামায়ণ, মহাভারত পুরাণের গল্প পড়ে, ছায়া-নাটক দেখে।

তারা বলে যে সব ধর্ম এবং সমস্ত লোকের জন্ম এক জায়গা থেকে। তাদের মতে নবী আদম বিবাহ করেন বাবু কাওয়া (ঈভ)-কে। তাঁদের দুই পুত্র—নবী সিস ও সয়ঙ সিস। নবী সিস জনক হয়েছেন নবী ইব্রাহিম (আব্রাহাম), নবী নুর (নোয়া), নবী মহম্মদ এবং নবী ইসা (যিশু)-র এবং সয়ঙ সিস জনক হয়েছেন হিন্দু বৌদ্ধ আদি অপরাপরের। অতএব বিশ্বের সমস্ত জনগণ এসেছে নবী আদম থেকে। সমস্ত মানুষ তাই ভাই ভাই। সেইজন্যই দেশে ধর্মের কোন গোঁড়ামি নেই।

অবশ্য আমাদের দেশীয় রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যানের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যানের ও চরিত্রে সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের রামায়ণে পার্থক্য। লোকের মুখে মুখে এই কাহিনী যুগ যুগ ধরে চলে আসায় কারো কারো কল্পনা মিশ্রিত হয়ে নতুন রূপ গ্রহণ করেছে। তাদের

মহাভারতে গোটুৎকচা (ঘটোৎকচ) এক বিশিষ্ট চরিত্র—শক্তিমান্, সত্যবাদী, পরোপকারী। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয় চরিত্র হয়েছে এই গোটুৎকচা।

আমাদের মতো ইন্দোনেশিয়ার মহাভারত-এরও অষ্টাদশ পর্ব আজও অটুট রয়েছে। লোকমুখে আদি সংস্কৃতের বর্তমান যে-রূপ তাদের পেদণ্ড (পুরোহিত)-দের কাছ থেকে পাওয়া যায়, সেই সংস্কৃতের শ্লোকে মহাভারত-এর এই আঠারোটি পর্ব জানতে পারা যায় :

আদি সভা বন বিরাট সমোদপমাকা
ভীষণ দ্বিজ অর্কসুত শল্য গদাশ্চ সোপ্তি
স্ত্রী প্রস্তানি মুষল শান্তি তথা শ্রমণকা
স্বর্গগন্তাম অষ্টাদশ পর্ব নির্যুক্ত সংখ্যম্

অর্থাৎ,—(১) আদি (২) সভা (৩) বন (৪) বিরাট (৫) উদ্যোগ (৬) ভীষ্ম (৭) দ্বিজ (৮) অর্কসুত (কর্ণ) (৯) শল্য (১০) গদা (১১) অশ্ব (১২) সোপ্তি (১৩) স্ত্রী (১৪) প্রস্থান (১৫) মুষল (১৬) শান্তি (১৭) শ্রমণ (১৮) স্বর্গ।

আমাদের মহাভারতে

(১) আদি (২) সভা (৩) বন (৪) বিরাট (৫) উদ্যোগ (৬) ভীষ্ম (৭) দ্রোণ (৮) কর্ণ (৯) শল্য (১০) সৌপ্তিক (১১) স্ত্রী (১২) শান্তি (১৩) অনুশাসন (১৪) অশ্বমেধ (১৫) আশ্রমবাসিক (১৬) মৌষল (১৭) মহাপ্রাস্থনিক (১৮) স্বর্গারোহণ।

ইন্দোনেশিয়ার ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে রামায়ণ ও মহাভারত। তাদের ঐতিহ্যলব্ধ আদতের জন্য আজও এই দুই গ্রন্থকে সমাদরে রেখেছে। এই আদত বলে সকলকে 'প্রিয়ায়ি'র মতো আচরণ করতে। 'প্রিয়ায়ি' হয়েছে উচ্চবংশ। 'আলুস' বা সদ্গুণের প্রতিটি থাকা কর্তব্য 'প্রিয়ায়ি'র মধ্যে ; 'কসর' বা অসদ্গুণ একটুও থাকতে পারবে না। স্পষ্ট বলে অপরের মনে দুঃখ দেওয়া

প্রিয়ায়ির উচিত নয়, উচিত হবে কথাটা এড়িয়ে যাওয়া। যার জন্য বিদেশীরা ইন্দোনেশীয়দের কাছ থেকে সহজে সোজা উত্তর পান না। সুকর্ণ ইন্দোনেশীয় ঐতিহ্য রক্ষায় অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন বলেই প্রিয়ায়ি-সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা প্রথম দিন থেকে তাই করে এসেছেন। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মেলামেশার ফলে প্রিয়ায়ি-আচরণ এখন অনেক শিথিল হয়েছে। প্রয়োজন হলে দুম্ করে কড়া কথা বিদেশীকে বলতে বাধে না, তবু প্রিয়ায়ি-আচরণ সম্বন্ধে তিনি সজাগ। পুরাতন ঐতিহ্যকে আঁকড়িয়ে থাকা ভাল লাগে নি স্বাধীনতা-সংগ্রাম যুগের বীর ত্রিমূর্তি সুকর্ণ-হাত্তা-শাহরির-এর মধ্যে অন্যতম সুতান শাহরিরের। ১৯৩৫ সনে শাহরির লিখেছিলেন :

> In our country there has been no spiritual or cultural life and no intellectual progress for centuries. There are much praised art forms, but what are these except bare rudiments from a feudal culture that cannot possibly provide a dynamic fulcrum for people of the twentieth century? What can the puppet and other simple and mystical symbols offer us in a broad and intellectual sense? They are only parallels of the out-dated allegories and wisdom of medieval Europe. Our spiritual needs are needs of the twentieth century. Our inclination is no longer towards the mystical but towards reality, clarity and objectivity.

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় জীবনে আদত এবং প্রিয়ায়ি-সংস্কৃতি এমনভাবে মিশে রয়েছে যে এ দেশ ভবিষ্যতে যতই পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হোক না কেন, কোনদিন তারা তাদের এই ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি একেবারে ত্যাগ করতে পারবে না।

সাত হাজার ন'শোটি দ্বীপ নিয়ে ইন্দোনেশিয়া। তার মধ্যে তিন হাজার দ্বীপ একটু বড়, অবশিষ্ট প্রায় পাঁচ হাজার অত্যন্ত ছোট—একটা বা দুটি চাষী ঘর এবং সামান্য একটু চাষ-ভূমিতেই শেষ। বড় তিন হাজার দ্বীপও খুব বেশি বড় নয়, বেশ বড় বলতে গোটা দশেক মাত্র এবং ইন্দোনেশিয়ার জনসংখ্যা এবং সমস্ত ব্যবহার্য সম্পদ এই কটি দ্বীপেই সীমাবদ্ধ।

মালয় উপদ্বীপ এবং সিঙ্গাপুরের পরেই মালাক্কা প্রণালী। তার পরেই ইন্দোনেশিয়ার প্রথম দ্বীপ সাবাঙ। তারপর সুমাতেরা বা সুমাত্রা। জনসংখ্যা এবং আয়তনে সুমাত্রা ইন্দোনেশিয়ার দ্বিতীয় দ্বীপ। প্রায় এক লক্ষ একাশি হাজার বর্গমাইল এর ক্ষেত্রফল এবং লোকসংখ্যা এক কোটি ষাট লক্ষ।

মার্কো পোলো এই দ্বীপের নাম রেখেছিলেন ক্ষুদ্র যবদ্বীপ, যদিও যবদ্বীপ সুমাত্রার তিনভাগের চেয়েও ছোট। পশ্চিম উপকূলের সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী, মাঝে মাঝে আগ্নেয়গিরিশৃঙ্গ, মধ্যে হ্রদময় উপত্যকা—সব জড়িয়ে এত সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় খুব কম পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় হ্রদ হয়েছে তোবা—পঁয়তাল্লিশ মাইল দীর্ঘ, চারদিকে আড়াই হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের বেষ্টনী, আর প্রহরীর মতো রয়েছে নির্বাপিত আগ্নেয়গিরিশঙ্কু। এই পশ্চিম উপকূলেই প্রস্ফুটিত হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফুল—র‍্যাফলেশিয়া—তিন চার ফুট দীর্ঘ তার ব্যাস। মধ্য-সুমাত্রার অধিকাংশই গহন বন। এই বনেই পাওয়া যায় পৃথিবীর অবশিষ্ট কয়েকটি ওরাঙ-উটাঙ। গণ্ডার, বাঘ, হাতী প্রভৃতি অন্যান্য বন্য প্রাণীরও আবাস এই দুর্গম বন।

উত্তর সুমাত্রা হয়েছে কৃষি-প্রধান। রবার, তামাক, চা, ধান, 'পাম' তেল, শণ প্রভৃতির চাষ হয়। ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে সুমাত্রাতেই খনিজ

সম্পদ আহরণের ব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি। তেল এই দ্বীপের সর্বাপেক্ষা প্রধান খনিজ সম্পদ। তাছাড়া আছে সোনা এবং রূপো। সুমাত্রারই পূর্ব উপকূলে অবস্থিত বাঙ্কা এবং বিলিটোনে উৎপন্ন হয় টিন, রিও

বিভিন্ন জাতির বাস এই সুমাত্রায়। উত্তর-পশ্চিমে আচিন জাতি। ইন্দোনেশিয়াতে—এখানেই সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়। ইন্দোনেশিয়ার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এরাই সবচেয়ে রক্ষণশীল। তোবা হ্রদের চারপাশে থাকে বাতক জাতি। এদের অর্ধেক খৃষ্টিয়ান, অর্ধেক আদিম জড়োপাসক। পূর্ব উপকূলে বাস করে আর এক জাতি। এদের বলা হয় কারো বাতক। তোবা ও কারো বাতক জাতির মধ্যে আগে প্রায়ই লড়াই লেগে থাকত। বাতক জাতির দক্ষিণে বাস করে মিনাঙকাবো জাতি। অত্যন্ত শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান এরা। দক্ষিণ সুমাত্রায় লাম্পুঙ জাতির বাস।

সুমাত্রার পরেই জওয়া বা যবদ্বীপ। সুমাত্রা এবং যবদ্বীপের মাঝে অপ্রশস্ত সুন্দা প্রণালী, কালিমান্তান (বোর্ণিও) এবং যবদ্বীপের মাঝে যব-সাগর। আয়তনে পঞ্চম, কিন্তু লোক সংখ্যায় প্রথম। প্রায় পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল এর ক্ষেত্রফল, কিন্তু লোকসংখ্যা সাড়ে ছ'কোটি। একমাত্র কৃষি-নির্ভর বলেই জনসাধারণের দারিদ্র্যও বেশি কিন্তু অন্যান্য দ্বীপের চেয়ে যবদ্বীপ সব বিষয়ে উন্নীত হয়েছে বেশি। সুমাত্রার পশ্চিমকূলের পর্বতশ্রেণীর একটি শাখা দক্ষিণ যবদ্বীপের পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত চলে গিয়েছে। শতাধিক আগ্নেয়গিরি এই পর্বত-মালায়। চা, কফি, রবার, সিঙ্কোনা, কোকো, চিনি, তামাক, মিষ্টি আলু, সাগুদানা, সয়াবিন, চীনাবাদাম, ধান, এবং ভুট্টার চাষ হয়। যন্ত্রশিল্পেও এই দ্বীপ বেশ উন্নত। কাগজ, সিমেণ্ট, সিগারেট, সাবান,

কাপড়ের কল আছে। তেলের খনিও আছে। তাছাড়া ম্যাঙ্গানিজ, গন্ধক, সোনা, রূপা ও লবণ আহৃত হয়। অরণ্য-সম্পদও কম নয়, যদিও চাষের জন্য অরণ্যের আয়তন অতি অল্প।

অন্যান্য দ্বীপের মত যবদ্বীপে বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না। দিন দিন জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন জাতির মেলামেশায় জাতীয় বৈশিষ্ট্য বলতে আর কিছু নেই। সিকিভাগ সুন্দাজাতি, তারা থাকে পশ্চিম যবদ্বীপের পার্বত্য অঞ্চলে, বান্তামের চতুর্দিকে বাস বান্তাম জাতির। তাছাড়া সর্বত্রই চীনা, ভারতীয় এবং আরবের বাস।

তারপরেই বলী দ্বীপ। যবদ্বীপ আর এই দ্বীপের মাঝে অত্যন্ত অপ্রশস্ত একটি প্রণালী। বিশ লক্ষ লোকের বাস, কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য দ্বীপের চেয়ে স্বতন্ত্র। সমস্ত অধিবাসীই হিন্দু এবং বৌদ্ধ। বলী দ্বীপের পশ্চিমস্থিত লোম্বক দ্বীপেও তাই। ধান, নারকোল, আখ, তামাক, নীল, চীনাবাদাম ও কফির চাষ হয়। খনিজ সম্পদ আহরণের কোন প্রচেষ্টা হয় নি। সুমাত্রা যবদ্বীপের আগ্নেয়গিরিমালার বিস্তৃতি এই দ্বীপেও রয়েছে।

ইরিয়ান বরাট বা পশ্চিম ইরিয়ান হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব-প্রান্ত-সীমা। নিউগিনি দ্বীপের পশ্চিমাংশ হয়েছে এই পশ্চিম ইরিয়ান। এখানে আদিম পাপুআ জাতির বাস। চোদ্দ আনাই দুর্গম জঙ্গলে এবং সু-উচ্চ পর্বতমালায় পূর্ণ। নারকোল, সাগুদানা, জায়ফল, জয়িত্রির চাষ হয়। লোক সংখ্যা ন'লক্ষ, আয়তন প্রায় এক লক্ষ বাহান্ন-হাজার বর্গ মাইল। ধর্মে তারা জড়বাদী, সামান্য সংখ্যক খৃষ্টান ও মুসলমান।

মালুকু বা মোলাক্কাস দ্বীপপুঞ্জ পশ্চিম ইরিয়ান এবং মুলাওয়েসির মধ্যস্থানে অবস্থিত। সুমাত্রা, যব, বলী দ্বীপের আগ্নেয়গিরিমালা ঘুরে এসেছে এই দ্বীপপুঞ্জে। অত্যন্ত পর্বতময় এবং দুর্গম বনাবৃত এই

দ্বীপগুলি। প্রধান প্রধান দ্বীপের নাম হল হালমাহেরা, ওবি, সুলা, সেরাম, বুরু আম্বোন, তেরনাটে, তিডোর, বাঁদা, কই, আরু, তানিম্বর প্রভৃতি। বহুমূল্য মশলার জন্মভূমি। দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, জায়ফল, জয়িত্রি,চন্দনকাঠ, নারকোল, সাগুদানা, কফি প্রভৃতি রপ্তানি হয়। তেল প্রধান খনিজ সম্পদ। মুক্তা ও সুক্তিও প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। আয়তনে পঁয়ত্রিশ হাজার বর্গমাইল, লোকসংখ্যা আট লক্ষ। মালুকুতে খৃষ্টানের সংখ্যা অনেক, মুসলমান ও জড়োপাসকের সংখ্যাও কম নয়।

সুলাওয়েসি বা সেলেবিস দ্বীপটিকে দেখতে একটু অদ্ভুত ধরনের। এই দ্বীপটির যেন চারটি বাহু চারদিকে ছড়িয়ে আছে। ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে এই দ্বীপটিই সবচেয়ে পার্বত্যময় এবং অধিকাংশ দ্বীপই দুর্গম জঙ্গলে পূর্ণ। নারকোল, নারকোলের মালা, কফি, জায়ফল, জয়িত্রি, রবার, অ্যাসফাল্ট রপ্তানি হয়। লোহা, নিকেল, সোনা, তামা ও শিষে প্রচুর আছে, যদিও আহরণের তেমন ব্যবস্থা নেই। দক্ষিণ-পশ্চিম সুলাওয়েসিতে বুগিন ও মাকাসার জাতির বাস। এরা মুসলমান। মধ্য সুলাওয়েসিতে বাস করে তোরাজা জাতি। অধিকাংশ তোরাজাই খৃষ্টান, সামান্যসংখ্যক মুসলমানও আছে। উত্তর-পূর্বে বাস করে মিনহাস ও মেনাডো জাতি। এরা অধিকাংশই খৃষ্টান।

তারপর কালিমান্তান বা বোর্ণিও—সুলাওয়েসি ও সুমাত্রার অন্তর্বর্তী দ্বীপ। আয়তন দু'লক্ষ সাতাশি হাজার বর্গ মাইল, প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ লোকের বাস। সোনা, হীরে, কয়লার খনি আছে ; তেলও প্রচুর পাওয়া যায়। কাঠ, তামাক, লঙ্কা, হাতীর দাঁত এবং বিভিন্ন মশলা রপ্তানি হয়। বন্য পশুরও আবাসস্থল। পশ্চিম অঞ্চল চীনা, মালয়ী এবং বাঞ্জার জাতির বাস। বাঞ্জার ও মালয়ী জাতি মুসমলান। মধ্য কালিমান্তানে দায়াক, পুনান, কায়ান, ইবান, দুসুন, মুরুট প্রভৃতি জড়োপাসক জাতির বাস।

মানচিত্রে এই দ্বীপগুলি ঘুরে ফিরে দেখা যায়। কিন্তু বাকী হাজার হাজার দ্বীপের অস্তিত্ব কোন মানচিত্রে নেই। আর খুঁজে পাওয়া যায় না এই দ্বীপময় ভারতের অতীতের ইতিহাস। কোন সুসংবদ্ধ অতীত ইতিহাস আজ পর্যন্ত লেখা হয় নি।

সেই ইতিহাস জানতে হলে যেতে হবে এই দ্বীপগুলির অতীত ঐতিহ্যময় অঞ্চলে। যখন বর্তমানের উন্নত দেশগুলি ছিল জ্ঞান-সংস্কৃতির অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন বর্তমানের 'অনুন্নত' ইন্দোনেশিয়া সভ্যতার কোন স্তরে ছিল, তা জানতে হলে যেতে হবে যবদ্বীপে, সুমাত্রায়, বলী দ্বীপে—ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে অতীতের শিল্প-কীর্তি, লোকমুখে শুনতে হবে সুদূর অতীতের রাজন্যবর্গের শৌর্য-বীর্য-জয়-পরাজয়ের কাহিনী। তাই কুড়িয়ে কুড়িয়ে আহরণ করতে হবে ইতিহাস, যতটুকু হোক্।

৩

> আমাদের অনুন্নত যদি কেউ বলে আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করি। বলুন আমরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনুন্নত, বলুন আমরা যন্ত্রশিল্পের দিক দিয়ে অনুন্নত—তার কিছুটা সত্যতা আমি মেনে নিতে পারি। কিন্তু আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমি এ কথা সর্বতোভাবে অস্বীকার করি।
>
> —**প্রেসিডেণ্ট স্থকর্ণ**।

মধ্য-যবদ্বীপে এসে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি ধূসর স্বপ্নের মতো একটি গিরিশৃঙ্গ—মাউণ্ট মেরাপি। আকাশের গায়ে যেন এক অতিকায় মেঘ জমাট বেঁধে আছে। এই পর্বতশ্রেণী শেষ পর্যন্ত কাঁটা গাছ, নারকোল বন, ওআরিঙিন, ডুরিয়ান আর সালাক গাছের সারি ছাড়িয়ে দিগন্ত-বিস্তৃত সবুজ সমতলভূমিতে হারিয়ে গিয়েছে। চারদিকের ধানখেত, আখ-খেত, ছোট ছোট কাঁটা ফলের গাছের সীমানা পার হয়ে যে এক গিরিশৃঙ্গ সগর্বে যবদ্বীপের অতীত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করছে, তা সহজে মনে হয় না। এই মেরাপি গিরিশৃঙ্গের ছায়ার কোলে আশ্রয় নিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভাস্কর্য-বিস্ময় বোরোবুদর-এর বৌদ্ধস্তূপ। ছ'শ' বর্গফুট পরিমাপের এক বর্গক্ষেত্র এই বিরাট বৌদ্ধস্তূপের ভূমি, তারপর অল্প একটু ঢালে ধীরে ধীরে আকাশের দিকে উঠে গিয়ে এক বিরাটাকার ঘণ্টায় এসে শেষ হয়েছে।

অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি ৭৬০ থেকে ৮২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই আশ্চর্য-সুন্দর বৌদ্ধস্তূপ নির্মিত হয়। এই স্তূপের চোদ্দশ' মূর্তির মধ্যে আছে বিভিন্ন ভঙ্গীতে বুদ্ধমূর্তি, আছে শিব, মহিষ-মর্দিনী প্রভৃতি হিন্দু দেব-

দেবী মূর্তি, আর আছে আদিম যবদ্বীপবাসীদের পূজিত বিভিন্ন দেব-মূর্তি। বোরোবুদরের এই বৌদ্ধস্তূপের মধ্যেই অন্তর্নিহিত হয়ে আছে ইন্দোনেশিয়ার সেই জাদু, যা দিয়ে তারা বিভিন্ন ধর্মমতকে একত্র করে এক নতুন সার্বজনীন ধর্মে—আগামা জওয়া বা যবদ্বীপের ধর্ম—পরিণত করেছে। ইসলাম ধর্মের অনুপ্রবেশের সময় যবদ্বীপের বৌদ্ধরা এই স্তূপের পবিত্রতা রক্ষার জন্য মাটি চাপা দিয়ে রাখে।

শুধু বোরোবুদরেই নয়, শৈলেন্দ্র বংশের এই বৌদ্ধ কীর্তিকে ম্লান করার জন্য মধ্য-যবদ্বীপের স্বাধীন হিন্দু রাজারা প্রাম্বানানে এক সুন্দর মন্দির-শ্রেণী নির্মাণ করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের তিনটি বিরাট মন্দিরকে কেন্দ্র করে দেড়শ'টি বিভিন্ন দেব-দেবীর মন্দির। বোরোবুদর আর প্রাম্বানানের আগেও উত্তর যবদ্বীপের দিয়েঙ্ মালভূমিতে এখনও সমুজ্জ্বল রয়েছে সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির। ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রথম যোগসূত্র দেখা যায় এই মন্দিরগুলিতে। 'মহাভারত'-এর এক একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে এক একটি মন্দির—বীমা (ভীম), অর্জুন, নকুল, সহদেব, গটুৎকচা (ঘটোৎকচ), পাণ্ডু, অশ্চতামা (অশ্বত্থামা), আব্যাস (ব্যাসদেব), সেম্বাদ্রা (সুভদ্রা), শ্রীকান্দি (শিখণ্ডী) এবং রামায়ণের রামা আর সিণ্টা (সীতা)।

এই মন্দির এবং স্তূপ ইন্দোনেশিয়ার অতীত সভ্যতার সাক্ষী দিচ্ছে। পাশ্চাত্য দেশের চেয়েও অনেক অনেক বছর আগে যবদ্বীপে সভ্যতার আলো আসে। এই দ্বীপের অধিবাসীরা তখন এক বিচিত্র ধারায় চাষ করত এবং চাষ-আবাদকে কেন্দ্র করেই তাদের সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল। ধানখেতের কাছাকাছি শহরে নগরে তারা বসবাস করত। তাদের জীবনযাত্রার প্রণালী জানা যায় নি; কিন্তু এটুকু জানা গেছে যে তারা চাষবাস জানত, পিতল তামা সোনা প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার জানত, জোতির্বিদ্যা এবং নৌ-চালানোতেও তাদের জ্ঞান ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে গ্রাম-প্রধান নির্বাচন করে তাঁর আদেশ অনুযায়ী চলত। তাদের

সামাজিক এবং ধার্মিক আচার-ব্যবহার ধীরে ধীরে উন্নীত হয়ে শেষ পর্যন্ত এক অলিখিত সামাজিক আইনে পরিণত হয়, যাকে তারা বলত 'আদত'। এই 'আদত' সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার প্রাণ-স্বরূপ—যুগ যুগ ধরে বহির্দেশের ধর্মবিশ্বাস বা রাজনৈতিক অভিযান—হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম ধর্ম এবং সাড়ে তিনশ' বছর ধরে ওলন্দাজ আধিপত্য—এই আদত-এর ভিত্তি শিথিল করতে পারে নি এবং আজ পর্যন্তও ইন্দোনেশিয়ার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে আদত প্রাণশক্তির কাজ করে চলেছে।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সোলোর কাছাকাছি 'জাভা ম্যান' বা যবদ্বী অধিবাসীর হাড় আবিষ্কৃত হয়। এই অধিবাসীদের শেষ পর্যন্ত কি হয়েছে সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। তারা কোন রকম চিহ্ন না রেখে পৃথিবী থেকে একেবারে মুছে গেছে। শুধু সেই হাড় থেকে এইটুকু প্রমাণিত হয় যে মনুষ্যজাতির এক আদিতম জাতির জন্ম হয় এই দেশে। ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান অধিবাসীদের পূর্বপুরুষেরা যবদ্বীপীয় মানুষের বহু শতাব্দী পরে এবং যিশুখ্রীষ্টের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে এই দেশে এসে উপস্থিত হয়। তারা হল নেগ্রিটো জাতি।

আমাদের ভারতবর্ষেও অগ্নিযুগের অধিবাসীরা ছিল নেগ্রিটো জাতি, কৃষ্ণকায় ও খর্বাকার। নেগ্রিটো জাতি ছিল সভ্যতার নিম্নতম স্তরে। পূর্ব-এশিয়ায় এই সময়ে অস্ট্রিক জাতীয় লোকেরা বাস করত এবং তারা বেশ কিছুটা সভ্য এবং উন্নত হয়ে উঠেছিল। এদের এক অংশ আসামের পাহাড় ভেঙে ভারতে প্রবেশ করে, অপর অংশ ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে আশ্রয় নেয়। এই অস্ট্রিক জাতির সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার অন্য জাতির মিশ্রণে আর এক মিশ্র জাতির আবির্ভাব ঘটে।

ভারতবর্ষেও অনুরূপভাবে বিভিন্ন জাতির মিশ্রণ সংঘটিত হচ্ছিল।

পাশ্চাত্য দেশ থেকে ভারতে এসে উপস্থিত হল দ্রাবিড় জাতি। তারা চলে গেল দক্ষিণ ভারতে। উত্তর ভারতে যারা রইল তাদের সঙ্গে অস্ট্রিক জাতির মিশ্রণে এক নতুন সভ্যতার সৃষ্টি হল। তারপর ইউরোপ থেকে এল আর্যেরা। দ্রাবিড় এবং অস্ট্রিক জাতির সঙ্গে এই নবাগত আর্যদের সংঘর্ষ বাধে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর্য সভ্যতা সকলে মেনে নেয় এবং এই তিন জাতির মিশ্রণে উৎপত্তি হল এক নতুন সভ্যতা, এক নতুন জাতি, এক নতুন ধর্ম। এই জাতি হল হিন্দুজাতি, এই হল হিন্দু-ধর্ম। হিন্দুধর্ম থেকেই সৃষ্টি হল বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম।

এই আর্য-সভ্যতা শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই সীমিত হয়ে রইল না। ভারত ছেড়ে তারা দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এর আগে থেকেই ভারতের অধিবাসীরা স্থলপথে জলপথে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাতাযাত শুরু করেছিল। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় অধিবাসীরা বসবাসও কর-ছিল। এই আর্যসভ্যতা ও হিন্দুধর্মের কথা তাদের কাছে বয়ে নিয়ে এল ভারত থেকে নতুন অভিযাত্রীদল। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা হিন্দুধর্ম এবং আর্য-সভ্যতা সাদরে গ্রহণ করল। ভারত ছাড়িয়ে বৃহত্তর ভারতের সৃষ্টি হল।

পূর্ব-ভারতের বঙ্গ ও কলিঙ্গ, দক্ষিণ ভারতের মদ্রদেশ, পশ্চিম ভারতের গুজরাত থেকে দলে দলে ব্যবসায়ীরা উত্তাল সমুদ্র পার হয়ে এই নতুন ভারতে যাতায়াত শুরু করল। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নৃপতি এই অভিযানে উৎসাহিত করতে লাগলেন। ব্যবসায়ীদের অনুসরণ করল ধর্মগুরু, পুরোহিত, শিল্পী এবং পণ্ডিত সম্প্রদায়। তারপর এলেন স্বয়ং নৃপতিকুল।

যতদূর জানা যায় ৭৮ খৃষ্টাব্দে গুজরাতের এক রাজা যবদ্বীপে প্রথম হিন্দু রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ধারাবাহিক অতীত ইতিহাস পাওয়া যায় না। সুদূর অতীত গহন অন্ধকারে নিমজ্জিত, তার ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু

মানুষের নাগাল এড়িয়ে রয়েছে। তাই ওলন্দাজ মনীষী বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভ্যান লয়ের সখেদে বলেছেন :

> Whoever approaches the history of Indonesia enters into an unknown world.

বিভিন্ন শিলালিপি এবং লোকগীতি থেকে শুধু ছাড়া ছাড়া কয়েকটি কাহিনী পাওয়া যায়। খৃষ্টের জন্মের পরে চতুর্থ শতকের প্রথম ভাগে বোর্ণিও দ্বীপে মূলবর্মা নামে এক হিন্দু রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই শতকের মাঝামাঝি সময়ে পশ্চিম যবদ্বীপে তারুম রাজ্যের রাজা ছিলেন আর এক হিন্দুরাজ পূর্ণবর্মা।

খৃষ্টোত্তর চতুর্থ থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত যবদ্বীপে হিন্দুধর্মের প্রাবল্য ছিল। সমস্ত যবদ্বীপে বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা সকলেই হিন্দু। এই সময়ে মধ্য-যবদ্বীপে রাজত্ব করেন সন্নাহ, তারপর তাঁর পুত্র সঞ্জয়। পূর্ব যবদ্বীপেও দেবসিংহ এবং তাঁর পুত্র গজায়নের শাসনের কথাও জানা যায়।

কিন্তু যবদ্বীপের প্রথম গৌরবময় যুগ আসে শৈলেন্দ্রবংশীয়দের রাজত্বের সময়। এঁরা ছিলেন বৌদ্ধ। সুমাত্রা (মালায়ু) দ্বীপের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজারা প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে রাজ্যবিস্তারে উদ্যোগী হন। পশ্চিম যবদ্বীপ এঁদের করতলগত হয়। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ দ্বীপ শৈলেন্দ্রবংশীয়দের অধীনে আসে। শৈলেন্দ্রবংশীয়দের রাজধানীর নাম ছিল 'শ্রীবিজয়' বা 'শ্রীবিষয়'। শ্রীবিজয়-ই ইন্দোনেশীয় রাজ্যের মধ্যে প্রথম যার নৌবাহিনী সমগ্র ইন্দোনেশীয় সাগর জুড়ে বিদেশী শত্রুর হাত থেকে দেশীয় বণিক সম্প্রদায়কে রক্ষা করে। শ্রীবিজয়ের সেনাবাহিনী পারস্য এবং মেসোপটেমিয়াতেও যুদ্ধ করে। চীন-সম্রাটের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ সখ্যতা ছিল। ভারতের সঙ্গেও তাঁদের যোগাযোগ ছিল। ৮৯০ খৃষ্টাব্দে রাজা বলপুত্রদেব নালন্দাতে এক বৌদ্ধ-বিহার প্রতিষ্ঠা করেন।

মালায়ু বা সুমাত্রা দ্বীপের প্রবল প্রতাপান্বিত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী শৈলেন্দ্র-বংশীয়দের অধীনে পশ্চিম যবদ্বীপ আসা সত্ত্বেও যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্যধর্মই প্রবল ছিল। তার কারণ মধ্য যবদ্বীপে আর একটি পরাক্রমশালী হিন্দু রাজ্য মাতরম-ও চতুর্দিকে তার প্রভাব বিস্তার করছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রীবিজয় এবং মাতরম ছিল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই দুই রাজ্য ছিল পরস্পরের সহযোগী। মাতরমের ছিল জনবল, শ্রীবিজয়ের ছিল ঐশ্বর্য। এই দুই হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজ্য একত্র হয়ে যবদ্বীপের স্মরণীয় বোরোবুদর বৌদ্ধস্তূপ নির্মাণ করেন। এই বৌদ্ধ-স্তূপ নির্মাণের জন্য তাঁরা ভারতবর্ষ থেকে শিল্পী নিয়ে আসেন।

কিন্তু যবদ্বীপে শৈলেন্দ্রবংশীয়দের অধিকার বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। খৃষ্টোত্তর নবম শতাব্দীর প্রথমভাগেই যবদ্বীপের হিন্দুরাজারা একত্র হয়ে তাঁদের বিতাড়িত করেন। কিন্তু সুমাত্রা দ্বীপে শৈলেন্দ্রবংশীয়রা বহুদিন ধরে অখণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে শেষ পর্যন্ত সুমাত্রা যবদ্বীপের অধীনে আসে।

যবদ্বীপ থেকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী শৈলেন্দ্রবংশীয়দের বিতাড়নের পর আবার ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রবল হয়ে ওঠে। এই সময় মধ্য-যবদ্বীপে প্রাম্বানান রাজ্য ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। বোরোবুদরের বৌদ্ধস্তূপের কীর্তিকে ম্লান করার জন্য প্রাম্বানানে বিরাট মন্দিরশ্রেণী নির্মিত হয়।

কিন্তু যবদ্বীপে কোন রাজ্যই বহুদিন প্রবল শক্তিধর হয়ে থাকতে পারে নি। এক এক অঞ্চল এক এক সময়ে প্রভুত্ব করেছে। অষ্টম শতাব্দীতে ভীষণ প্রবল ছিল পশ্চিমাঞ্চল (শ্রীবিজয়), নবম শতাব্দীতে মধ্যাঞ্চল (মাতরম ও প্রাম্বানান), দশম শতাব্দীতে প্রভুত্ব চলে এল পূর্বাঞ্চলে। পূর্বযবদ্বীপ প্রায় পাঁচ শতাব্দী ধরে যবদ্বীপে প্রভুত্ব করে। এই সময়ের মধ্যে তিনটি প্রবল পরাক্রমশালী রাজবংশের অভ্যুত্থান এবং পতন হয়। ১০০০ থেকে ১২২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শক্তিশালী ছিল কেদিরি, তারপর ১২২০ থেকে ১২৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সিংহসারি এবং সবশেষে ১২৯২

থেকে ১৫২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মজপহিৎ। মজপহিতের পতনের সঙ্গে সঙ্গে যবদ্বীপে হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের অবসান হয়।

৯৩০ খৃষ্টাব্দে পূর্ব যবদ্বীপে রাজা সিন্দোক এক রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। সিন্দোকের এক মেয়ের বিবাহ হয় বলী-রাজ উদয়নের সঙ্গে। উদয়নের পুত্র এর্লঙ্গ বিবাহ করেন যবদ্বীপের (কেদিরি) রাজা ধর্মবংশের মেয়েকে। ধর্মবংশ পশ্চিম-যবদ্বীপের রাজাদের নিকট পরাজিত এবং নিহত হন, কিন্তু এর্লঙ্গ বলীদ্বীপ থেকে সসৈন্যে এসে শত্রুদের পরাস্ত করে কেদিরির রাজা হন। এই ধর্মবংশ সংস্কৃত মহাভারত যবদ্বীপীয় ভাষায় অনুদিত করেন। এই যবদ্বীপের শেষ ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন জয়াভয়। রাজা জয়াভয় ইন্দোনেশিয়া সম্বন্ধে এক ভবিষ্যদ্বাণী করেন, যা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়। তিনি বলেছিলেন: 'এক শ্বেত মহিষ (ওলন্দাজ) যবদ্বীপে বহুদিন ধরে শাসন করবে, তাদের বিতাড়িত করবে পীত বানর (জাপান) কিন্তু তাদের অধিকার থাকবে মাত্র একটি ফসলের আয়ুষ্কাল; এরপর কিছুদিন অরাজকতার পর যবদ্বীপ আবার তার অধিবাসীদের হাতে ফিরে আসবে।'

কেদিরির পতনের পর ক্ষমতায় আসে সিংহসারি। সিংহসারির প্রথম রাজা রঙ্গরাজস। অত্যন্ত দরিদ্র কৃষকবংশে তাঁর জন্ম। যৌবনে একদল লোক সংগ্রহ করে তিনি চুরি-ডাকাতি-খুন-জখম করে সেই অঞ্চলে ত্রাসের সঞ্চার করেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সিংহসারির অধীশ্বর হন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন চতুর্থরাজ বিষ্ণুবর্ধন। তিনি যবদ্বীপের অধিকাংশ নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর প্রতাপের কাহিনী ভারতবর্ষ এবং চীন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সিংহসারির শেষ রাজা ছিলেন কৃতনগর। তিনি সুমাত্রা-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সসৈন্যে সুমাত্রায় অবতরণ করেন। সেই সুযোগে তাঁর প্রধানমন্ত্রী বীররাজ বিদ্রোহ ঘোষণা করে সিংহসারি নিজের অধিকারে আনেন। চীন-সম্রাট

কুবলাই খানও এই সময়ে যবদ্বীপ আক্রমণ করেন। সুমাত্রা-অভিযান বন্ধ করে কৃতনগর বীররাজ এবং কুবলাই খানের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন কিন্তু যুদ্ধে তিনি পরাস্ত ও নিহত হন। কিন্তু তাঁর জামাতা রাদেন বিজয় সংগ্রাম চালিয়ে যান এবং ১২৯২ খৃষ্টাব্দে বীররাজ ও কুবলাই খানকে পরাজিত করে সিংহসারির রাজা হন, কিন্তু রাজা হয়ে রাজ্যের নাম পরিবর্তন করে মজপহিৎ রাখেন এবং নিজে কৃতরাজস জয়বর্ধন নামে অভিষিক্ত হন।

কৃতরাজস জয়বর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জয়নগর রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র হায়াম বুরুক রাজা হন। নাবালকের অভিভাবিকা হিসেবে রাজকার্য পরিচালনা করতেন রাজবংশীয়া দুই মহিলা—গায়ত্রী দেবী আর ত্রিভুবন দেবী সুহিতা। এঁরা এক অতি বিচক্ষণ ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী করেন। তাঁর নাম গজমদ। গজমদের অক্লান্ত পরিশ্রমে মজপহিৎ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সর্বশক্তিমান হয়ে ওঠে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে সমস্ত দ্বীপ তিনি মজপহিতের অধিকারে আনবেন। সেইজন্য চতুর্দিকে তিনি যুদ্ধজাহাজ আর সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। ১৩৩৩ থেকে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মালায়ু (সুমাত্রা) এবং ইরিয়ান (নিউগিনি) ব্যতীত সমস্ত দ্বীপ মজপহিতের অধীনে আনেন। তবে মালায়ুতে তিনি প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ধ্বংস করে আদিত্যবর্মন নামে এক নতুন রাজাকে অভিষিক্ত করেন। আদিত্যবর্মন কিছুদিন পরেই স্বাধীনতা ঘোষণা করে মিনাঙকাবাউ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

১৩৫০ সনে হায়াম বুরুক রাজসনগর নাম নিয়ে নিজে মজপহিতের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি মিনাঙকাবাউ রাজ্য ধূলিস্যাৎ করে সমগ্র মালাউ (সুমাত্রা) মজপহিতের অধীনে আনেন। ১৩৬৪ সনে গজমদের মৃত্যু হয়, কিন্তু তিনি তাঁর স্বপ্ন সফল হতে দেখে গিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে বিজিত দ্বীপগুলিতে হিন্দুধর্ম এবং সভ্যতা

বিস্তার লাভ করে। এই সময় মজপহিতের সঙ্গে চীন, চম্পা (ভিয়েৎনাম), কম্বোজ (কাম্বোডিয়া) এবং দ্বারাবতীর (শ্যামদেশ) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

রাজসনগরের মৃত্যুর পর থেকেই মজপহিৎ রাজ্যে ভাঙ্গন ধরে। চীন-সম্রাট মজপহিতের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতায় শঙ্কিত হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই দুর্যোগের সুযোগে উত্তর যবদ্বীপের করদ রাজ্যগুলিও মজপহিতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং চীন-সম্রাটের সাহায্য ভিক্ষা করে তাঁকে কর দিতে লাগল। চীন-সম্রাট তাদের সাহায্যে অবতীর্ণ হলেন। এই ক্ষুদ্ররাজ্যগুলি চীনের সহায়তায় স্বাধীনতা লাভ করে।

বিপদ চতুর্দিক দিয়ে আসে। এই দুর্যোগের মাঝে আর এক শত্রুর আবির্ভাব হল। তারা হল আরব।

আরবেরা চিরকাল ব্যবসায়ী জাতি। আদি যুগে তাদের ব্যবসা সীমাবদ্ধ ছিল মিশর এবং ভারতের সঙ্গে। কিন্তু কালক্রমে এই ব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামল গ্রীক আর রোমানরা। এই দুই ইউরোপীয় নৌশক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়ে তারা ভারত ছেড়ে আরো পূর্বদিকে দক্ষিণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে বাণিজ্য করতে শুরু করল। তখনও তারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয় নি।

আরবদেশে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের পর দেশের সঙ্গে যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী আরবেরাও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। আরব থেকে তারা আনল ইসলাম ধর্ম-প্রচারক। দ্বীপে দ্বীপে ইসলাম ধর্ম-প্রচার চলে। পারস্য ও ভারতের মুসলমানেরাও এই ব্যাপারে সহযোগিতা করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষপাদে সুমাত্রায় মুসলমান জনসংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পায় এবং তারা স্থানীয় রাজাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করে। চারদিকের চাপে মালাক্কা, সুমাত্রা এবং যবদ্বীপের রাজারা মুসলমান হতে শুরু করেন।

চম্পা থেকে রাদেন রহমৎ নামে একজন লোক উত্তর যবদ্বীপের সুরাবায়াতে বসবাস করেন। ইনি যবদ্বীপের মুসলমান অধিবাসীদের মজপহিতের হিন্দুরাজাকে বিতাড়িত করার জন্য উস্কানি দিতে থাকেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাদেন বোনাঙ মুসলমান অধিবাসীদের একতাবদ্ধ করেন। এদিকে মজপহিৎ রাজ্যে গৃহবিবাদ শুরু হয়ে যায়। ১৪৭০ সনে মুসলমান আক্রমণে মজপহিতের রাজবংশ বলীদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৪৭৬ সনে মধ্য আর পশ্চিম যবদ্বীপ স্থানীয় মুসলমানদের অধীনে আসে। তারপরেও কয়েক বছর যবদ্বীপে মজপহিতের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু ১৫২০ সনে মুসলমান সুলতান দিপতি ইউনুস মজপহিত রাজ্যকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন।

মজপহিতের বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙে চারটি মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়—দেমাক, হাজাঙ্গ, বান্তাম আর মাতরম। নিজেদের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধ বাধল অল্প কিছু দিনের মধ্যেই। মাতরম রাজ্য ভেঙে যোগিয়াকর্তা, সুরাকর্তা, পাকু আলম আর মাঙ্কুনগর নামে চারটি ক্ষুদ্র রাজ্য গঠিত হয়।

এই সময় অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে গোড়া থেকে শুরু হল বৃহত্তর ভারতের দ্বীপপুঞ্জে পরাক্রান্ত শক্তির পতন এবং উত্থান। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলি পারস্পরিক সংঘাত ও সংঘর্ষেই লিপ্ত থেকে দিন দিন শক্তিহীন হয়ে পড়ছিল। প্রতিনিয়ত হচ্ছিল ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর রাজ্যের পত্তন। একটি বৃহৎ শক্তি এই সব যুধ্যমান ক্ষয়িষ্ণু শক্তিগুলিকে এক করে আর বাঁধতে সক্ষম হয় নি। এই সব শক্তিগুলি কোনদিন কল্পনাও করতে পারে নি যে দেশের অভ্যন্তর ব্যতীত বহির্জগতের কাছ থেকে কখনও কোন আঘাত আসতে পারে, —এমন আঘাত, যার ফলে তাদের অস্তিত্বই একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

অন্তর্যুদ্ধে লিপ্ত থেকে বহির্বিশ্বের ঘটনা সম্বন্ধে তারা ছিল সম্পূর্ণ

উদাসীন। এই অজ্ঞতা, এই আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা এবং এই পরস্পর অসহিষ্ণুতাই তাদেঁর মৃত্যুবাণ হয়ে দেখা দিল। মশল্লা দ্বীপপুঞ্জের সুমধুর সৌরভে শ্বেত-ইউরোপ হয়ে উঠেছে চঞ্চল। দস্যুরা তাদের শাণিত তরবার উন্মুক্ত করে অগ্রসর হয়েছে।

আর ঠিক এই সময়েই এই ঐতিহ্যময় জাতির ইতিহাস অন্ধকার-মলিন হয়ে লোকচক্ষুর অগোচরে রয়ে গেল।

নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে অগ্রসর হল ইউরোপের বণিকসম্প্রদায়। হাজার হাজার মাইল সমুদ্র লঙ্ঘন করে উপস্থিত হল পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। সেই মানদণ্ড একদিন দেখা দিল রাজদণ্ড হয়ে।

এবার সেই নিকট-অতীতেই ফিরে যাই।

সমুদ্রের উপকূলে ছোট্ট একটি শহর মালাক্কা।

এই মালাক্কা শহরের সঙ্গে সমস্ত ইন্দোনেশীয় জাতির ইতিহাস জড়িত।

সঙ্কীর্ণ মালাক্কা প্রণালী অতিক্রম করলেই সুমাত্রা দ্বীপ এবং সেখান থেকেই শুরু হল অর্ধ-চন্দ্রাকার স্বর্গ-গঙ্গার মতো ছড়ানো ছিটোনো হাজার হাজার দ্বীপের মালা। উত্তরে মালয়, শ্যামদেশ, কাম্বোডিয়া, ভিয়েৎনাম, চীন; পশ্চিমে ভারতবর্ষ আর পশ্চিম জগৎ আর দক্ষিণ ও পূব জুড়ে ইন্দোনেশিয়ার আট হাজার দ্বীপ। সারা পৃথিবীর সঙ্গে ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল তাই এই মালাক্কা শহর। বাণিজ্য ব্যাপারে মালাক্কার গুরুত্ব অনুধাবন করে যবদ্বীপের মজপহিৎ রাজ্যের রাজা রাজসনগর ১৩৭৭ সনে মালাইদের কাছ থেকে এই শহর অধিকার করে নেন।

মালাক্কা সেই সময়ে শুধু বাণিজ্যেরই প্রধানতম কেন্দ্র ছিল না, মালাক্কাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছিল এই সব দ্বীপে ইসলাম-ধর্মের প্রচার এবং প্রসার এবং এই মালাক্কাই কয়েক বছরের মধ্যে হয়ে উঠল ইউরোপীয় সামরিক অভিযানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক ঘাঁটি।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তের দুটি রাজ্য—পোর্তুগাল ও স্পেন—টোরডেসিলাসের সন্ধিতে সারা পৃথিবীর বাণিজ্যিক প্রভাবকে দুই ভাগে ভাগ করে নিজেদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে নেয়। আজকের পৃথিবীতে এই ভাগ-বাঁটোয়ারা কল্পনা করাও যায় না, কিন্তু সে যুগে সব কিছুই সম্ভব ছিল। পূর্ব জগৎ পড়ল পোর্তুগালের ভাগ্যে।

ভারতবর্ষ ছিল ইউরোপে মশলা রপ্তানির সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। ইউরোপে বিভিন্ন মশলার চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই সুগন্ধি মশলার উৎস-ভূমি যে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ—এ কথা জানাজানি হওয়ার পর থেকেই এই দেশ সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের আগ্রহ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেল। অটোমান তুর্কীদের নব-উজ্জীবন এবং ১৪৫৩ সনে তাদের কনস্ট্যান্টিনোপল অধিকারের ফলে ভারত এবং পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে ইউরোপীয়দের বাণিজ্যের পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেল। সেই-জন্য ভারত এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাওয়ার এক সমুদ্র-পথের প্রয়োজন তাদের কাছে অত্যন্ত বড় হয়ে দেখা দিল। তারই ফলে ভাস্কো দ্য গামার সমুদ্র-অভিযান এবং উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে ১৪৯৮ সনের মে মাসে ভারতের পশ্চিম কুলবর্তী কালিকটে আগমন।

১৫০৮ সনে দিউ'র নৌ-যুদ্ধে জয়লাভ করে পোর্তুগালের উপনিবেশ সমূহের ভাইসরয় আলফোঁসো দ্য আলবুকার্কের নেতৃত্বে পোর্তুগীজরা উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে মালাক্কা পর্যন্ত সমস্ত সমুদ্র-পথে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। মালাক্কা তখন চীনের করদ-রাজ্য ছিল। ১৫১১ সনে আলবুকার্ক মালাক্কা অধিকার করলেন এবং তখন থেকেই শুরু হল ইউরোপীয়দের উপনিবেশ স্থাপনের আগ্রহে চিরাচরিত দাম্ভিক হঠকারিতা। মুসলমান ব্যবসায়ীদের তিনি সমস্ত জাহাজ লুট এবং অধিকার করে নিলেন। মালাক্কায় একটি দুর্গ নির্মাণ করলেন এবং এই দুর্গের জন্য পাথর সংগ্রহ করলেন কবর খুঁড়ে। পোর্তুগীজ বণিকদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে যাতে কেউ সাহসী না হয় তার জন্য তিনি যবদ্বীপের প্রধান প্রধান বণিকদের হত্যা করেন।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করে পোর্তুগীজরা রাজ্য জয়ের দিকে আর দৃষ্টি দিল না। তারা সমগ্র পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ব্যবসাকে কুক্ষিগত করেই খুশি ছিল।

মালাক্কার সুলতান প্রথমে তাদের বিশেষ সন্দেহের চোখে দেখছিলেন, কিন্তু তাদের নতুন রাজ্য-বিস্তারের আর কোন আগ্রহ না দেখায় তিনি চুপ করে রইলেন। শুধু সমুদ্রের বাণিজ্য-পথকে সুরক্ষিত এবং বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিকে করায়ত্ত রাখার জন্য পোর্তুগীজরা কয়েকটি মাত্র দুর্গ নির্মাণ করেছিল। তাদের ঘাঁটিগুলির চতুর্দিকে বিস্তৃত ভূমিভাগের ওপর তাদের বিন্দুমাত্র লোভ ছিল না। তারা দেশের সাধারণ জীবনযাত্রা বা রাজনৈতিক জীবনে সামান্যতম হস্তক্ষেপ করে নি। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অন্যান্য ইউরোপীয় অভিযাত্রীদলও এই দেশে এসে অনুরূপভাবে ঘাঁটি নির্মাণ করে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পোর্তুগীজদের মতোই নির্লিপ্ত ছিল।

মশলার ব্যবসায়ে পোর্তুগালকে স্ফীত হয়ে উঠতে দেখে স্পেন ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল। সত্য কথা বলতে গেলে ইউরোপের আন্তঃরাষ্ট্র কলহ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্থানান্তরিত হল দূরপ্রাচ্যে এবং এখানকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আবার ইউরোপে নব নব বিরোধের অগ্নিদাহে তৈল সিঞ্চন করতে লাগল। পোর্তুগালের আধিপত্যহীন পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাওয়ার নতুন একটি সমুদ্র পথের সন্ধানে ফার্দিনান্দ ম্যাগেলানের* নেতৃত্বে স্পেনের কয়েকটি জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে পশ্চিম দিকে যাত্রা করে এবং অনেক বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণতম প্রান্ত প্রদক্ষিণ করে প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করে।

মধ্য-ফিলিপাইনের সেবু-র মাক্তান সাগরতীরে স্থানীয় বিরোধে হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে ম্যাগেলান লাপু-লাপু নামে এক উপজাতি প্রধানের অনুচরদের হাতে প্রাণ হারান। স্পেনীয় অভিযাত্রীদল সেখান থেকে এসে উপস্থিত হয়, মোলাক্কাস দ্বীপ এবং শেষ পর্যন্ত মাত্র একটি জাহাজ ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে স্পেনে ফিরে

* ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান কিন্তু জাতিতে পোর্তুগীজ ছিলেন।

আসতে সক্ষম হয়। এই হল প্রথম সাগর-পথে ভূ-প্রদক্ষিণ। এই নতুন সমুদ্র-পথ আবিষ্কারের ফলে মোলাক্কাস আর ফিলিপাইনে নিজেদের স্বার্থ এবং অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াসে পোর্তুগাল ও স্পেনের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অহোরহ সংঘর্ষ লেগে রইল। শেষ পর্যন্ত ১৫২৯ সনের সারাগোসার সন্ধিতে স্পেন পোর্তুগালকে মোলাক্কাস দ্বীপের ওপর তাদের সমস্ত স্বত্ব বিক্রি করে দিতে সম্মত হল। কয়েক বছর এই চুক্তির সর্ত পালিত হল, কিন্তু ১৫৪৫ সনে আবার স্পেন পোর্তুগালের কাছ থেকে মোলাক্কাস দ্বীপ অধিকার করার চেষ্টা করে। কয়েকটি অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় তারা তাদের দৃষ্টি আবার ফিলিপাইনের দিকে ফিরিয়ে নেয় এবং পোর্তুগালের সঙ্গে আর কোন সংঘর্ষ বাধে নি।

১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ওলন্দাজেরা প্রথম দূরপ্রাচ্যের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়। ওলন্দাজদের চারটি জাহাজ সুমাত্রার পশ্চিমতীর ঘেঁষে এগিয়ে গিয়ে যবদ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে বান্তামে এসে উপস্থিত হয়। বান্তামের বণিক-সম্প্রদায়কে বিদেশী বাণিজ্যে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং বন্ধুভাবাপন্ন দেখে ওলন্দাজ অভিযাত্রীদের নেতা কর্নেলিয়াস ড্য হাউটমান তাদের সঙ্গে এক চুক্তি সম্পাদন করেন।
বান্তামের তদানীন্তন এক দৃশ্যের কথা এক ওলন্দাজ ঐতিহাসিকের বিবরণীতে পাওয়া যায়:

> There came such a multitude of Javanese and other nations as Turks, Chinese, Bengali, Arabs, Persians, Gujrati, and others that one could hardly move. They came so abundantly that each nation took a spot on the ships where they displayed their goods, the same as if they were on a market.

তিন বছরের মধ্যে আবার ওলন্দাজেরা হাউটমানের নেতৃত্বে দূরপ্রাচ্যে ফিরে আসে এবং প্রায় সর্বত্রই তাদের ব্যবসা সাফল্য লাভ করে। একমাত্র মাডুরা এবং আচিয়েতে ওলন্দাজেরা কোনরকম সুবিধা করতে পারে নি। মাডুরাতে হাউটমান নিহত হন।

ইতিমধ্যে ওলন্দাজেরা যবদ্বীপে ঘাঁটি স্থাপন করে। ১৫০২ সনে সুমাত্রা এবং যবদ্বীপের মধ্যবর্তী সুন্দা প্রণালীর ওপর আধিপত্য স্থাপন করে মোলাক্কাস এবং মালাক্কায় পোর্তুগীজদের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল। পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিকদের প্রতি-যোগিতার ফলে মশলা উচ্চমূল্যে বিক্রি হতে লাগল, ফলে ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীরা খুশি হয়ে উঠল।

কিন্তু ওলন্দাজেরাও সর্বশক্তিমান ছিল না। ইংরেজরাও দূরপ্রাচ্যে বাণিজ্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছে। স্পেন, পোর্তুগাল হল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডকে নিয়ে ইউরোপীয় রাজনৈতিক খেলার দিক পরিবর্তন হতে লাগল ডাচ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবং ইংলিশ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরোধের ফলে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাইল পোর্তুগাল। যুধ্যমান ওলন্দাজ এবং ইংরেজদের দিন দিন শক্তি ক্ষয় হতে দেখে পোর্তুগাল এই দুই দেশকেই এখান থেকে বিতাড়িত করতে মনস্থ করে। পোর্তুগীজরা সর্বশক্তি পণ করে ওলন্দাজদের আক্রমণ করল এবং পোর্তুগাল থেকে আরো সৈন্য আনার ব্যবস্থা করল ; কিন্তু ইংরেজরা পোর্তুগালের খেলা বুঝতে পেরে জাহাজ দিয়ে পোর্তুগালের রাজধানী লিসবন অবরোধ করে রাখল। ফলে পোর্তুগীজরা রণে ভঙ্গ দিল।

ওলন্দাজেরাও অন্যান্য ইউরোপীয় আক্রমণকারীর মতোই ছিল। ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে ডাচ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ইআন পিয়েতারজুন কোয়েনকে পূর্বভারতীয় ওলন্দাজ উপনিবেশসমূহের শাসনকর্তা করে পাঠায়। তিনি মনে মনে স্থির করে এসেছিলেন যে মশলার ব্যবসায়ে

ওলন্দাজদের একাধিপত্য তিনি তিনি প্রতিষ্ঠা করবেন, বিদেশী এবং দেশী সমস্ত সমুদ্র-জাহাজ ধ্বংস করবেন, মশলার চাষ ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকদের হাতে তুলে দেবেন এবং জাপানী সৈন্যের সাহায্যে ম্যানিলা এবং ম্যাকাও অধিকার করবেন ; কিন্তু তিনি তার কিছুই করতে পারেন নি।

প্রথমেই তিনি জাকর্তায় ওলন্দাজদের ব্যবসাকেন্দ্রকে গোপনে সুরক্ষিত করার আদেশ দিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে ইংরেজরা হয়তো ওলন্দাজদের আক্রমণ করতে পারে। জাকর্তার সুলতান জানতে পেরে ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কোয়েন সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের ঘাঁটি আক্রমণ করে তাদের সমস্ত বাণিজ্য-কেন্দ্র ভস্মীভূত করে দেন। তারপর এক বিরাট নৌবাহিনী এবং এক হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি জাকর্তা শহরটিকে লুণ্ঠন করে ধূলিসাৎ করে দেন এবং অধিকার করেন। জাকর্তার তিনি নতুন নামকরণ করেন 'বাতাভিয়া'। ('বাতাভি' এক জার্মান উপজাতির নাম। তারা রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং শেষে হল্যাণ্ডে গিয়ে বসবাস করে। সেইজন্য হল্যাণ্ডের ল্যাটিন নাম 'বাতাভিয়া')।

ওলন্দাজদের হাতে জাকর্তার সুলতানের এই শোচনীয় পরাজয় কিন্তু সহজভাবে মেনে নিতে পারল না যবদ্বীপের আর দুটি রাজ্য—বান্তাম ও মাতরম। এই দুই রাজ্য একত্র হয়ে দু'বার বাতাভিয়া অবরোধ করল, কিন্তু দু'বারই তাদের পশ্চাদপসরণ করতে হয়। তৃতীয়বার অবরোধের জন্য মাতরমের সুলতান আগুঙ্গ দেশের সমস্ত লোককে যোগদান করতে আহ্বান জানান। হাজার হাজার মাতরম সৈন্য বাতাভিয়া অভিমুখে চলল। তাই দেখে বান্তামের সুলতান ভয় পেয়ে ওলন্দাজদের সঙ্গে সন্ধি করলেন। এই অবরোধেও বিশেষ ফল হল না; কিন্তু ওলন্দাজেরা দেখল যে মাতরমের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হলে বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে, সেইজন্য তারা মাতরমের সুলতানের সঙ্গে

সন্ধি করে এবং বাতাভিয়া মাতরমের আশ্রিত-রাজ্য হতে স্বীকৃত হয়।

মাতরমের সঙ্গে সন্ধি করার পরে ওলন্দাজেরা দৃষ্টি দেয় পোর্তুগীজদের ওপর। কয়েকটি ঘাঁটি থেকে পোর্তুগীজদের বিতাড়িত করে ওলন্দাজেরা প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করে এবং তারপর তারা ইংরেজদের সঙ্গে সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হয়। ১৬২৩ সনে আম্বোয়ানায় দশজন ইংরেজকে ওলন্দাজেরা হত্যা করায় ইংরেজরা দ্রুত পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ত্যাগ করে ভারতবর্ষে তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করায় মন দিল।

ইংরেজকে তাড়িয়েই ওলন্দাজেরা ক্ষান্ত হল না। পোর্তুগীজদের হাত থেকে তারা অতি সহজেই মালাক্কা প্রণালীর আধিপত্য ছাড়িয়ে নিল এবং ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে পোর্তুগীজ শক্তির প্রাণকেন্দ্র মালাক্কা অধিকার করল তারা।

ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে ওলন্দাজেরা সর্বশক্তিমান হয়ে উঠল। স্পেন ও পোর্তুগাল বিতাড়িত, ইংরেজরা প্রতিহত। ইংরেজরা এই দ্বীপগুলিতে ওলন্দাজদের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পারলেও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্যিক প্রসারের আশা ত্যাগ করে নি। ১৬৮২ সন পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম যবদ্বীপের বান্তামে তারা একটা ঘাঁটি রাখতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু ওলন্দাজদের তাড়ায় সেখান থেকে হটে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু তিন বছর পরে দক্ষিণ-পশ্চিম সুমাত্রায় বেনকুলেনে তারা আর একটা ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্যত্র ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা তাদের বার বার ব্যর্থ হয়। চীনের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার উৎসাহে আর ফ্রান্সিস লাইটের প্রভাবের ফলে ইংলিশ ঈস্ট ইণ্ডিজ কোম্পানি উত্তর-পশ্চিম মালয়ের উপকূলবর্তী মালাক্কা প্রণালীর মধ্যস্থিত এক গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ পেনাঙ-এ একটি উপনিবেশ স্থাপন করতে সক্ষম হয়। ইতিমধ্যে ১৭৮০-১৭৮৪ সন পর্যন্ত ইঙ্গ-ওলন্দাজদের যুদ্ধের ফলে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ওলন্দাজ-

দের একচেটিয়া ব্যবসা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজেরা তখন আবার শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ১৭৯৩ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত বাইশ বছর ধরে উপনিবেশ নিয়ে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। সেই সুযোগে ১৭৯৫ সনে ইংরেজরা মালাক্কা অধিকার করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্রিটিশ শক্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে স্যার স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফল্‌স্ মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণতম প্রান্তে সিঙ্গাপুরে একটি উপনিবেশ স্থাপন করেন।

চতুর্দিক থেকে নিজেদের সুদৃঢ় করে ইংরেজরা ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ১৮১১ সনে ইংরেজরা ওলন্দাজদের হাত থেকে যবদ্বীপ ছিনিয়ে নেয়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজদের অধিকারে যবদ্বীপ থাকে। তারপর নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য দুই শক্তি প্রায় সব সময়েই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়ে রইল। দুই শক্তিরই ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ১৮২৪ সনে এই দুই শক্তির মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপিত হল। এই চুক্তির ফলে মালয় উপদ্বীপের ওপর ব্রিটিশ প্রভুত্ব ওলন্দাজেরা স্বীকার করে নিল এবং পরিবর্তে ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের ওপর ওলন্দাজ কর্তৃত্ব ইংরেজরা মেনে নেয়। সুমাত্রাস্থিত ব্রিটিশ ঘাঁটি বেনকুলেনের পরিবর্তে ওলন্দাজরা ইংরেজদের মালাক্কার অধিকার ছেড়ে দেয়। সিঙ্গাপুর, পেনাঙ, ওয়েলেসলি প্রভিন্‌স্, মালাক্কা, ক্রিসমাস আইল্যাণ্ড ও ক্রস আইল্যাণ্ড নিয়ে ব্রিটিশরা স্ট্রেইট সেটলমেণ্ট গঠিত করে।

কিন্তু সন্ধি হলেও শান্তি এল না। সুমাত্রায় ওলন্দাজদের প্রভুত্বের ফলে স্ট্রেইট সেটলমেণ্টে ব্রিটিশদের বাণিজ্যিক প্রসার ব্যাহত হতে লাগল। তার ওপর ১৮২৪ সনের সন্ধির সর্তানুসারে উত্তর সুমাত্রায় আচিন রাজ্যটি স্বাধীনতা ঘোষণা করায় পরিস্থিতি আরো ঘোরতর হয়ে উঠল। ওলন্দাজরা আচিএকে দমন করতে চাইলে ব্রিটিশ বাধা দিল। ১৮৪৬ সনে ব্রিটিশরা বোর্ণিওর লাবনান দ্বীপটি অধিকার করে

সারাওয়াক, উত্তর বোর্ণিও এবং ব্রুনেই-এর দিকে তারা অভিযান চালালো। ফলে ওলন্দাজদের সঙ্গে আবার বিরোধ বাধল। শেষ পর্যন্ত ১৮৭১ সনে দুই শক্তি একটা মীমাংসায় উপস্থিত হল। আচিএ-র বিরুদ্ধে ওলন্দাজদের যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণে ইংরেজরা সহযোগিতা করতে স্বীকৃত হল এবং বোর্ণিওতে ব্রিটিশ ও ওলন্দাজদের অধিকারের সীমারেখা চিহ্নিত হল। নিউগিনির দক্ষিণ-পূর্ব অংশ এল ব্রিটিশের হাতে, উত্তর-পূর্ব অংশ পেল জার্মানি এবং পশ্চিম অংশ দখলে রাখল ওলন্দাজেরা।

১৮৯৯ সনের ৩১শে ডিসেম্বরে ওলন্দাজ ঈস্ট ইণ্ডিজ কোম্পানির দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্যবসা করার রাজ-সনদ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ওই তারিখ পর্যন্ত নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাদের প্রতিনিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে থাকতে হত। পশ্চিম যবদ্বীপের সুলতানদের পরাভূত করে তাঁদের আশ্রিত রাজা হিসেবে রেখে ওলন্দাজেরা যবদ্বীপে আধিপত্য বিস্তার করলেও বলীদ্বীপ, লোম্বক, আচিএ, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপগুলি কিন্তু স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে।
যবদ্বীপেও তাদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল না। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অশান্তি লেগে রইল। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে জনগণ ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং এই বিদ্রোহ সর্বাত্মক সংগ্রামে পরিণত হয়। জোগিয়াকর্তার সুলতানের পুত্র দীপোনেগোরো জনগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। দীপোনেগোরো অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন এবং বহুদিন নির্জন গুহায় বসে কোরান পাঠ করেন। এই ধর্মপরায়ণ যুবরাজ সহজেই জনগণের আদর্শ পুরুষ হয়ে উঠলেন। মধ্য ও পূর্ব যবদ্বীপের পর্বতাঞ্চল থেকে দীপোনেগোরো ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে গেরিলা-যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওলন্দাজেরা হল্যাণ্ড থেকে

নতুন সৈন্য নিয়ে এল ; মাদুরা, উত্তর সেলেবিস এবং সুরাকর্তা থেকেও নতুন সৈন্য সংগ্রহ করল। কিন্তু সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও এই বিদ্রোহ দমন করা গেল না। কয়েকটি যুদ্ধে দীপোনেগোরোর হাতে ওলন্দাজ সৈন্যবাহিনী ভীষণভাবে পরাস্ত হয়।

পাঁচ বছর ধরে সংগ্রামের পর ওলন্দাজেরা দীপোনেগোরোর এক মন্ত্রীকে বন্দী করে। দীপোনেগোরো সন্ধির প্রস্তাব করেন। সন্ধি-পত্র স্বাক্ষর হওয়ার সময়ে ওলন্দাজেরা দীপোনেগোরোকে বন্দী করে সেলেবিসের মাকাসারের কারাগারে নিক্ষেপ করে। যবদ্বীপের প্রতিরোধ ভেঙে গেল।

এবারে সেলেবিসের এক রানী ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তিনি ওলন্দাজদের জাতীয় পতাকাকে উল্টো করে জাহাজ লাগাতে আদেশ দিয়েছিলেন। জাতীয় পতাকার এই অপমানে ওলন্দাজেরা ক্ষিপ্ত হয়ে যুদ্ধে নামল। এদিকে সুমাত্রা এবং যবদ্বীপেও যুদ্ধ বেধে গেল। ১৮৪৬ থেকে ১৮৪৯ সন পর্যন্ত ওলন্দাজেরা বার বার বলীদ্বীপ আক্রমণ করেছিল, কিন্তু সেখানকার হিন্দুরাজা সিঙ্গাপুর থেকে অস্ত্রশস্ত্র এনে তাদের প্রতিটি আক্রমণ প্রতিহত করে। ১৮৪৯ সনে ওলন্দাজেরা বলীদ্বীপের রাজার সঙ্গে একটি চুক্তি করে এবং বলীদ্বীপে ওলন্দাজের প্রভাব স্বীকারের পরিবর্তে ওলন্দাজেরা সেখানকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু সবচেয়ে দীর্ঘ দিন ধরে মারাত্মক সংগ্রাম হয় আচিএ দখল নিয়ে। ব্রিটিশের সহায়তায় আচিএ-র সুলতান স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন ; কিন্তু ব্রিটিশ ও ওলন্দাজের মধ্যে সম্পাদিত ১৮৭১ সনের চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটিশরা ওলন্দাজদের আচিএ দখল মেনে নিল। ভীত হয়ে ১৮৭২ সনে আচিএ-র সুলতান সিঙ্গাপুরস্থিত ইতালী ও আমেরিকার রাষ্ট্র-দূতের কাছে সাহায্য চাইলেন। আমেরিকা ও আচিএ-র মধ্যে সহযোগিতার চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হতে আমেরিকায় পাঠানো হল।

ওলন্দাজরা সঙ্গে সঙ্গে আচিএ-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। প্রথম যুদ্ধে ওলন্দাজ সেনাপতি নিহত হলে ওলন্দাজেরা পশ্চাদপসরণ করে। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তীব্র সংগ্রামের পরে ১৯০৮ সনে আচিএ বশ্যতা স্বীকার করে।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বলীদ্বীপ ওলন্দাজদের পদানত হয় এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সেলেবিস।

শ্বেতহস্তী-পদানত ইন্দোনেশিয়া নব-উজ্জীবনের শপথ গ্রহণ করল।

৫

আমরা যাহারা আজ ক্রাওয়াঙ আর বেকাসি'র মাঝে
লভিয়াছি অন্তিম শয়ন,
পারিব না 'মেরডেকা' ধ্বনি দিয়ে কভু আর বন্দুক উঠায়ে
নিশানায় হতে লক্ষ্য স্থির।

মনের মধ্যে এক নিদারুণ অস্থিরতা নিয়ে সামনের বই ক'খানা নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ এই কবিতাটিতে চোখ আটকিয়ে গেল। কবিতাটি চইরিল আনোয়ারের লেখা। 'পুজঙ্গা বারু' বা নূতন লেখকগোষ্ঠীর শক্তিমান কবি এই চইরিল আনোয়ার। ১৯২২ সনে মেদানে জন্ম। জাপানীরা 'পুজঙ্গা বারু' পত্রিকাটিকে বন্ধ করে দেয়, কিন্তু সেই যুগের তরুণ কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এই চইরিল আনোয়ার এবং তরুণ কাহিনীকার ইদ্রুস প্রকাশ করেন 'গেলাঙ্গঙ' পত্রিকা। ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামে চইরিল সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং ১৯৪৯ সালে মাত্র সাতাশ বছর বয়সে টাইফাস জ্বরে ভুগে মারা যান।

আজ সকালেই আমার এই ঘরে বসে অন্যান্য কথাবার্তার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য সাহিত্য আলোচনা হয়েছিল। তখনই শুনেছিলাম চইরিল বা ইদ্রুসের কথা। পঞ্চাশ দশকের শেষ পর্যন্তও চইরিল, ইদ্রুস, তকদির আলিসয়াবানা প্রভৃতি 'পুজঙ্গা বারু' সাহিত্যকবৃন্দ ইন্দোনেশিয়ার সাহিত্য-ক্ষেত্রে যথেষ্ট শ্রদ্ধার আসনে ছিলেন ; কিন্তু ১৯৬০ সনে প্রতিষ্ঠিত হল 'লেম্বাগা কেবুদায়ান রাকিয়াত' বা 'গণ-সংস্কৃতি সমিতি' পি. কে. আই-এর ছত্রছায়ায়। তারা এই সব

লেখকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল। 'পুজঙ্গা বারু' হল নেকো-লিম, দেশের শত্রু। এই নতুন দলের অন্যতম কবি হয়েছেন সোবরোন আইদিত, পি. কে. আই-এর সাধারণ সম্পাদক ডি. এন. আইদিতের ছোট ভাই। 'লেকেরা' সাহিত্য সরকারী সাহায্যে সরকারী স্বীকৃতি পেল বটে, কিন্তু সত্যকার জন-স্বীকৃতি তারা পেল না। 'পুজঙ্গা বারু' এখনও জন-চিত্ত-অধিকারী।

অকালে মোদের মৃত্যু। পড়ে আছে অস্থি শুধু ধূলায় মলিন।
মনে রেখো, আমাদের তবু মনে রেখো।

এত অস্থিরতা মনকে আর কোনদিন পেয়ে বসে নি।

সকালবেলাতেই হোটেল ইন্দোনেশিয়ার সামনে লাল ফেস্টুন আর লাল পতাকা নিয়ে কয়েকটা মিছিল এসে খুব খানিকটা চীৎকার করে গেল। মুহুর্মুহু শ্লোগানের ঝড়ঃ

গান্তুঙ নেকোলিম।
হিতুপ বুঙ্গ কর্ণ।
হিতুপ নাসাকোম।
গঞ্জাঙ নেকোলিম।

ব্রেকফাষ্ট-এর সময় দেখা হল মালিকের সঙ্গে। সতেন্দর সিং মালিক ভারতীয় একটি রঙ-কোম্পানির ওভারসীজ্ সেলস্ প্রমোশন অফিসার। দিন দুয়েক আগেই আলাপ হয়েছিল। আমাকে দেখে আমার টেবিলে এসে বসলেন।

বললেন—সেন, এ সময়ে এখানে এসে ভাল করেন নি। আমি আজই টোকিও চলে যাচ্ছি। ট্রাই টু লিভ বাই ফার্স্ট প্লেন।

এই ক'দিনই এ কথাটার সত্যতা আমি কিছুটা অনুধাবন করতে পেরেছিলাম। কিম আমাকে একা একা বাইরে বেরুতে মানা করেছেন। হোটেলে কিংবা হোটেলের বাইরে রাস্তায় কিংবা দোকানে, প্রয়োজনে যেখানেই গিয়েছি, সেখানেই সকলের সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে অস্বস্তি

বোধ করেছি। ভারতের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার প্রীতির সম্পর্ক যে একেবারে নেই, সে কথা আমি জানতাম; কিন্তু সম্পর্ক কতদূর খারাপ হয়ে উঠেছে তা ঠিক জানতাম না। জানলে কিসের প্রলোভন সত্বেও এখানে এসে উঠতাম না।

মালিক বললেন—শুনেছেন কি না জানি না, কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে একটা ভারতবর্ষের বড়রকম কিছু হবার আশঙ্কা আছে। একথাই এখানকার সকলে বলাবলি করছেন। দেশের লোককে ক্ষেপিয়ে তুলছেন সুবন্দ্রিয়ো আর পি. কে. আই, সুকর্ণও অবশ্য তাই চান।

যুদ্ধ লাগতে পারে?—সভয়ে প্রশ্ন করলাম।

মালিক উত্তর দিলেন—অসম্ভব নয়। আর সুবন্দ্রিয়োর লম্বা লম্বা বক্তৃতা শুনলে মনে হয় ইন্দোনেশিয়াও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

বললাম—সে সাহস হবে না।

মালিক বললেন—কেন হবে না? চীনের মদতেই যুদ্ধে নামবে। নয়তো পাকিস্তানেরই বা এত সাহস কি করে হয়? চীন-ই দুই দেশকে উস্কানি দিয়ে যাচ্ছে। কাল সন্ধ্যাবেলায় গিয়েছিলাম পাসার বারু-তে। জাকর্তার সবচেয়ে বড় বাজার,—আমাদের কত মাল তারা কেনে। তারা স্পষ্ট বললে—এখন আর আপনাদের রঙ নয়, নিজেদের 'বেরডিকান' (আত্ম-নির্ভর) হতে হবে। তাছাড়া আপনারা হলেন 'নেকোলিম', কোণ্ট্রা—রেভোলুসি। এদের নেকোলিম-ফোবিয়া হয়েছে। যেখানে যা কিছু খারাপ হচ্ছে, সব কিছুর মূলেই নেকোলিম, ইন্দোনেশিয়াকে ধ্বংস করার জন্য নেকোলিমরা চারদিকে ষড়যন্ত্র করছে। কবে ফিরবেন?

উত্তর দিলাম—ফিরতে তো এখনই ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু একটু মুস্কিলে পড়ে গেছি। কণ্ট্রাক্ট সই না করলে যখন-তখন চলে যেতে পারতাম, এখন গেলেই চুক্তিভঙ্গের দায়ে পড়ব। তাছাড়া এখান থেকে ছাড়পত্র জোগাড় করা কঠিন। ফিরতে হবে সিঙ্গাপুরে, সেখান থেকে টাকাকড়ি

পাঠানোর ব্যবস্থা করে যেতে হবে। দেখি একবার কিম উ তান-কে জিজ্ঞাসা করে।

ভাল কথা বললাম, ভেবে দেখবেন,—মালিক বলে উঠে গেলেন।

ঘরে ফিরে এসে মালিকের কথাটা মনে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। পাকিস্তান যে ভারতকে আক্রমণ করবে, এ কথাটা প্রথমে তেমন বিশ্বাস হচ্ছিল না। কচ্ছ-এর রান-ভূমি নিয়ে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক গোলযোগ আমাকে কিছুটা দমিয়ে দিল। জন্ম থেকেই পাকিস্তানের নেতারা ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করেছে। তাদের মদৎ দিয়ে এসেছে আমেরিকা আর ব্রিটেন। আয়ুব খাঁর গলাবাজি হয়ে উঠেছে সবচেয়ে বেশি, তার সঙ্গে সমান তালে প্রতিযোগিতা করে চলেছেন ভুট্টো। চীনের বর্বর আক্রমণে ভারত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার থেকেই আয়ুব আর ভুট্টো ভারতের সঙ্গে এক হাত দেখে নেবার জন্য চীৎকার করে বেড়াচ্ছেন। চীন এবং আমেরিকার অস্ত্রশস্ত্র-পুষ্ট পাকিস্তান পূর্ব-পাকিস্তানের আন্দোলন এবং সমগ্র দেশের দারিদ্র্য ও অনটনের জন্য অসন্তোষকে অন্য পথে চালিত করার জন্য চীনের সাহায্যে হঠাৎ ভারতকে আক্রমণ করেও বসতে পারে।

ঠিক সেই কারণও নিহিত রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার এই বৈরী-মনোভাবে। বিশ বছর স্বাধীনতার পরেও দেশের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি না পেয়ে বরং সুকর্ণের নবাবী এবং ব্যর্থতার জন্য দেশের আর্থিক অবস্থা এখন চরমে এসে দাঁড়িয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি এত বেশি যে বাজারে ইন্দোনেশিয়ার রুপিয়ার চাহিদা একেবারে নেই। সাধারণ লোকের সারা মাসের আয়ে মাত্র এক সপ্তাহ চলে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে ইন্দোনেশিয়া বেরিয়ে আসায় অন্য কোন রাষ্ট্রের সহানুভূতি ইন্দোনেশিয়া পায় নি। মালয়-সিয়ার সঙ্গে কনফ্রন্টাসির জন্য আমেরিকা খাদ্য-সাহায্য বন্ধ করেছে। চীন থেকে যেটুকু চাল আসছে তা চলে যাচ্ছে কালো বাজারে। রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি যন্ত্রপাতির অভাবে অধিকাংশই অকেজো হয়ে

পড়েছে। দেশের অভ্যন্তরে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছে। যদিও সুকর্ণ সরকার এবং পি. কে. আই দেশের এই দুরবস্থার জন্য দায়ী করছে নেকোলিম বা নিও-কলোনিয়েলিস্টদের। মালয়সিয়ার সঙ্গে নতুন কনফ্রন্টাসিতে জনসাধারণ এখন উল্লসিত হবে না, জনসাধারণের মনকে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর একটা হুজুগ চাই। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা—সেই হুজুগ হওয়া খুবই সম্ভব। পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে চীৎকার করলে ইন্দোনেশিয়ায় গোলমাল হবে না, কিন্তু চীন চীৎকার শুরু করলেই পি. কে. আই চীৎকার করবে, সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ো তুলবেন সুবন্দ্রিয়ো, তার সঙ্গে সুকর্ণ এবং নাসাকোম সরকার—অর্থাৎ সমগ্র ইন্দোনেশিয়া।

ভারতের বিরুদ্ধে সুকর্ণ, সুবন্দ্রিয়ো এবং পি, কে. আই-এর সাম্প্রতিক আস্ফালনের আর একটা কারণও দেখা দিয়েছে। বান্দুং সম্মেলনের দশ বছর পরে আলজেরিয়াতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা দ্বিতীয় আফ্রো-এশীয় সম্মেলন। এই সম্মেলনের গতি-প্রকৃতি দেখে সুকর্ণ-সুবন্দ্রিয়ো-পি. কে. আই-এর বুকে কাঁটা গভীর ভাবে বিঁধেছে।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি আলজিয়ার্সে আফ্রো-এশীয় সম্মেলনের অধিবেশন বসার সম্ভাবনা ছিল। সেই থেকেই সুবন্দ্রিয়ো ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণদের জনসভায়, বেতার-মারফৎ কিংবা সংবাদ-পত্রে বিবৃতিতে বলে বেড়াচ্ছিলেন যে এই সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়া বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরবে ইন্দোনেশিয়া জগৎকে নতুনভাবে রূপায়িত করার মহান্ দায়িত্ব কি ভাবে পালন করে চলেছে। এই সম্মেলনেই আফ্রিকা এবং এশিয়ার জনগণ রক্ষণশীল অগ্রগতিহীন রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে বেরিয়ে এসে 'নিউ এমার্জিং ফোর্স'-এ যোগ দেবে। "The most imperialistic of the necolim countries" আমেরিকায় অবস্থিত রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে ইন্দোনেশিয়ার মতো আফ্রিকা ও এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি দলে দলে বেরিয়ে এসে জার্কতায় অবস্থিত CONEFO বা Conference of the New

Emerging Forces-এ যোগ দেবে। আফ্রিকা ও এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের দালাল (অর্থাৎ মালয়সিয়া আর তার সমর্থক ভারতকে) বহিষ্কার করার অধিকার তাঁকে ও সুকর্ণকে দেবার জন্য সুবন্দ্রিয়ো দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়ে বেড়িয়েছেন।

কিন্তু সুবন্দ্রিয়োর এত আস্ফালন, এত সাজ সাজ রব—সব কিছু নস্যাৎ হয়ে গেল একটিমাত্র ঘটনায়। আলজিয়ার্সের রাষ্ট্রপতি বেন বেল্লা'র বিরুদ্ধে এই সম্মেলনের মাত্র কয়েকদিন আগে কর্নেল বুমেদিয়েন এক সামরিক অভ্যুত্থানের বেন বেল্লাকে অপসারিত করলেন। আলজিয়ার্সের এ ধরনের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে আর আফ্রো-এশীয় সম্মেলন সেখানে অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়, যদিও বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে অনেকেই তখন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন এবং প্রাথমিক অনেক কাজ অগ্রসর হয়েছে।

এই ঘটনায় সুবন্দ্রিয়ো আঘাতও পেলেন যতখানি, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেনও ততখানি। এই আলজিয়ার্সের সম্মেলনে তিনি তাঁর ভাষণে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মৃত্যু-বাণ নিক্ষেপ করে আফ্রিকা ও এশিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রগুলিকে একত্র করে জাকর্তার কোনেফো-তে নিয়ে আসার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই তৃতীয় শক্তির পুরোধা এতদিন ছিল ভারত। সেই ভারতের হাত থেকে মুকুট ছাড়িয়ে নেবার জন্য অগ্রসর হয়েছে অনেক রাষ্ট্র। নাসের, এনক্রুমা, বেন বেল্লা, কাস্ট্রো, টিটো এবং সবচেয়ে বেশি সুকর্ণ। সুকর্ণ মানেই সুবন্দ্রিয়ো। সুকর্ণ এবং ইন্দোনেশিয়ার হয়ে এই নেতৃত্ব পরিচালনা করবেন স্বয়ং সুবন্দ্রিয়ো।

ইন্দোনেশিয়ার মুখপাত্র হয়ে সুবন্দ্রিয়ো সদলবলে আলজিয়ার্সে এসে উপস্থিত হলেন। অন্যান্য দেশ থেকেও পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা সদলে এলেন। কিন্তু সুবন্দ্রিয়োর বরাত নেহাৎ খারাপ। এই আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে মালয়সিয়া এবং রাশিয়াকে ইন্দোনেশিয়া কিছুতেই যোগদান করতে দেবে না। চীনের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার 'আঁতাত' ঘনিষ্ঠ হওয়ায়

কাল সন্ধ্যাবেলায় সে এসেছিল, একা। সঙ্গে হরাতোনোকে না দেখে আমি একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। বোধহয় সে রকম একটা কিছু প্রশ্নও করেছিলাম। হঠাৎ যেন তাকে ক্ষেপে উঠতে দেখলাম। দেশী ভাষায় কতগুলো কী সব বলে সে হন্‌হন্‌ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এত আচমকা ঘটনাটা ঘটে গেল যে আমি তাকে বাধা দিতেও পারি নি। সিণ্টাকে ডাকব কি ডাকব না বুঝে ঠিক করার আগেই আবার সে ফিরে এল। ক্ষমা চেয়ে চুপ করে বসে রইল। আমিও আর কিছু বললাম না। কেন জানি মনে হল যে হয়তো কোন কারণে হরাতোনোর সঙ্গে তার একটা কিছু হয়েছে।

সিণ্টাই একসময়ে বলল—আপনি কিছু মনে করেন নি তো, বুঙ্গ সেন?

বললাম—না, কিন্তু তোমার কি হয়েছে বল তো?

প্রবল জোরে মাথা নেড়ে সে উত্তর দিল—টিডাঃ আপা। টিডাঃ আপা। (কিছু না, কিছু না।)

'বয়'কে বলে কফি এনে তাকে দিলাম। সে শুধু অস্ফুটস্বরে বলল—ত্রিমাকাকি। (ধন্যবাদ।)

কফি শেষ করে সিণ্টা হঠাৎ বলল—বাপক (বাবা) কিম কি 'সিতি নুরবায়া' গল্পটা ঠিক করেই ফেলেছেন?

উত্তর দিলাম—হ্যাঁ, তাইতো মনে হচ্ছে।

সিণ্টা প্রশ্ন করল—গল্পটা আপনার কেমন লাগল?

উত্তর দিলাম—এই একরকম, বড় একঘেয়ে। প্যানপ্যানানিটা একটু বেশি।

আমারও তাই মনে হয়,—বলল সিণ্টা।—আমি বলি কি বুঙ্গ সেন, আপনি বাপক কিমকে এই কথা জানান। 'সিতি নুরবায়া' ভাল হবে না। তার চেয়ে বরং তকদির আলিশাহবানা'র 'লয়র তেরকেমবাঙ' (মেলে-দেওয়া পাল) গল্পটার ছবি তুলুন। চমৎকার গল্প, অত্যন্ত প্রগতিশীল লেখক। আর সেই সঙ্গে চইরিলের লেখা গান। চইরিল,

জানেন, এদেশের সবচেয়ে প্রতিভাশালী কবি ছিলেন। আমি আপনাকে দেখাব বলে সে বই এনেছি।

এই বলে তার হাত-ব্যাগ থেকে বের করল 'লয়র তেরকেমবাঙ' এবং ইন্দোনেশীয় কাব্য-সঙ্কলনের একটা ইংরাজি অনুবাদ।

কবিতার বইটা উলটিয়ে দেখতে লাগলাম। চইরিলের কবিতা :

> But who will not hear our coming?
> As a vision, we charge with beating heart.
> We speak to you in the quiet of the night
> When the bosom is empty of feeling
> And the clock is clicking on the wall.

সিণ্টা জিজ্ঞাসা করল—কেমন লাগল ?

উত্তর দিলাম—ভালই। ইংরেজ কবি উইলফ্রেড ওয়েনের কথা মনে পড়ে যায়।

সিণ্টা আবার প্রশ্ন করল—আচ্ছা, এই কবিতা পড়ে কি চইরিলকে রোম্যান্টিক, রি-অ্যাকসানারি কিংবা নিও-কলোনিয়ালিস্ট বলে মনে হয় ?

বললাম—না, কিন্তু কেন ?

আজকের হাওয়া,—উত্তর দিল সিণ্টা—আজকের তরুণ সাহিত্যিকরা হঠাৎ আবিষ্কার করেছেন চইরিল আনোয়ার, ইদ্রুস, কিংবা মুখতার লুবিস হয়েছেন রি-অ্যাকসানারি, বুর্জোয়া। চইরিল বেচারী মারা গিয়ে বেঁচে গেছেন, বেঁচে থাকলে 'পুপুতান' (আত্মহত্যা) করতেন—এ রকম সেন্টিমেণ্টাল ছিলেন তিনি। মুখতার লুবিসকে আমাদের নাসাকোম সরকার রেখেছেন জেলে, কারণ তিনি স্পষ্টবক্তা। এখন যাঁরা 'লেকেরা', অর্থাৎ লেম্বাগা কেবুদায়ান রাকিয়াত-এর সভ্য, তারাই হয়েছেন সত্যকার সাহিত্যিক। আপনারও কি তাই মনে হয় ?

বললাম—দেখ, আমি কারুর লেখাই পড়ি নি, কি করে মতামত দেব ?

অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল সিণ্টা, তারপর যেন আপন

মনেই বলল—রাতোনো বোধহয় ঠিকই বলেছিল—আপনি সুবিধার লোক ন'ন।

কথাটায় চমকিয়ে উঠলাম। সিণ্টাও যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলাম—হরাতোনো আমার সম্বন্ধে কিছু বলছিল না কি? না, এমনিই বলছিলাম,—বলল সিণ্টা।—ও আপনাকে হিংসে করে। হিংসে করে!—চমকিয়ে ওঠার কথা। বললাম—কেন? কি ব্যাপার? জানি না,—মাথা ঝাঁকি দিয়ে উত্তর দিল সিণ্টা।—বলে, আপনি লোক ভাল না। আপনার মতলব ভাল না। আপনি নেকোলিমের স্পাই। আপনাদের দেশ আমাদের দেশের সঙ্গে শত্রুতা করে বেড়াচ্ছে। বাপক কর্ণ, বন্দ্রিয়ো—সকলেই এ কথা বলছেন। কিন্তু আপনার আর আমার দেশে শত্রুতা থাকতে পারে, তা বলে আপনি বা আমি খারাপ হব কেন? আমি কি আপনাকে চিনি না? আমি কি আপনার সঙ্গে ভাল করে মিশি নি? পাঁচ মাস ধরে আমরা তুজনে একসঙ্গে সিঙ্গাপুরে কাজ করেছি—আপনি খারাপ হলে আমার কাছে অজানা থাকত? আসল কথা কি জানেন?—রাতোনো আপনাকে হিংসে করে। আমি যে আপনার সঙ্গে মেলামেশা করি ও তা চায় না। আজ এই নিয়ে আমাদের তুজনের খুব ঝগড়া হয়ে গেছে। সেইজন্যই রাগ করে ও আসে নি।

আমার ওপর হরাতেনোর এই বিদ্বেষ খুব সুখকর মনে হল না, বরং আমাকে একটু চিন্তিত করেই তুলেছিল। জাকর্তায় কেন, সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় মাত্র তিনজন আমার পরিচিত এবং শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মনে করেছিলাম—সিণ্টা, কিম আর হরাতোনো। এদের মধ্য থেকে একজন যদি শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, তবে আমার দাঁড়াবার জায়গাটাও অনেকখানি আলগা হয়ে যায়।

তাই বললাম—আমাকে নিয়ে হরাতোনোর সঙ্গে তোমার ঝগড়া করা উচিত হয় নি। আমি আজ আছি, কাল চলে যাব; কিন্তু হরাতোনো তোমার চিরকালের।

আপনি চলে গেলে আমিও এখানে থাকব না,—উত্তর দিল সিণ্টা।—হরাতোনো বদলিয়ে গেছে, যে রাতোনোকে আমি জানতাম সে রাতোনো আর নেই। আপনি বুঝবেন না আমার কথা—ও এখন দল করছে, ও এখন কেমন যেন হয়ে গেছে।

বললাম,—কিন্তু হরাতোনো যদি দল করে, তবে ইচ্ছা করলে সে আমার ক্ষতিও করতে পারে।

সিণ্টা বলল—পারে, কিন্তু তবে হরাতোনোকে আমিও বাঁচতে দেব না। একথা ও জানে।

আমি চুপ করে রইলাম। মনে খুব বেশি একটা সাহস পাচ্ছিলাম না। আর তাছাড়া সিণ্টার কথাবার্তার মধ্যে আমি এমন একটা সুর অনুভব করছিলাম, যা আমাকে একটু চিন্তিত করেই তুলেছিল।

একটু পরে সিণ্টা বলল,—বাপক কিম যদি ছবি করতে না চায় তো ভাল হয়। কোন গোলমালের মধ্যে না থেকে আমরা আবার সিঙ্গাপুরে ফিরে যেতে পারি, ওখানেই আমরা ছবি করতে পারি। দেশে থাকার জন্যই ফিরে এসেছিলাম কিন্তু হরাতোনোর জন্য আর থাকতে ইচ্ছা করছে না।

উঠে পড়ল সিণ্টা। বলল—এখন যাই, নয়তো বাড়ি ফিরতে অনেক দেরী হয়ে যাবে। আজ পথে সমস্ত গাড়ি চলাচল বন্ধ। এসেছি হেঁটে, ফিরতেও হবে হেঁটে।

জিজ্ঞাসা করলাম—গাড়ি বন্ধ কেন?

সিণ্টা হেসে উত্তর দিল—আজ আন্দোলনের মহোৎসব। টুঙ্কুর বুকে 'ক্রিস' (বাঁকা তলোয়ার) বসিয়ে একদল মিছিল নিয়ে বেরিয়েছে, ভিয়েৎনাম আমেরিকার বোমা ফেলা নিয়ে আর একদল মিছিল করছে, পাকিস্তান-ইন্দোনেশিয়া জিন্দাবাদ করে আর একদল মিছিল করছে, রাশিয়া আর ভারতবর্ষকে খতম করার জন্য আর এক মিছিল বেরিয়েছে। বড় বড় সমস্ত রাস্তা—জালান মেরডেকা সেলাতান,

জালান ইমাম বোঞ্জোল, জালান দীপোনেগোরো, ফ্রেণ্ডশিপ স্কোয়ার, মেরডেকা স্কোয়ার—সমস্ত রাস্তা বন্ধ। একটা গোলমাল না বাধলে হয়!

যাবার সময় সিণ্টা বলে গেল—চলি। কিছু ভাববেন না, আমি যতক্ষণ আছি আপনার কোন ভয় নেই।

ভয় নেই, কিন্তু ভরসাও দেখতে পেলাম না। কিমকে টেলিফোন করলাম একবার আসবার জন্য।

সকাল থেকেই শ্লোগানের ঝড়। বেচা, বেমো, সাদো-তে লাল পতাকা উড়িয়ে চলছে মিছিল। ফেস্টুন, পোস্টার আর প্ল্যাকার্ড নিয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা মিছিল। শুধু নাসাকোম হিদুপ, সুকর্ণ হিদুপ আর গঞ্জাও নেকোলিম, গান্তুঙ আমেরিকা, গান্তুঙ মালয়সিয়া।

এই সঙ্গে আরও দু-একটা নতুন শ্লোগান প্রথম শুনলাম:

তেন্তারা রিআক্সি। (সেনাহিনী-রি-অ্যাকসনারি)

তেন্তারা কোণ্ট্রা-রেভোলুসি।

নসুশান কাবির। (Kapitalist-Birokrat বা Capitalist Beurocrat.)

এই প্রথমবার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ শ্লোগানে শুনতে পেলাম। আন্দোলন কার বিরুদ্ধে বোঝবার উপায় নেই, কোন দিকে যাচ্ছে তারও স্থিরতা নেই।

সকালে মালিকের সঙ্গে কথাবার্তার পর মনটা বেশ দমে গিয়েছিল। সিণ্টার বই দুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। ঠিক সেই সময় এত্তেলা না জানিয়েই ঘরে এসে ঢুকল হরাতোনো, সঙ্গে তারই বয়সী আর একজন ছেলে। দুজনেরই চেহারায় বন্ধুত্বের লক্ষণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কাল সন্ধ্যায় সিণ্টার কথা শোনার পর হরাতোনোর এই আবির্ভাবে মনে কেমন যেন সন্দেহ উপস্থিত হল।

সোফায় বসেই হরাতোনো টেবিল থেকে বই দুটো তুলে নিল। চইরিলের কবিতার বইটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল—পড়েছেন?

বললাম—না। দুটো কবিতা পড়েছি, ভালই লাগল!

চইরিলের কবিতা একমাত্র ইম্পিরিয়েলিস্ট, ক্যাপিট্যালিস্ট আর রি-অ্যাকসনারিদের জন্য।—বলল হরাতোনো।—আমাদের দেশের পবিত্র আন্দোলনের বিরোধী, অ্যান্টি-পিপ্‌ল্। ইন্দোনেশিয়া ওঁকে এখন আর কবি বলে স্বীকার করে না।

হয়তো হবে—উত্তর দিলাম।—আমি ওঁর সমস্ত কবিতা পড়ি নি, সুতরাং কিছু বলতেও পারি না।

আপনার পড়া উচিত 'লেকেরা' দলের সাহিত্য—বলল হরাতোনোর বন্ধু, সুদীপ্তো।

উত্তর দিলাম,—পড়ে দেখব, যদিও সাহিত্য আমার সাবজেক্ট নয়।

আপনার তবে সাবজেক্ট কি?—প্রশ্ন করল হরাতোনো।—সিনেমা যে আপনার সাবজেক্ট না, তা আমরা জানি।

একদৃষ্টে হরাতোনোর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। সিণ্টার কথাগুলো মনে পড়ে গেল।

বললাম—সিণ্টাকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন যে আমার সাবজেক্ট কি? সিঙ্গাপুরে আমি পাঁচ ছ'মাস কি করছিলাম—একথা সিণ্টাকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন?

~~মেয়েদের চোখে ধুলো দেওয়া খুব সহজ~~,—বলল হরাতোনো।—কিন্তু সিণ্টার দিকে হাত বাড়াবেন না। সিণ্টার আড়ালে থেকে বাঁচতে পারবেন না।

সুদীপ্তো যোগ দিল—আপনারা নেকোলিম। ভারতবর্ষ নেকোলিম। আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করার জন্যই আপনাদের দেশ মালয়সিয়াকে স্বীকার করে নিয়েছে। আপনারাই কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে রেখেছেন। আপনারাই চীনের সঙ্গে লড়াই করতে

গিয়েছিলেন। এখন আপনাদের চেষ্টা আমাদের নাসাকোম সরকারকে বানচাল করা। নেকোলিম-স্পাইদের গণ্ডাগু করতে আমরা জানি।

বললাম—আমি ঝগড়া করতে চাই না। ভারতবর্ষ নেকোলিম কিনা, ভারতবর্ষ সকলের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে যাচ্ছে কিনা তা ইতিহাস জানাবে। আমি রাজনীতি করি না, রাজনীতির তর্কেও পারব না। সিণ্টার দিকে হাত বাড়াই নি, বাড়ানোর ইচ্ছাও নেই—

না, নেই!—ফেটে পড়ল যেন হরাতোনো।—নয়তো সিণ্টার এতবড় স্পর্ধা হয় কি করে যে আমার কথা অমান্য করে? কার সাহসে সে আজ আমার মুখের ওপর কথা বলতে সাহস পায়? ও আমাকে কিছু বলে নি ভেবেছেন? শুনুন, যত শীগগির পারেন এ দেশ ছেড়ে চলে যান, নয়তো হয়তো আর এদেশ ছাড়ার সুযোগও পাবেন না। শীগ্‌গিরই এমন কিছু হতে পারে যে হাজার লোকের মৃত্যু হলেও কেউ হয়তো ফিরে তাকাবে না।

একরকম খুনের ভয় দেখিয়েই ওরা দুজন চলে গেল।

কিম আসবেন কাল। তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে দেখতে হবে। এই পরিস্থিতিতে এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা উচিত নয়। কিম যদি কণ্ট্রাক্ট ভেঙে দিতে রাজি হন তো পরের প্লেনেই সিঙ্গাপুরে চলে যাব।

চইরিল আনোয়ারের কবিতাটা আবার উলটিয়ে দেখতে লাগলাম:

> আমরা এখন দেখ নগ্নপ্রাণ, শুধু মৃতদেহ:
> সার্থক-উজ্জ্বল কর আমাদের এই মৃত্যু—এই বলিদান;
> বাস্তব ও স্বপ্নের মধ্যকার সীমারেখাটিতে দিয়ে যাও অতন্দ্র প্রহর।
> মনে রেখো, আমাদের মনে রেখো:
> আমরা যাহারা আজ অস্থি শুধু ধূলায় মলিন,
> সহস্র সহস্র প্রাণ—পড়ে থাকা ক্রাওয়াঙ আর বেকাসির মাঝে।

ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ ওলন্দাজ শক্তির পদানত হল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই ইন্দোনেশিয়ার হাজার হাজার দ্বীপের আকাশে দেখা দিল হল্যাণ্ডের জাতীয় পতাকা। বিজয়ী ওলন্দাজ সরকার ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ইন্দোনেশিয়ার শাসনভার গ্রহণ করল। ওলন্দাজদের মুখে বিজয়ীর তৃপ্ত হাসি ফুটে উঠল। নির্বিবাদে এই দেশের ধনসম্পদ এখন আহরণ করা যাবে এবং কঠোর শাসনে ইন্দোনেশীয়দের আবদ্ধ রাখা যাবে।

ওলন্দাজদের এই আত্মতৃপ্তির যুগেই ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবোধ ধূমায়িত হয়ে উঠছিল। সত্য কথা বলতে গেলে যেদিন ইন্দোনেশিয়া ওলন্দাজদের সম্পূর্ণরূপে পদানত হল, সেইদিন থেকেই তাদের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ইউরোপীয় শক্তি যে সর্বশক্তিমান নয়, এই ধারণা হওয়ার পর থেকেই তাদের হতাশ-ভাব কেটে গেল। জাতীয় উজ্জীবনের জন্য তারা অধীর হয়ে উঠল।

সমগ্র এশিয়ার দিকে তারা তাকিয়ে দেখল। সর্বত্রই ইউরোপীয় শক্তি এশীয় দেশের ওপর প্রভুত্ব এবং অত্যাচার করছে; কিন্তু এই ঘন অন্ধকারের মধ্যেই উজ্জ্বল বিদ্যুল্লেখা দেখা যায়। চীনা এবং জাপানীরা ইউরোপীয়দের পোশাকে ইউয়োপীয়দের অস্ত্র নিয়ে ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। ফিলিপাইন স্পেনের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে, চীনারা বক্সার বিপ্লবে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে অসমসাহসে লড়াই করেছে এবং জাপানের হাতে ইউরোপের অন্যতম প্রধান শক্তি রাশিয়া পোর্ট আর্থারের যুদ্ধে পরাজিত। ভারতেও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে দাঁড়িয়েছে।

সমগ্র এশিয়ায় ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইন্দোনেশিয়ার জনমানসে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে তোলে। ধীর পদক্ষেপে তারা জাতীয় আন্দোলন গঠন করতে লাগল।

ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের শতকরা নব্বইজন অধিবাসীর ধর্ম ইসলাম। এই ধর্ম-বন্ধন তাদের ইউরোপীয় ক্রিশ্চানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একতাবদ্ধ করে তুলল। ওলন্দাজ শাসকরা মালয়ী ভাষাকে বিজিত অধিবাসীর ভাষা বলে ঘৃণা করত, সেই মালয়ী ভাষাই ইন্দোনেশিয়া জাতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকার করে নিল। হাজার হাজার দ্বীপের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী অধিবাসী সগর্বে মালয়ী ভাষাতে কথা বলতে লাগল।

শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেই প্রথমে ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয়তা আন্দোলন শুরু হল। কার্তিনি নামে যবদ্বীপীয় এক সুলতান-কন্যা ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রথমে মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ে সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার অতীত ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি শিক্ষা দেওয়া হত। কার্তিনির ধারণা ছিল যে নারী-জাগরণ ব্যতীত ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তা আন্দোলন সম্পূর্ণ হতে পারে না।

১৯০৮ সনে 'বুড়ি উতোমো' (উচ্চ আকাঙ্ক্ষা) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় মর্যাদা বিকশিত করা। বুড়ি উতোমোর সদস্য-সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেল, কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার উচ্চবংশের মধ্যেই তারা সীমাবদ্ধ ছিল। সেইজন্য বুড়ি উতোমো কখনও গণ-আন্দোলনে পরিণত হতে পারে নি।

এডুয়ার্ড ডুয়েস্ ডেকার নামে এক ইউরোপীয় ১৯১২ সনে ইণ্ডিয়ান পার্টি প্রতিষ্ঠা করে ঘোষণা করেন যে যারা ইন্দোনেশিয়াকে স্বদেশ

বলে মনে করবে, তারাই এখানে থাকতে পারবে। প্রথম প্রথম এই দল জনপ্রিয় হলেও ওলন্দাজ আমলাতন্ত্রের বিষ-নজরে পড়ার ভয়ে এই দল বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি।

কিন্তু ইন্দোনেশীয় জনসাধারণের প্রথম এবং প্রধান মুখপাত্র সংস্থা হল সারেকৎ ইসলাম বা ঐস্লামিক সমিতি। এই সমিতির জন্ম কিন্তু রাজনৈতিক কোন কারণে নয়, প্রতিষ্ঠার কারণ সম্পূর্ণ আঞ্চলিক এবং অর্থনৈতিক। ওলন্দাজ শাসনে ইন্দোনেশীয় জনসাধারণ তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছিল। প্রথম শ্রেণীতে ছিল বিজয়ী ওলন্দাজেরা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল বিদেশী চীনারা। ওলন্দাজের পক্ষ-ছায়ায় চীনারা ইন্দোনেশিয়ার সমস্ত ব্যবসা কুক্ষিগত করেছিল। বটিক-শিল্প তখনও ইন্দোনেশীয়দের হাতে ছিল। এই বটিক-শিল্পটিকেও চীনারা হস্তগত করার চেষ্টা করায় ইন্দোনেশীয়রা বাধা দেওয়ার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে 'সারেকৎ ইসলাম' সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সারেকৎ ইসলাম অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এই সমিতির সভাপতি হন চোক্রোয়ামিনোতো নামে সুরাবায়ার এক শিল্পপতি। তাঁর প্রচেষ্টায় এই দলের প্রভাব এবং সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। যদিও ওলন্দাজ সরকারের বহিদৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এই সমিতিটি একটি অরাজনৈতিক সমিতি বলে জাহির করত, কিন্তু রাজনীতিকে তারা প্রশ্রয় দিতে কার্পণ্য করে নি বরং আদি জাতীয়তাবাদী সমস্ত আন্দোলনের পুরোধা হয়েই তারা দাঁড়িয়েছিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মোহম্মদীয়া নামে আরও একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল। এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাবিস্তার এবং সমাজসেবা।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ড থেকে ইন্দোনেশিয়াতে এলেন হেনরিক স্নীভলিয়েট। ইনি হল্যাণ্ডের সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির (ভবিষ্যৎ কমিউনিস্ট পার্টি) এক বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। ইন্দোনেশিয়াতে

এসে স্নীভলিয়েট ইণ্ডিস্ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক এ্যাসোসিয়েশন পত্তন করলেন। এই মার্ক্সবাদী সমিতি কালক্রমে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিতে (পার্তাই কোমুনিস ইন্দোনেশিয়া বা পি. কে. আই.) পরিণত হয়। লেবার পার্টি জনসাধারণের মনে বিশেষ সাড়া জাগাতে পারে নি, সারেকৎ ইসলাম-ই তখন জনসাধারণের ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। সুতরাং লেবার পার্টির সভ্যেরা সারেকৎ ইসলামে অনুপ্রবেশ করে সেটিকে বৈপ্লবিক পথে চালিত করার চেষ্টা করে। এই নিয়ে মধ্যপন্থী নেতাদের সঙ্গে মার্ক্সবাদী নেতাদের বিরোধ বাধল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে চোক্রোয়ামিনোতোর নেতৃত্বে মধ্যপন্থী দল এবং সেমোন ও তান মালাকার নেতৃত্বে মার্ক্সবাদী দল সারেকৎ ইসলামের কংগ্রেসে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হল। মধ্যপন্থী দলের আগুস সেলিম সেই কংগ্রেসে ঘোষণা করলেন যে মহম্মদ কার্ল মার্ক্সের বারো শতাব্দী আগে সমাজবাদ প্রচার করে গেছেন এবং বর্তমান সমাজবাদ লোকের চোখে ধুলো দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। মার্ক্সবাদী দল পরাজিত হয়ে সারেকৎ ইসলাম ত্যাগ করে 'লাল' সারেকৎ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করল.।

'লাল' সারেকৎ ইসলাম ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যোগ দিয়ে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ করে চিনিকলে ধর্মঘট করালো। তারপর তারা ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপ এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে সুমাত্রায় বিদ্রোহ ঘোষণা করল। ওলন্দাজেরা ভয়াবহ রক্তপাতের মধ্য দিয়ে নির্মম হাতে এই বিদ্রোহ দমন করল। তের হাজার লোককে তারা গ্রেফতার করে, ছয় হাজারের অধিক লোককে তারা দ্বীপান্তরিত করে।

কমিউনিস্ট দলের এই হঠকারিতার ফলে ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের মনোভাব ইন্দোনেশিয়ার প্রতিটি সমিতির ওপর অত্যন্ত কঠোরভাব ধারণ করে। কিছুদিনের জন্য জাতীয়তাবাদ আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়। সকলের মনে চরম হতাশা সৃষ্টি হল।

এদিকে হল্যাণ্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রেরা হল্যাণ্ডে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে পেরহিমপুনান ইন্দোনেশিয়া (ইন্দোনেশীয় সমিতি) প্রতিষ্ঠা করে। এই সমিতি ছিল বামপন্থী জাতীয়তাবাদী দল। ইন্দোনেশীয় ছাত্রদের মধ্যে এই দল অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই দলের কয়েকজন সভ্য পাঠ সমাপনান্তে ইন্দোনেশিয়ায় ফিরে এসে দেশের রাজনৈতিক সংগঠনগুলির বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে পেরহিমপুনান ইন্দোনেশিয়ার আদর্শগত একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করায় বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠলেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন পার্তাই নাশিওনাল ইন্দোনেশিয়া বা পি. এন. আই. প্রতিষ্ঠিত হল। এই দলের সভাপতি হলেন ইন্দোনেশিয়ার যুবগোষ্ঠীর অন্যতম জনপ্রিয় নেতা সুকর্ণ। সুকর্ণ হল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন না, কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন বলেই দলের নেতৃত্বের ভার তাঁর ওপর পড়ল। জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সংগ্রামে পি. এন. আই শুধু নেতৃত্ব গ্রহণ করল না, সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠল। এই পি. এন. আই-এর যুব-সংস্থা পেরমুদা ইন্দোনেশিয়া ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে 'যৌবনের শপথ' গ্রহণ করে লাল ও সাদা রঙের সমন্বয়ে জাতীয় পতাকা, জাতীয় ভাষা হিসেবে 'বাহাসা ইন্দোনেশিয়া' এবং জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে 'ইন্দোনেশিয়া রায়া' (বৃহত্তর ইন্দোনেশিয়া) ঘোষণা করল। রাজনৈতিক দল-নির্বিশেষে সেদিন প্রত্যেকে এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করে নেয়।

পি. এন. আই-এর ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং জনসাধারণের ওপর প্রভাব লক্ষ্য করে ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে উঠল। এই সংগঠনকে অঙ্কুরে বিনাশ করার জন্য ১৯৩০ সনে সুকর্ণ সমেত পি. এন. আই-এর নেতৃবৃন্দকে তারা কারাগারে নিক্ষেপ করে পি. এন. আইকে অবৈধ ঘোষণা করল। নেতৃত্বহারা হয়ে দলের সভ্যরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল গঠন করল পার্তাই ইন্দোনেশিয়া,

অপর দল গঠন করল গোলোনিয়ন মের্দেকা (স্বাধীনতা দল)। হল্যাণ্ডের পেরহিমপুনান ইন্দোনেশিয়ার সভাপতি ডক্টর মহম্মদ হাত্তা এবং ছাত্রনেতা সুতান শাহরির বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে দেশে ফিরলেন। তাঁরা গোলোনিয়ন মের্দেকা দলে যোগদান করলেন। এই দলের নাম পরে পরিবর্তিত করে পেনদিদিকান নাশিওনাল ইন্দোনেশিয়া (ইন্দোনেশীয় জাতীয় শিক্ষা সংস্থা) রাখা হল। এই দলের উদ্দেশ্য হল জাতীয় সংগ্রামের জন্য প্রকৃত নেতা তৈরি করা। এই দলে যোগদান করলেন ইন্দোনেশীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, কিন্তু জনসাধারণ এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহশীল হল না।

পার্তাই ইন্দোনেশিয়া কিন্তু খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে সুকর্ণ পার্তাই ইন্দোনেশিয়াতে যোগ দিলেন। ১৯৩৩ সনে ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ আবার সুকর্ণকে কারাগারে নিক্ষেপ করল। কঠোর হাতে রাজনৈতিক আন্দোলন দমন করা হতে লাগল এবং রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার করা হল। ১৯৩৪ সনে ডক্টর হাত্তা ও শাহরিরকে বন্দী করে ওলন্দাজ সরকার নিউগিনি-স্থিত বোভেনদিগুলে অন্তরীণ করে রাখল এবং ১৯৪২ সনে জাপানী অভিযান পর্যন্ত তাঁরা ওখানে বন্দী অবস্থাতেই ছিলেন।

বিশিষ্ট নেতাদের গ্রেফতারের ফলে রাজনৈতিক আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ল। ১৯১৭ সনে ওলন্দাজরা সরকারকে শাসন-ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য ফোকস্রাদ বা লোক-সভা প্রতিষ্ঠা করেছিল। এতদিন জনসাধারণ এই লোকসভার নির্বাচনে উৎসাহী ছিল না। ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জনকারী ইন্দোনেশীয় সম্প্রদায়ই এই লোক-সভায় নির্বাচিত হতেন। এবার জাতীয়তাবাদী নেতারা এই লোক-সভায় প্রবেশের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলেন। বাইরে থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চাপা পড়ে গেল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে জনসাধারণ অস্থির হয়ে উঠল। ইন্দোনেশিয়ার শাসন-ব্যবস্থায় তারা অধিকার দাবী করল।

প্রত্যুত্তরে ইন্দোনেশিয়ার ওলন্দাজ গভর্ণর জেনারেল য়োনথীর ডু য়োঙ্গে বললেন : 'We have ruled here for three hundred years with the whip and club and we shall still be doing it for another three hundred years. After that we can talk."

ওলন্দাজদের এই অসহযোগী মনোভাব এবং অবজ্ঞা নরমপন্থী ইন্দোনেশীয় নেতাদেরও বিক্ষুব্ধ করে তুলল। আমির শরিফুদ্দীন এবং মহম্মদ ইয়ামিন ১৯৩৭ সনে গেরাকান রাকিয়াৎ ইন্দোনেশিয়া প্রতিষ্ঠা করে লোকসভার মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের দাবী তুললেন।

১৯৩৯ সনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধল। জার্মানি হল্যাণ্ড আক্রমণ করে কয়েকদিনের মধ্যেই তা দখল করেনিল। এই বিপর্যয়ে ইন্দোনেশীয় নেতারা তাঁদের সহযোগী হাত বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ তাতে এতটুকু সাড়া দিল না। উপরন্তু তাদের শাসন আরো কঠিন হয়ে উঠল।

চারদিকে যখন হতাশার অন্ধকার তখন হঠাৎ ইন্দোনেশীয় জনসাধারণ বিদ্যুতের আভাস দেখতে পেল। জাপান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। এই প্রবল পরাক্রান্ত এশীয় শক্তির দ্রুত অগ্রগতি তারা পরম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগল।

৬

১৯৪১ সনের ৭ই ডিসেম্বর।

সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বর্বর ইউরোপীয় শক্তির পদানত দেশসমূহের কাছে এক স্মরণীয় দিন। এই দিন দুর্মদ এশীয় শক্তি জাপান ইউরোপীয় শক্তির যুদ্ধের খেলায় ইউরোপীয় শক্তিকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল। জাপান আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল ৭ই ডিসেম্বর ১৯৪১ সনে। প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার সর্বপ্রধান নৌ-ঘাঁটি পার্ল হারবার আক্রান্ত হল সেইদিন। আমেরিকার আটটি বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ ও একটি মাইন-স্থাপক জাহাজ জাপানী বোমারুর আক্রমণে নিমজ্জিত হল।

জাপানের তখন তেলের অত্যন্ত অভাব। এই অফুরন্ত তৈল-সম্পদ আছে ওলন্দাজ অধিকৃত ইন্দোনেশিয়ায়। স্থতরাং ইন্দোনেশিয়া অধিকারে জাপান অগ্রসর হল। পথের মাঝে পড়ল ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড (শ্যামদেশে), মালয়, সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ। ইন্দোচীন এবং থাইল্যাণ্ড অধিকৃত হল ৮ই ডিসেম্বর, মালয় ১০ই ডিসেম্বর, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ২রা জানুয়ারি, ১৯৪২, ব্রহ্মদেশ মার্চ মাসে।

১৯৪২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষাশেষি সিঙ্গাপুর থেকে যবদ্বীপ আক্রমণের জন্য জাপান তৈরি হল। জাপানের সঙ্গে ছিল চারটি বিমান-বাহী জাহাজ, চারটি যুদ্ধ-জাহাজ, বড় এবং ছোট ক্রুজার আর অনেক ডেস্ট্রয়ার। যবদ্বীপ রক্ষার দায়িত্ব ছিল মিত্রশক্তির হাতে। মিত্রশক্তির এই নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন ওলন্দাজ এ্যাডমিরাল ডোরম্যান। তাঁর অধীনে সংগ্রামের জন্য তৈরি ছিল দুটি বড় ডেস্ট্রয়ার—আমেরিকার

'হাস্টন' এবং ব্রিটেনের 'এক্সিটার', তিনটি হাল্কা ক্রুজার—ওলন্দাজদের 'জাভা' (ডোরমানের ফ্ল্যাগশিপ) ও 'দ্য রুইটার' এবং অস্ট্রেলিয়ার 'পার্থ' এবং এগারোটি ডেস্ট্রয়ার। ২৭শে ফেব্রুয়ারি উত্তরপূর্ব দিক থেকে ডোরমান জাপানী নৌবাহিনী আক্রমণ করলেন, কিন্তু সাত ঘণ্টা মাত্র লড়াইয়ের মধ্যেই মিত্রশক্তি তার অর্ধেক জাহাজ হারাল, জাপানের ক্ষতির মধ্যে একটি ডেস্ট্রয়ার। ২৮শে ফেব্রুয়ারি পলায়নরত 'পার্থ' এবং 'হাস্টন' নিমজ্জিত হল। যবদ্বীপে জাপান পদার্পণ করল মার্চ মাসে। ওলন্দাজ সৈন্যবাহিনী জাপানকে বাধা দিতে অগ্রসর হল, কিন্তু রণ-কুশলী জাপানের ক্ষিপ্রগতি এবং প্রলয়ঙ্করী রণনীতির কাছে তারা প্রতিনিয়তই পরাজিত হতে লাগল। এক মাসেরও কম সময়ে সমগ্র ইন্দোনেশিয়া জাপানের অধিকারে এল। ১৯৪১ সনের ৭ই ডিসেম্বর পার্ল হারবার আক্রমণ করার পরে মাত্র কয়েকমাসের মধ্যেই সমগ্র পূর্ব এশিয়া জাপান অধিকার করেছিল মাত্র চার লক্ষ সৈন্য নিয়ে।

ইন্দোনেশিয়ায় জাপানী অভিযানে ইন্দোনেশীয়রা উল্লসিত হয়ে উঠল। এতদিন পরে অত্যাচারী ইউরোপীয় শক্তি ওলন্দাজদের হটিয়ে দিয়ে এশীয় শক্তি জাপান এসেছে তাদের মুক্তিদাতা হয়ে। ইন্দোনেশীয়রা সহর্ষে তাদের জাতীয় পতাকা ঘরে ঘরে উত্তোলন করে জাপানীদের স্বাগত সম্বর্ধনা জানাল। ওলন্দাজ ভাষা ত্যাগ করে বাহাসা ইন্দো-নেশিয়া বলতে শুরু করল। এশীয় সংহতির জয়গান করতে লাগল। জাপানীরা সমস্ত ওলন্দাজ কর্মচারীকে বন্দী করায় সরকারী এবং বেসরকারী সমস্ত দফতরে ইন্দোনেশীয়রা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হল। সমগ্র ইন্দোদেশিয়া জুড়ে আনন্দ কলরব।

কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তাদের ভুল ভেঙে গেল। তারা বুঝতে পারল যে ওলন্দাজদের চেয়ে জাপানীরা খুব ভাল হবে না। জাপানীরা তাদের পরাধীনতার থেকে মুক্তি দিতে আসে নি, এক পরাধীনতা থেকে আর এক পরাধীনতার শিকল পরিয়ে দিতে এসেছে।

জাতীয়তাবাদী নেতাদের মধ্যে কর্মপন্থা নিয়ে মতদ্বৈধ দেখা দিল। সুকর্ণ এবং ডক্টর হাত্তা জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে স্বাধীনতা আদায় করার মনস্থ করলেন। শাহরির তাঁর দলবল নিয়ে আত্মগোপন করলেন এবং জাপানীদের বিরুদ্ধে গেরিলা সংগ্রাম করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পি. কে. আই দলের সুকর্ণী আর এক গেরিলা-বাহিনী গঠন করলেন। রুসল আবদুল গণি এবং সুবন্দ্রিয়ো আর একটি দল গঠন করলেন। সুকর্ণের দলে ছিলেন আমির শরিফুদ্দীন আর চইরুল সালে। এঁরা প্রত্যেকেই ইন্দোনেশিয়ার ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

শাহরির অসুস্থতার অজুহাতে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য জার্কতার কাছাকাছি চিপানাস শৈলাবাসে তাঁর বোনের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পাহাড়ের ওপর থেকে গোপন রেডিওর মাধ্যমে যুদ্ধের প্রকৃত সংবাদ আহরণ করা এবং এই সংবাদ জাতীয়তাবাদী নেতাদের বিতরণ করা। সুকর্ণের ওপর ভার পড়েছিল জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধে সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্য জনবল সংগ্রহ করা এবং হাত্তা জাতীয়তাবাদী নেতা ও জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে যোগসূত্র বজায় রাখতেন।

১৯৪৩ সনের শেষাশেষি মিত্রশক্তির আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য জাপানীরা ইন্দোনেশিয়ার যুবকদের নিয়ে প্রতিরক্ষা বাহিনী (সুকরেলা তেন্তারা পেম্বেলা তানা এয়ার বা পেতা) গঠন করল। এই প্রথম অস্ত্রধারণের সুযোগ পেয়ে ইন্দোনেশীয়রা দলে দলে 'পেতা'য় যোগদান করল। এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীদের সভায় সুকর্ণ এবং হাত্তা বক্তৃতা দিতেন। ফলে 'পেতা'র মধ্যে রাজনীতির খেলা চলতে লাগল। ইন্দোনেশীয় তরুণদল জাপানী অধিকার আর বরদাস্ত করতে পারছিল না। সুকর্ণ এবং হাত্তার উপদেশ এবং নিষেধ শুনতেও আর তারা সম্মত ছিল না। তাদের অসন্তোষে ইন্ধন জুগিয়ে যাচ্ছিল শাহরির আর

সুকর্ণীর গেরিলাবাহিনী। ১৯৪৪ সনে পূর্ব যবদ্বীপের ব্লিতারে জাপানের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষিত হল। জাপানীরা নির্মমভাবে এই বিদ্রোহ দমন করল, কিন্তু ছাত্রসমাজ জাপানীদের বিরুদ্ধে আন্তর্ঘাতী কাজে লিপ্ত হল।

যুদ্ধে জাপানীদের সাফল্য খুব বেশিদিন চলে নি। ১৯৪৩ সনের শেষের দিক থেকেই মিত্রশক্তি জাপানীদের হাত থেকে এক একটি দেশ ছাড়িয়ে নিতে শুরু করে। জয়ের চেয়ে পরাজয়ের সংখ্যাই বেশি। যতই পরাজয়ের সংখ্যা বাড়তে লাগল ততই ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের দমননীতি শিথিল হতে লাগল। ১৯৪৪ সনের শেষাশেষি জাপান ইন্দোনেশিয়া সম্বন্ধে আর খুব বেশি উৎসাহী রইল না। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতারা এই পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। চিপনাস থেকে শাহরির সকলকে বিনা সর্তে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বার বার উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। সুকর্ণের কিন্তু মনে সন্দেহ ছিল। তাঁর মনে হয়েছিল যে হয়তো জাপান এই পরাজয়ের ধাক্কা সামলিয়ে আবার আগেকার মতো শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তাই হঠাৎ স্বাধীনতা ঘোষণায় তিনি দ্বিধান্বিত হলেন।

যুদ্ধের গতি দেখে জাপানীরা ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া মনে মনে স্থির করে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সমিতি বা বাদন পেনিয়েলি-দিক কেমেরাদেকান ইন্দোনেশিয়া প্রতিষ্ঠা করল। এই সমিতিতেই সুকর্ণ ১৯৪৫ সনের ১লা জুন প্রথম তাঁর বিখ্যাত পঞ্চশীল উপস্থাপন করেন। পঞ্চশীল হল—এক ঈশ্বরে বিশ্বাস, মানবিকতা, জাতীয়তাবাদ, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার এবং সাম্য। এই বক্তৃতায় জাপানীরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, কিন্তু দেশের জনসাধারণের মধ্যে এই ভাষণ তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করল। এই পঞ্চশীল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলমন্ত্র হয়ে দেখা দিল।

১৯৪৫ সনের জুলাই মাসের শেষের দিকে জাপানী কর্তৃপক্ষ বুঝতে

পেয়ে যান যে মিত্রশক্তির কাছে তাঁদের পরাজয় অবধারিত এবং দু' এক মাসের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করতে হবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানী অধিকৃত দেশসমূহে যাতে ভবিষ্যতে ইউরোপীয় শক্তি আর পাকাপাকি শিকড় না গাড়তে পারে, তার জন্য তারা ইন্দোনেশিয়াকে সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার জন্য ইন্দোনেশিয়ার জন-প্রতিনিধি হিসেবে সুকর্ণ এবং হাত্তাকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের দালাতে আঞ্চলিক সামরিক কার্যালয়ে আহ্বান জানান। স্বাধীনতার কথা পাকাপাকি করে অগাস্ট মাসের প্রথম দিকে জাকর্তায় ফিরে এসে তাঁরা দেখলেন যে ইন্দোনেশিয়ার গুপ্তসমিতিগুলি স্বাধীনতা দেওয়ার অপেক্ষা না রেখেই প্রকাশ্যে জাপানীদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। শাহরির তাঁর লুকোনো বাসস্থান থেকে রেডিও মারফৎ সংবাদ পেয়েছিলেন যে জাপানীরা যে-কোন মুহূর্তে আত্ম-সমর্পণ করতে পারে। রেডিও মারফতই তিনি জানতে পারছিলেন যে যুদ্ধ-বিরতির কথাবার্তা চলছে। তিনি দেশবাসীকে জোর করে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু সুকর্ণ এবং হাত্তা শাহরিরের সঙ্গে একমত হতে পারছিলেন না। তাঁরা চাইছিলেন যে শান্তির সঙ্গে এবং আইনমাফিক ক্ষমতা হস্তান্তর।

ছাত্রদল সুকর্ণ এবং হাত্তার এই দ্বিধান্বিত মনোভাবে অধৈর্য হয়ে পড়ল। ১৯৪৫ সনের ১৬ই আগস্ট ভোরবেলায় তারা হাত্তা এবং স্ত্রী-পুত্র সমেত সুকর্ণকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে জাকর্তার উপকণ্ঠে একটি বাড়িতে বন্দী করে রাখল। তাদের দাবী, এই মুহূর্তে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে হবে। তাঁরা জানতে পারলেন যে তার আগের দিন জাপান আত্ম-সমর্পণ করেছে। জাপান তখন মিত্রশক্তির করতলগত এবং আইনতঃ জাপান মিত্রশক্তির অধীনস্থ একটি দেশের স্বাধীনতা দিতে পারে না। সারা রাত ধরে আলাপ-আলোচনার পরে ১৭ই অগস্ট

সকাল দশটার সময়ে জাকর্তার ছাপ্পান্ন নম্বর পেঙ্গার্গসান টিমোর-স্থিত সুকর্ণের বাড়িতে ইন্দোনেশিয়ার লাল-সাদা রঙের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হল এবং ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণের প্রতিভূরূপে সুকর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন।

সুকর্ণ-হাত্তার নেতৃত্ব ইন্দোনেশিয়ার জন-সাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনন্দিত করায় এবং সুকর্ণ-হাত্তার আন্তরিকতাতে তাঁর বিশ্বাস হওয়ায় শাহরির গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে এসে জাপান-বিরোধী গুপ্ত সমিতিদের সুকর্ণ-হাত্তা গোষ্ঠীর পতাকার নীচে এসে দাঁড়াতে বললেন। সারা দেশে আনন্দ ও উদ্দীপনার জোয়ার বয়ে গেল। দেশের নেতারা দলাদলি ও বিভেদ ভুলে সকলে একত্র হলেন দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য। ইন্দোনেশিয়ায় গণতন্ত্র ঘোষিত হল। সুকর্ণ নির্বাচিত হলেন প্রেসিডেণ্ট, হাত্তা হলেন ভাইস প্রেসিডেণ্ট, শাহরির হলেন প্রধান মন্ত্রী। তাঁরা দেশের বিচক্ষণ ১৩৫ জন লোক নিয়ে একটি জাতীয় সমিতি স্থাপন করলেন। এই সমিতি দেশের একটি সংবিধান রচনা করল। এই সমিতিই শেষে রূপান্তরিত হল লোকসভাতে। লোক-সভা নির্বাচন করল ১৬ জনের একটি মন্ত্রীসভাকে, এই মন্ত্রীসভা চলবে প্রেসিডেণ্টের নির্দেশমতো।

ছয় সপ্তাহ ধরে এই তরুণ স্বাধীন রাষ্ট্র জাপানী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে খণ্ড-যুদ্ধে লিপ্ত হল। ইন্দোনেশিয়ার নব-প্রতিষ্ঠিত তরুণ সৈন্যদল জাপানী সৈন্যদের কাছ থেকে জোর করে অস্ত্রশস্ত্র ছাড়িয়ে নিতে লাগল। তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে ওলন্দাজরা আসবেই, আর তাদের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে রাখা তাদেরও একান্ত প্রয়োজন।

২০শে সেপ্টেম্বর মিত্রশক্তির মধ্যে প্রথম ব্রিটিশ সৈন্য জাকর্তায় অবতরণ করল। ইন্দোনেশিয়া তখন স্বাধীন। দেশ তখন শান্ত, আবহাওয়া থমথমে এবং সমগ্র ইন্দোনেশিয়া নব-প্রতিষ্ঠিত সরকারের কঠিন মুষ্টির অভ্যন্তরে।

ইন্দোনেশীয়রা ব্রিটিশ সৈন্য অবতরণ শীতল দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল। তাদের নবলব্ধ স্বাধীনতাকে কি ব্রিটিশরা ছিনিয়ে নিয়ে আবার তাদের দেশকে ওলন্দাজদের হাতে সমর্পণ করবে?

সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় ঝড়ের পূর্বাভাস দেখা গেল।

কাণ্ডারী হুঁসিয়ার!

ঝড় বয়ে গেল সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার ওপর দিয়ে।

ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর অবতরণের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এই তরুণ রাষ্ট্রের নাভিশ্বাস উপস্থিত হল। দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল। পলায়িত ইউরোপীয় শক্তির আবার থাবা মারবার চেষ্টা। তারা বুঝে উঠতে পারে নি যে জাপানী অধিকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাতীয়তাবোধ উন্নয়নে প্রচুর সাহায্য করেছে। পাশ্চাত্য শক্তির সার্বভৌম এবং অজেয় ক্ষমতাকে যে জাপানীরা শুধু চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল তা-ই নয়, পাশ্চাত্য শক্তির মর্যাদাও তারা চিরকালের জন্য এই অঞ্চলে নির্মূল করে দিয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৫ সনের ১৫ই অগাস্ট জাপান যখন আত্মসমর্পণ করল তখন এইটুকু অন্ততঃ পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল যে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা আর এই অঞ্চলে ফিরিয়ে আনা যাবে না।

কিন্তু ওলন্দাজরা কালের লিখন পড়তে শেখে নি। পূর্ব ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জ হাতছাড়া করতে তারা ছিল একেবারে নারাজ। নব-প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সরকার সর্ববিষয়ে অবৈধ, এই দেশ শাসন করার একমাত্র অধিকার রয়েছে ওলন্দাজ সরকারের।

অধিকার থাকতে পারে কিন্তু ক্ষমতা কোথায়?

পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এলাকায় অস্ত্রধারী কারা?—প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের ব্রিটিশ, অস্ট্রেলিয়ান এবং আমেরিকান সৈন্যবাহিনী, যে জাপানী সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র রাখতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তারা এবং ইন্দোনেশীয় গেরিলা-বাহিনী। ওলন্দাজদের সেখানে ছিল না কিছুই —না ছিল একটি সৈন্য, না ছিল একটি নৌ-সেনা, না ছিল কোন

বিমানবাহিনী এবং না ছিল কোন কর্মচারী। তবু ওলন্দাজরা এই দেশের ওপর তাদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল।

জাপানের কাছ থেকে ইন্দোনেশিয়াকে মুক্ত করার ভার ন্যস্ত হল লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের ওপর।

এই সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠল নব-স্বাধীনতা-লব্ধ ইন্দোনেশীয় জন-সাধারণ। পলায়িত ওলন্দাজের শাসন-শৃঙ্খলে পুনরাবদ্ধ হয়ে থাকার মতো আর তাদের মানসিক অবস্থা ছিল না। ইউরোপীয় শক্তি-পুষ্ট রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দেশনামানুযায়ী ব্রিটিশ সৈন্যের অবতরণের অপেক্ষা করতে লাগল তারা বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে।

ওলন্দাজরাও নিশ্চিন্ত ছিল না। ওলন্দাজ সরকার পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করলেন ডক্টর হুবার্টাস ভ্যান মুক-কে। মাউন্টব্যাটেনের কলোম্বোস্থিত হেডকোয়ার্টার্সে ডক্টর চার্লস্ ভ্যান ডের প্লাসকে বিশেষ প্রতিনিধি করে পাঠালেন। ১৯৪৫ সনের ১লা সেপ্টেম্বর ভ্যান মুক এবং ভ্যান ডের প্লাস কলোম্বোতে মাউন্ট-ব্যাটেনের কাছে উপস্থিত হয়ে দাবী জানালেন ইন্দোনেশিয়াস্থিত জাপানী সৈন্য বাহিনীকে যেন নব-প্রতিষ্ঠিত ইন্দোনেশীয় গণতান্ত্রিক সরকারকে দমন করতে আদেশ দেওয়া হয়। তখনও মিত্রশক্তির কোন সৈন্যই ইন্দোনেশিয়ায় অবতরণ করে নি বলেই এই ব্যবস্থা। মাউন্ট-ব্যাটেন জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষকে এই আদেশ দিলেন। কিন্তু জাপানীরা এই আদেশকে কার্যকরী করতে গড়িমসি করতে লাগল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে আবার নতুন করে যুদ্ধে নামতে তাদের আর কোনরকম ইচ্ছা দেখা গেল না। ইন্দোনেশিয়ার চারদিকে ছড়িয়ে তখন প্রায় আশি হাজার ইন্দোনেশীয় সৈন্য রয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র বলতে যা-ই হোক্ না কেন, সংখ্যা হিসেবে নগণ্য নয়।

১৬ই সেপ্টেম্বর জাকর্তায় এসে উপস্থিত হলেন মাউন্টব্যাটেনের

সহকারী রেয়ার অ্যাডমিরাল প্যাটার্সন। তাঁর সঙ্গে এলেন ভ্যান ডের প্লাস। প্রথম ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী সীফোর্থ হাইল্যাণ্ডার্স ইন্দোনেশিয়ায় অবতরণ করল ২৬শে সেপ্টেম্বর। প্যাটার্সন ঘোষণা করলেন যে যতদিন না ওলন্দাজেরা সে দেশে এসে তাদের আইনসিদ্ধ অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় ততদিন এই সৈন্যবাহিনী দেশে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

প্যাটার্সন কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার তখনকার প্রকৃত অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি। জাপানের আত্ম-সমর্পণ, ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনীর অবতরণে প্রায় পাঁচ সপ্তাহ বিলম্ব ইন্দোনেশিয়ায় একটা অন্তর্বর্তী কাল সৃষ্টি হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে ইন্দোনেশীয়দের গণ-চেতনা এমনভাবে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল যে তাদের সংযত করা ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল। নতুন গণতান্ত্রিক সরকার দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানাল।

দেশের নেতাদের কারারুদ্ধ করে জনগণের ওপর শক্তি প্রয়োগ করলে পরে আভ্যন্তরীণ আন্দোলনকে দমন করা যাবে ভেবে ভ্যান মুক এবং ভ্যান ডের প্লাস ইন্দোনেশিয়ার বিশিষ্ট নেতাদের বন্দী করার জন্য অনুরোধ জানালেন। ওলন্দাজদের চাপে পড়ে প্যাটার্সন জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষকে অনুরূপ আদেশ দিলেন।

এই আদেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাল ইন্দোনেশিয়ার জন-সাধারণ। ইন্দোনেশিয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কোনরকম জড়িত না হওয়ার জন্য মাউন্টব্যাটেন প্যাটার্সনকে নির্দেশ দিলেন। মাউন্ট-ব্যাটেন তারপর ভ্যান ডের প্লাসকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন যেন তাঁরা সুকর্ণ এবং তাঁর সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একটা মীমাংসায় উপস্থিত হন। ভ্যান ডের প্লাস উত্তর দিলেন যে ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদীদের তাঁরা স্বীকার করেন না এবং তাদের

সরকার অবৈধ। মাউন্টব্যাটেন তখন স্পষ্ট জানালেন যে তবে তিনিই ইন্দোনেশিয়ার গণতান্ত্রিক সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবেন। ওলন্দাজরা চোখে অন্ধকার দেখল।

ব্রিটিশ ও অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যবাহিনী একে একে ইন্দোনেশিয়ায় উপস্থিত হতে লাগল। তাদের সঙ্গে অল্পসংখ্যক ওলন্দাজ সৈন্যও আসতে লাগল। জাপানী বন্দী-শিবির থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ওলন্দাজ সৈন্যরাও জমায়েত হতে বাদ গেল না। ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ এদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করতে লাগল।

ইন্দোনেশিয়াস্থিত মিত্রশক্তির সেনাবাহিনীর প্রধান লেঃ জেনারেল স্যার ফিলিপ ক্রিস্টিসনের কাছে এই কাজের বিরুদ্ধে সুকর্ণ তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। পথেঘাটে ওলন্দাজ এবং ইন্দোনেশীয়দের মধ্যে দাঙ্গা, মারামারি বেধে গেল। ব্রিটিশরা শঙ্কিত হয়ে উঠল। এই দুই যুধ্যমান দলের মাঝখানে পড়ে তারা অনর্থক মার খেতে রাজি ছিল না। তারা এই দুই দলের মধ্যে একটা আপোষের ব্যবস্থা করল, কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। ২৯শে অক্টোবর জেনারেল ক্রিস্টিসনের পৌরহিত্যে ভ্যান মুক এবং সুকর্ণ আলোচনায় বসলেন; কিন্তু ক্রিস্টিসন যখন জানালেন যে ব্রিটিশরা শুধুমাত্র ওলন্দাজ সরকারকেই স্বীকার করে, তখনই আলোচনা ভেঙে গেল। ওলন্দাজরা উল্লসিত হল বটে, কিন্তু ক্রিস্টিসন ইন্দোনেশিয়াতে আর নতুন করে ওলন্দাজ সৈন্য অবতরণ করতে দিলেন না।

ব্রিটিশদের কাছে সাহায্য পাওয়া যাবে না ধরে নিয়ে ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদী জনসাধারণ তাদের দেশকে বিদেশী আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হল। ব্রিটিশরা জাপানী সৈন্যদের সাহায্যে ইন্দোনেশীয় জনসাধারণের কাছ থেকে প্রধান প্রধান শহর ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। ব্রিটিশ ও ইন্দোনেশীয়দের মধ্যে বেধে গেল তীব্র সংগ্রাম। যবদ্বীপের সর্বত্রই এই রক্তক্ষয়ী বিশৃঙ্খলা।

২৫শে অক্টোবর ব্রিগেডিয়ার ম্যালাবির নেতৃত্বে ভারতীয় ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড সুরাবায়াতে অবতরণ করল। ইন্দোনেশীয়রা নীরবে তাদের লক্ষ্য করতে লাগল। ২৭শে অক্টোবর বিমান থেকে আকাশ হতে হ্যাণ্ডবিল ছড়িয়ে সুরাবায়ায় অধিবাসীদের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অস্ত্রত্যাগ করতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অনুরোধ জানাল। ইন্দোনেশীয়দের প্রথম থেকেই সন্দেহ হয়েছিল যে ব্রিটিশ রণতরীর পিছনেই ওলন্দাজ সৈন্যবাহিনী সুরাবায়াতে অবতরণের অপেক্ষায় আছে। তারা অস্ত্রত্যাগ করলেই ওলন্দাজরা ঝাঁপিয়ে পড়বে। সেইজন্য ম্যালাবির আদেশ তারা শুনল না। অস্ত্রত্যাগের সময় আরও চারদিন বাড়িয়ে দিলেন ম্যালাবি। ২৮শে অক্টোবর বিশ হাজার ইন্দোনেশীয় সৈন্য ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করল। তাদের সাহায্য করতে অগ্রসর হল লাঠি, সড়কি, তীর-ধনুক নিয়ে জন-সাধারণ।

অবস্থা এমন সঙ্গীন হয়ে উঠল যে নিরুপায় ব্রিটিশ সুকর্ণের দ্বারস্থ হল। সুকর্ণ এবং হাত্তা বাতাভিয়া থেকে সুরাবায়াতে ২৯শে এসে উপস্থিত হলেন। তখন শহরে হাতাহাতি যুদ্ধ চলছে। তাঁরা দুজনে শহরে প্রবেশ করতে পারলেন না। সুকর্ণের অনুরোধে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য দু'পক্ষ অস্ত্র সংবরণে সম্মত হল। সুকর্ণ এবং হাত্তা শহরে প্রবেশ করে দুই দলের মধ্যে যুদ্ধাবসানের একটি চুক্তি সম্পন্ন করলেন। শহর থেকে ওলন্দাজ নারী এবং শিশুদের স্থানান্তরিত করা হল। সুকর্ণ এবং হাত্তা ফিরে যাওয়ার পরই আবার যুদ্ধ বাধল এবং ম্যালাবি নিহত হলেন।

৯ই নভেম্বর রণক্ষেত্রে পঞ্চম ভারতীয় ডিভিশন এসে উপস্থিত হল। ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাদের ঘোরতর যুদ্ধ বাধল। ব্রিটিশ বোমারু বিমান সুরাবায়ার ওপর বোমা বর্ষণ করতে লাগল, কিন্তু ইন্দোনেশীয় জনসাধারণ পরাজয় স্বীকার করল না। সারা নভেম্বর মাস ধরে তারা অপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যেতে লাগল।

ব্রিটিশের সহায়তায় ওলন্দাজেরা পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কয়েক জায়গায় আবার তাদের শাসন প্রবর্তন করতে সক্ষম হল। তাদের রাজধানী সেই পূর্বতন বাতাভিয়া। গণতন্ত্র সরকার তাদের রাজধানী জাকর্তা থেকে জোগিয়াকর্তায় স্থানান্তরিত করল। জোগিয়াকর্তার দেশপ্রেমিক সুলতান ওলন্দাজদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের পক্ষে অস্ত্রধারণ করলেন।

ইন্দোনেশিয়ায় গণতন্ত্রের শক্তি কেন্দ্রীভূত ছিল যবদ্বীপ, মাত্বরা এবং সুমাত্রায়। ওলন্দাজেরা ব্রিটিশ সহায়তায় সহজেই বোর্ণিও অধিকার করে নিল। তারপর তারা নজর দিল বলীদ্বীপ এবং সেলেবিসের দিকে। বলীদ্বীপ ওলন্দাজ-শক্তির বিরুদ্ধে সদর্পে মাথা তুলে দাঁড়াল। বলীদ্বীপকে শায়েস্তা করার জন্য ওলন্দাজেরা কুখ্যাত ক্যাপ্টেন ওয়েস্টার্লিংকে আমদানি করল। ওয়েস্টার্লিং-এর নৃশংস এবং পাশবিক অত্যাচার সেই যুগকে একদিক দিয়ে যেমন কালিমালিপ্ত করে রেখেছে, অপর দিকে ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণের মৃত্যুঞ্জয়ী শৌর্য সেইরকম সপ্ন-সম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল করে তুলেছে।

ব্রিটিশ সরকার দোটানায় পড়ল। এটলি-সরকার পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ওলন্দাজদের হাতে তুলে দিতে প্রতিশ্রুত, কিন্তু ইন্দোনেশীয় স্বাধীনতা-কাঙ্ক্ষায় হস্তক্ষেপ করতেও দ্বিধান্বিত। তিনি দুই যুধ্যমান পক্ষকে তফাৎ রাখার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিব আর্নস্ট বেভিন পার্লামেন্টে ২৩শে নভেম্বর সেই কথাই জানালেন :

> Our Government had a definite agreement providing for the Netherlands East Indies Government to assume as rapidly as practicable the full responsibility for the administration of the Netherlands Indies territory, but we have no intention of being involved in any constitutional dispute between the

Netherlands and the people of the Netherland East Indies.

ব্রিটিশের মধ্যস্থতায় আলোচনা শুরু হল। গভর্ণর ভ্যান মুক ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী শাহরিরকে প্রস্তাব দিলেন যাতে সমগ্র ইন্দোনেশিয়া ওলন্দাজ এবং ইন্দোনেশীয়দের মধ্যে একটি গণতান্ত্রিক 'পার্টনারশিপ' রাজ্য গঠিত হবে এবং যতদিন না ইন্দোনেশীয় জনসাধারণ নিজেদের রাজনৈতিক ভাগ্য নিরূপণ করতে সক্ষম হয়, ততদিন এই 'পার্টনারশিপ' বলবৎ থাকবে।

শাহরির প্রশ্ন করলেন—যতদিন মানে কতদিন ?—বিশ বছর, ত্রিশ বছর ?

কোন উত্তর না পেয়ে শাহরির পাল্টা প্রস্তাব দিলেন : পূর্বতন ওলন্দাজ-শাসিত পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ওপর গণতান্ত্রিক সরকারের সার্বভৌম অধিকার, কোনও 'পার্টনারশিপ' নয়।

ভ্যান মুক স্বীকৃত হলেন না।

শাহরির আর একটা প্রস্তাব দিলেন : মাত্র যবদ্বীপ, মাদুরা এবং সুমাত্রার ওপর গণতন্ত্র সরকারের অধিকার হল্যাণ্ড মেনে নিক, বাদ বাকী থাক হল্যাণ্ডের অধীনে।

প্রথমে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন ভ্যান মুক। এত সুন্দর প্রস্তাব যে শাহরির করতে পারেন, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। মীমাংসার আলোকরেখা দেখতে পেয়ে তিনি খুশি হলেন।

১৯৪৬ সনের এপ্রিল মাসে আলাপ-আলোচনার জন্য ইন্দোনেশিয়ার নেতৃবৃন্দ হল্যাণ্ডে উপস্থিত হলেন। ইন্দোনেশিয়ার নেতৃত্ব করলেন প্রধানমন্ত্রী শাহরির, অপর পক্ষে নেতৃত্ব করলেন হল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ভিলেম শেরমেরহোর্ন।

আলোচনা ফলপ্রসূ হল না।

হল্যাণ্ডের অনমনীয় মনোভাবে গভর্ণর ভ্যান মুক বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ

করতে চাইলেন, কিন্তু প্রবল অনুরোধে তিনি গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত রইলেন। হল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়ায় সূচ্যগ্র ভূমিও ত্যাগ করতে সম্মত হল না।

ব্রিটিশ সরকার তখন ঘোষণা করলেন যে তারা নভেম্বর মাসের পরে আর পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কোন সৈন্য রাখতে পারবে না। এই ঘোষণায় ওলন্দাজরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল। ইন্দোনেশিয়ায় তাদের শক্তি খুব বেশি নয়, অথচ গণতন্ত্র সরকারের সৈন্যবাহিনী উপেক্ষণীয় নয়। ব্রিটিশ-বিহনে ইন্দোনেশীয় সৈন্যবাহিনী এবং জনসাধারণের সঙ্গে লড়াই করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তারা আবার আলোচনায় নামতে সম্মত হল। কিন্তু সে আলোচনাও দু দলের অনমনীয় মনোভাবে ব্যর্থ হল।

ইন্দোনেশীয় গণতন্ত্র যখন একসঙ্গে ব্রিটিশ ও ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত, ঠিক সেই সময়ে পিছন থেকে আর এক শত্রু গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে উদ্যত হল। গণতন্ত্রের দুর্বল অবস্থা দেখে কম্যুনিস্ট-নেতা তান মালাকা ১৯৪৬ সনের ৩রা জুলাই জোর করে শাসনক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করেন। জন-সাধারণের সমবেত জাগরণে তান মালাকার দুরভিসন্ধি কার্যকরী হল না। সাত দিনের মধ্যে তান মালাকা আত্ম-গোপন করতে বাধ্য হলেন।

এই সময় এই তরুণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া আর ভারতবর্ষ। ইন্দোনেশিয়ার জীবন-মরণ সংগ্রামের প্রথম কয়েকটি বছর এই তিনটি রাষ্ট্র পাশে না এসে দাঁড়ালে ইন্দোনেশিয়ার ভাগ্য-লিখন অন্যরকম হয়ে যেত। এই তিন রাষ্ট্র ব্রিটেন ও হল্যাণ্ডের ওপর চাপ দিতে লাগল যাতে ইন্দোনেশীয়দের সঙ্গে ওলন্দাজদের বিরোধের মীমাংসা হয়। এই চাপে পড়ে ব্রিটেন মধ্যস্থতা করতে সম্মত হয়।

শেষ পর্যন্ত ১৯৪৬ সনের ১৫ই নভেম্বর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটেনের

স্পেশাল কমিশনর লর্ড কিলিয়ার্ণের মধ্যস্থতায় লিঙ্গাদিয়ারি বা চেরিবোন চুক্তি সম্পাদিত হওয়াতে মীমাংসার একটা সূত্র খুঁজে পাওয়া গেল। তবে লিঙ্গাদিয়ারি চুক্তির সর্তের ত্রুটি এবং দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দুই পক্ষই নিজেদের সুবিধামতো ব্যাখ্যা করতে লাগল। ফলে প্রথম স্বাক্ষরিত চুক্তিটিতে আরো অনেক সর্ত সংযোজিত করে ১৯৪৭ সনের ২৫শে মার্চের আগে আর স্বাক্ষর করা সম্ভব হল না। কিন্তু এই চুক্তি কার্যকর করা নিয়ে আবার নতুন করে সমস্যা দেখা দিল।

ইন্দোনেশিয়াতে ততদিনে দেড় লক্ষ ওলন্দাজ সৈন্য এসে জড় হয়েছে। ইন্দোনেশীয় জনগণের কাছ থেকে দেশ অধিকার করা সহজ হচ্ছে না দেখে ১৯৪৭ সনের ২১শে জুলাই ওলন্দাজরা প্রথম সামরিক অভিযান শুরু করল। উচ্চতর অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ওলন্দাজ বাহিনীর কাছে ইন্দোনেশীয় সৈন্যবাহিনী পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হল। ওলন্দাজের অধীনে ইন্দোনেশিয়ার অনেক অঞ্চল চলে এল। প্রথমে সমগ্র ইন্দোনেশীয় জন-সংখ্যার পাঁচ ভাগের চার ভাগ ছিল জাতীয়তাবাদীদের এলাকায়, এই সামরিক অভিযানের ফলে তাদের অর্ধেক জনসংখ্যা ওলন্দাজদের অধিকৃত দেশে চলে গেল। এই ঘটনার ফলে শাহরিরের মন্ত্রীসভার পতন হল। শরিফুদ্দীন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন।
ভারতবর্ষ, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা এবং ব্রিটেন এই বিরোধের মীমাংসা করতে এগিয়ে এল, কিন্তু ওলন্দাজদের অনমনীয় মনোভাবে এই মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হল। ৩০শে জুলাই ভারতবর্ষ এবং অস্ট্রেলিয়া পৃথকভাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে এই ঘটনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১লা অগাস্ট নিরাপত্তা পরিষদ যুধ্যমান দুই দলকেই যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করতে নির্দেশ দেয়। ওলন্দাজেরা এই ঘটনাকে তাদের দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে এই সম্বন্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘের এখতিয়ার মানতে

উত্তর দিল যে যুদ্ধ-বিরতির প্রশ্নই ওঠে না, তবে যবদ্বীপে ৩১শে ডিসেম্বর এবং সুমাত্রায় আরো কিছুদিন পরে সংগ্রাম শেষ হবে।

ওলন্দাজদের এই ঔদ্ধত্যে বিশ্বমত তাদের বিরুদ্ধে তীব্র আকার ধারণ করল। এই পরিস্থিতিতে করণীয় কার্য স্থির করার জন্য জহরলাল নেহরু দিল্লীতে আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় রাষ্ট্রগুলির একটি অধিবেশন আহ্বান করলেন। ১৯৪৯ সনের ২৩শে জানুয়ারি তারিখে এই অধিবেশনে ইন্দোনেশিয়া গণতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিসূচক একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে ওলন্দাজদের অবিলম্বে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে এবং ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে বলা হল। পাঁচ দিন পরে নিরাপত্তা পরিষদেও ওলন্দাজদের অহেতুক আক্রমণ নিন্দা করে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হল। অবিলম্বে ইন্দোনেশিয়ায় গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে জোগিয়াকর্তা প্রত্যর্পণ করতে, সুকর্ণ-হাত্তা-শাহরির প্রমুখ নেতাদের মুক্তি দিতে এবং হল্যাণ্ডের সার্বভৌম অধিকার ইন্দোনেশিয়ার গণতন্ত্রকে হস্তান্তরিত করার একটি নির্দিষ্ট সময় স্থির করতে হল্যাণ্ডকে নির্দেশ দেওয়া হল। নিরাপত্তা পরিষদ পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত কনস্যুলার কমিটিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কমিশনে রূপান্তরিত করে নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশ যাতে বিধিবদ্ধ পালিত হয় তার ব্যবস্থা করতে সর্বপ্রকার ক্ষমতা অর্পণ করল।

বিশ্বমত হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র আকার ধারণ করেছিল। ওলন্দাজরা যখন বুঝতে পারল যে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে তাদের সর্বাত্মক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্বমত অগ্রাহ্য করে তা কিছুতেই সম্ভব নয়, তখন তারা তাদের নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হল। ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজদের ব্যবসা এবং অর্থলগ্নী রক্ষার বিনিময়ে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা ত্যাগ করাটাই বাঞ্ছনীয় মনে করল।

সুকর্ণ, হাত্তা, শাহরির এবং অন্যান্য নেতাদের তারা মার্চ মাসে মুক্তি

দিল। রাষ্ট্রসঙ্ঘ কমিশনের মধ্যস্থতায় স্থির হল যে, যে-গণতান্ত্রিক সরকারের কাছ থেকে ওলন্দাজরা জোগিয়াকর্তা ছিনিয়ে নিয়েছিল তাদের হাতেই তারা সেটি ৬ই জুলাই তারিখে প্রত্যর্পণ করবে এবং ইন্দোনেশিয়ার সম্বন্ধে রাজনৈতিক মীমাংসায় আসার জন্য উভয় পক্ষ একটি গোলটেবিল বৈঠকে বসবে। ১লা অগাস্ট যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হল।

এবার ২৩শে অগাস্ট। হল্যাণ্ডের হেগ-এ গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন বসল। হল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়ার গণতান্ত্রিক সরকার, অন্যান্য ইন্দোনেশীয় রাজ্য এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ কমিশনের তিনটি সদস্য এই বৈঠকে যোগ দিলেন। অনেক আলাপ-আলোচনার পর ২রা নভেম্বর বৈঠকের অধিবেশন শেষ হল। হল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়াকে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করতে স্বীকৃত হল। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ এই সর্ত অনুমোদন করল কিন্তু তার ছয় দিন পরে অনুরূপ একটি প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়া ভেটো প্রয়োগ করে নাকচ করে দেয়। রাশিয়া সুকর্ণ এবং হাত্তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করেছিল।

১৯৪৯ সনের ২৭শে ডিসেম্বর হল্যাণ্ডের রানী জুলিয়ানা আমস্টার্ডামে একটি পরোয়ানা সই করে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে ইন্দোনেশিয়া গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করলেন।

নতুন ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী হল বাতাভিয়া। বাতাভিয়া নামটি পরিবর্তন করে রাখা হল জাকর্তা।

৮

মেরদেকা ইন্দোনেশিয়া।

স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল ১৯৪৯ সনের ২৭শে ডিসেম্বর।

সুকর্ণ প্রেসিডেন্ট। প্রথম প্রধান মন্ত্রী ডক্টর মহম্মদ হাত্তা।

দেশ স্বাধীন হল, কিন্তু সম্পূর্ণ হল না। পশ্চিম ইরিয়ান ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হল না। ১৯৪৫ সন থেকে ১৯৪৯ সনের মধ্যে ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়ার পনেরটি স্বয়ংশাসিত রাজ্য গড়ে ইন্দোনেশিয়া গণতন্ত্রকে খণ্ডিত করে। স্বাধীনতা চুক্তির সর্তানুযায়ী গণতন্ত্র এবং এই পনেরটি রাজ্য নিয়ে একটি ফেডারেশন গঠন করা হল। ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ প্রভাব বলবৎ রাখার জন্যই তাদের এই রাজনৈতিক চাল। বিধানসভা এবং রাজ্যসভাতে এই পনেরটি রাজ্যের সভ্যের সংখ্যাধিক্য থাকবে। তার ফলে ওলন্দাজরা নিজেদের খুশিমতো সব কিছুই ইন্দোনেশিয়াতে করতে পারবে। তা ছাড়া ওলন্দাজদের নানারকম সুবিধার ব্যবস্থাও করে দিতে হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের আগ্রহে এই সমস্ত সর্ত গণতন্ত্রের পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও সুকর্ণ-হাত্তা-শাহরির মেনে নিয়েছিলেন। লাভের মধ্যে হল এই যে সমগ্র সামরিকবাহিনী গণতান্ত্রিক সরকারের কর্তৃত্বাধীনে এসেছিল।

এই ধরনের অবস্থাতে দেশ শাসন বেশিদিন চলতে পারে না। গণতান্ত্রিক সরকারের বহু প্রচেষ্টাই অন্যান্য রাজ্যের মারফৎ ওলন্দাজরা বানচাল করে দেবার চেষ্টা করল। ওলন্দাজদের মতলবে সন্দিহান হয়ে ১৯৫০ সনের জুলাই মাসে ইন্দোনেশীয় সরকার চুক্তির সর্তানুযায়ী

রচিত সংবিধান বাতিল করে দিল। ১৯৫০ সনে আবার একটি নতুন সংবিধান রচিত হল। এই সংবিধানে ফেডারেশন ভেঙে দিয়ে সমগ্র ইন্দোনেশিয়াকে একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা হল। ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা বানচাল করতে মনস্থ করে এবং তাদের চক্রান্তে ম্যাকাসার এবং আম্বোনে গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিল। কিন্তু সেই বিদ্রোহ গণতান্ত্রিক সরকার সহজেই দমন করতে সক্ষম হয়।

এই নতুন সংবিধানে সমগ্র দেশ একটি সরকারের শাসনাধীনে এল সত্য, কিন্তু আভ্যন্তরীণ শাসনে অত্যন্ত বেশি বিশৃঙ্খলা দেখা গেল। নতুন সংবিধানানুযায়ী মন্ত্রীসভা আর আগেকার মতো প্রেসিডেন্টের কর্তৃত্বাধীনে রইল না। পার্লামেন্টের কথানুযায়ী মন্ত্রীসভার কাজ করতে হবে। তার ফলে পার্লামেন্টের সভ্যদের মধ্যে মন্ত্রীসভাকে কুক্ষিগত করার পাল্লা চলতে লাগল। ফলে স্বার্থপুষ্ট রাজনীতিকরা দলাদলি শুরু করলেন। পার্লামেন্টে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে তেতাল্লিশে গিয়ে দাঁড়াল। মন্ত্রী হওয়া নিয়ে রাজনৈতিক খেলা চালু হল, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে কারুর দৃষ্টি দেবার আর অবকাশ রইল না।

প্রথম মন্ত্রীসভা গঠন করে ১৯৪৯ সনের ডিসেম্বর মাসে হাত্তা প্রধান মন্ত্রী হন। তাঁর সময়েই নতুন সংবিধান রচিত হয়। আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার দিকে এই মন্ত্রীসভা দৃষ্টি দিতে পারে নি, বৈদেশিক নীতিও তাদের খুব স্পষ্ট ছিল না। মোটামুটি হাত্তা এই স্থির করেছিলেন যে ইন্দোনেশিয়া শীতল যুদ্ধের কোন শক্তির দলেই যোগদান করবে না, ভারতের মতো নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করবে কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়া হবে সর্বপ্রধান শক্তি। পাশ্চাত্য দেশীয় প্রধান প্রধান রাষ্ট্র এবং নিরপেক্ষ কয়েকটি রাষ্ট্রের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার কুটনীতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হল। চীন ব্যতীত আর কোন কমিউনিস্ট

দেশে ইন্দোনেশিয়া প্রতিনিধি পাঠায় নি। অগাস্ট মাসে চীন এক রাষ্ট্রদূত জাকর্তায় নিয়োগ করল। ইনি পূর্বে সুমাত্রায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সহায়ক ছিলেন এবং তাঁর কার্যকলাপে বাধ্য হয়ে ওলন্দাজরা তাঁকে বিতাড়িত করে। তিনি সুকর্ণ এবং হাত্তাকে বুর্জোয়া নেতা বলে ঘোষণা করায় ইন্দোনেশীয় সরকার তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখেছিল।

পার্লামেন্টে দলাদলিতে বিরক্ত হয়ে হাত্তা ১৯৫০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে পদত্যাগ করেন। তাঁর পরিবর্তে মাসউমি দলের মহম্মদ নাৎসির প্রধানমন্ত্রী হলেন। ইনিও প্রায় হাত্তার বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে চলেছিলেন—একটু পাশ্চাত্য দেশপন্থী, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নয়। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের সহায়তায় ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিভিন্ন কমিটির সভ্য নির্বাচিত হয়েছিল। রাষ্ট্রসঙ্ঘে যখন কোরিয়ার যুদ্ধে কমিউনিস্ট চীনকে যুদ্ধবাজ বলে ঘোষণা করা হয়, ইন্দোনেশিয়া কোন পক্ষেই ভোট দেয় নি; কিন্তু হো চি মিনের উত্তর ভিয়েতনাম-সরকারকেও তারা স্বীকৃতি দেয় নি। ওলন্দাজদের সঙ্গে সম্পর্কও তিনি সৌহার্দমূলক রাখার চেষ্টা করেছিলেন এবং পশ্চিম ইরিয়ান নিয়ে কোনরকম উচ্চবাচ্য করেন নি। নিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষের সঙ্গেই ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্ক ছিল সবচেয়ে মধুর। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু ইন্দোনেশিয়া পরিদর্শনে যান এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণও ভারতের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

রাজনৈতিক দলাদলির ফলে মাসউমি দলের মধ্যে ভাঙন দেখা দিল। মুসলমান উলামারা এই দল ত্যাগ করে নাহদাতুল উলামা দল প্রতিষ্ঠা করলেন। ফলে মাসউমি দলের আটজন সভ্যসংখ্যা কমে গেল। নাৎসির-সরকার পদত্যাগ করল ১৯৫১ সনের এপ্রিল মাসে।

এবারে সুকিমানের নেতৃত্বে মাসউমি এবং সুকর্ণর দল পি. এন. আই একত্রিত হয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করল। ১৯৪৬ সনে তান মালাকার ব্যর্থ বিদ্রোহের অন্যতম নেতা সুবোরদিও হলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ইনিও

পূর্ববর্তী সরকারগুলির পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে চললেন। সুকিমানের প্রধান মন্ত্রিত্বের সময়েই চীনের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার প্রথম বিরোধ বাধে। চীনের রাষ্ট্রদূত ইন্দোনেশিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অনর্থক হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেন এবং কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচারের জন্য ষোল জন চীনা কর্মচারীকে কূটনৈতিক হিসেবে জাকর্তায় আনেন। সুকিমান-সরকার এই ষোলজনকে জাকর্তায় প্রবেশ করতে দেন না।

কিন্তু এই সরকার আর একটি ব্যাপারে এমন জড়িত হয়ে পড়ল যে শেষ পর্যন্ত তাদের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে হল। আমেরিকার স্যান ফ্রান্সিস্কোতে জাপানের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরে ইন্দোনেশীয় সরকার আমন্ত্রিত হয়েছিল। ইন্দোনেশিয়া এই নিমন্ত্রণ স্বীকার করেছিল এক সর্তে যে তারা খুশি হলে চুক্তিতে স্বাক্ষর না করতেও পারে। পার্লামেণ্টে বামপন্থী দল এবং তাদের সংবাদপত্রগুলি এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ নিয়ে খুব গোলমাল সৃষ্টি করল। তারা জানাল যে সুকিমান-সরকার পাশ্চাত্য শক্তির কাছে দাসখৎ লিখে দিয়েছে, কারণ ভারতবর্ষ এই নিমন্ত্রণ স্বীকার করে নি। সুবোরদিও এই চুক্তি স্বাক্ষর করলেন কিন্তু পি. এন. আই দলের চাপে এই চুক্তি-পত্র পার্লামেণ্টে পেশ করা গেল না, যার ফলে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়া সত্ত্বেও স্বীকৃত হল না।

সুকিমান-সরকার আমেরিকা-ঘেঁষা—এই দুর্নাম দূর করার জন্য সুবোরদিও ইন্দো-চীন, মালয় এবং উত্তর আফ্রিকার ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে গণসংগ্রামকে স্বাগত জানালেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনকে তাইওয়ান (ফরমোসা)-এর পরিবর্তে সভ্য করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। সুকিমান-সরকারের একটা ফাঁড়া কেটে গেল, কিন্তু সুবোরদিওর হঠকারিতায় আবার সঙ্কট ঘনিয়ে উঠল। সুকিমান মন্ত্রীসভার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করেই আমেরিকার কাছ থেকে অর্থ-সাহায্যের চুক্তি স্বাক্ষর করলেন এবং এই ব্যাপারটি একেবারে গোপন করে গেলেন। কিন্তু মাসখানেকের মধ্যেই এই

ব্যাপার জানাজানি হয়ে গেল। মাসউমি এবং পি. এন. আই দুই দলই সুকিমান-মন্ত্রীসভা থেকে সরে দাঁড়াল। ফলে ১৯৫২ সনের এপ্রিল মাসে সুকিমান পদত্যাগ করেন।

এবারে মন্ত্রীসভা গঠিত হল সুকর্ণর পি. এন. আই, শাহরিরের পি. এস. আই এবং মাসউমি দলের সহযোগিতায়। প্রধানমন্ত্রী হলেন উইলোপো। উইলোপো প্রথমেই ঘোষণা করলেন যে তাঁর সরকার আমেরিকার কাছ থেকে আর্থিক এবং যন্ত্রশৈল্পিক সাহায্য গ্রহণ শুধু করবে, কোনরকম সামরিক সাহায্য গ্রহণ করবে না। হল্যাণ্ডে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে হল্যাণ্ডের নতুন করে বিরোধ বাধল। নিউ গিনি বা পশ্চিম ইরিয়ান সম্বন্ধে কোন আলোচনাই ওলন্দাজ সরকার করতে চাইল না। উইলোপো-সরকার ওলন্দাজ সামরিক মিশনকে ইন্দোনেশিয়া থেকে বহিষ্কৃত করল। এই সময়ে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও বিশেষ গোলযোগ দেখা গেল। নতুন নির্বাচন পদ্ধতি এবং সেই সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন নিয়েও এই সরকারকে বহু তিক্ত সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। সামরিক বাহিনীর সঙ্গেও এই সরকারের বিরোধ উপস্থিত হয়।

কিন্তু উইলোপো-সরকারের পতন হল সামান্য একটি কারণে। সেই কারণটি হল প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের খেয়াল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে কলহে যখন ইন্দোনেশিয়া বিপর্যস্ত তখন সুকর্ণই সমস্ত দলকে একত্রিত এবং দেশের সংহতি বজায় রেখেছিলেন। ১৯৫০ সনের সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের বেশি ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু ক্ষমতা-প্রিয় সুকর্ণ তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। মন্ত্রীসভা যদি এমন কোন নীতির আশ্রয় নিত যা সুকর্ণের মনোমত নয় বা যার ফলে তাঁর বন্ধুবান্ধবের অসুবিধা হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাতে হস্তক্ষেপ করতেন। পূর্ব-সুমাত্রায় তামাক-পাতার চাষ-ভূমি জবরদখল করে অনেকে বসেছিল। উইলোপো সরকার তাদের সেখান থেকে সরিয়ে তামাক-পাতা চাষের

ব্যবস্থা করলেন। যবদ্বীপের নেতা সুকর্ণ এই ব্যবস্থা অনুমোদন করলেন না। বাধ্য হয়ে উইলোপো ১৯৫৩ সনের জুন মাসে পদত্যাগ করলেন।

সুকর্ণের পি. এন. আই এবং পি. কে. আই (কমিউনিস্ট পার্টি)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এবার আলি শাস্ত্রমিজোয়ো মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা তখনও ইন্দোনেশিয়াকে পঙ্গু করে রেখেছিল। আভ্যন্তরীণ শাসন-সংস্কার কিংবা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে কোন রাজনৈতিক নেতা বা দলের লক্ষ্য ছিল না। সকলেরই লক্ষ্য বৈদেশিক নীতির ওপর। স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্র যেন জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে। আলি শাস্ত্রমিজোয়ো অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গে বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করেন। তাঁর বৈদেশিক নীতি ছিল স্বাধীন এবং সক্রিয়। ইন্দোচীনে ফরাসীদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মীমাংসার চেষ্টার জন্য কলম্বো শক্তির বা ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার প্রথম বৈঠক ১৯৫৪ সনের এপ্রিল মাসে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনেই আলি শাস্ত্রমিজোয়ো বান্দুং অধিবেশনের প্রস্তাব তোলেন এবং পরের বছর ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনের ফলে বিশ্বের দৃষ্টি এই নতুন রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার ওপর পড়ে। বিশ্বরাজনীতির আসরে ইন্দোনেশিয়া প্রথম সারিতে আসন লাভ করে এবং আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রসমূহের অন্যতম নেতা হিসেবে পরিগণিত হয়।

এই বান্দুং অধিবেশনে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র যোগদান করে। কমিউনিস্ট চীনও এই অধিবেশনে যোগ দেয়। এই অধিবেশনে কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার দ্বিজাতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যে-কোন দেশেই যে-কোন চীনা থাকুক না কেন, চীন তাদের নিজেদের রাষ্ট্রের লোক বলে বরাবর স্বীকার করে নিত, কিন্তু এই চুক্তির ফলে যে চীনারা ইন্দোনেশিয়াকে স্বদেশ বলে স্বীকার করে নেবে তাদের ওপর

কমিউনিস্ট চীন কোন অধিকার দাবী না করতে স্বীকৃত হল। চীনের সঙ্গে এতদিন ইন্দোনেশিয়ার যে সন্দেহ এবং বিরোধ ছিল, আলি তা দূর করে সখ্যতার বাঁধন সুদৃঢ় করার চেষ্টা করলেন। এবার মস্কোর সঙ্গেও তিনি কূটনীতির সম্পর্ক স্থাপন করলেন। ওলন্দাজদের সঙ্গে সম্পর্কের কিন্তু কোনরকম উন্নতি হল না। পশ্চিম ইরিয়ানের অধিকার দাবী করে তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করলেন।

কিন্তু আলি শাস্ত্রমিজোয়োর মন্ত্রীসভাও দু'বছরের বেশি টি'কল না। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের হস্তক্ষেপে আলি ১৯৫৫ সনের অগাস্ট মাসে পদত্যাগ করলেন। এবার মন্ত্রীসভা গঠন করলেন বুহান্নুদ্দীন হরাতাপ। হরাতাপ আলির বৈদেশিক নীতির কমিউনিস্ট-প্রীতি বর্জন করে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে সৌহার্দ্য রক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। এমন কি, হল্যাণ্ডের সঙ্গে পশ্চিম ইরিয়ান সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনাও চালু করেন। কিন্তু হরাতাপের মন্ত্রিত্ব বেশিদিন স্থায়ী হবার ছিল না। ইন্দোনেশিয়ায় প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থার জন্যই তাঁকে মন্ত্রীসভা গঠন করতে দেওয়া হয়। হরাতাপের সময়েই দেশের প্রথম এবং শেষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। হরাতাপের মন্ত্রীসভা ভেঙে গেল ১৯৫৩ সনের জুন মাসে।

কিন্তু এই নির্বাচনের ফলে দেশের রাজনৈতিক সঙ্কট দূর হল না। কোন একটি দল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারল না। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল দেখে বোঝবার উপায় রইল না যে দেশের লোকে ঠিক কি চায়। সুতান শাহরিরের পি. এস. আই দলের পতনে সকলে আশ্চর্য হল। এতদিন তাদের আসনের সংখ্যা ছিল চোদ্দ, কিন্তু এই নির্বাচনে পেল মাত্র পাঁচটি আসন। পি. কে. আই বা কমিউনিস্ট পার্টির আসন-সংখ্যা দাঁড়াল সতের থেকে উনচল্লিশে। সুকর্ণর পি. এন. আই দলের আসন-সংখ্যা ৫৭ ; মাসউমি দলের আসন-সংখ্যাও ৫৭, কিন্তু এই দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নব-প্রতিষ্ঠিত দল নাহদাতুল উলামার আসন-সংখ্যা

আট থেকে উঠল পঁয়তাল্লিশে। প্রোটেস্ট্যান্ট দলের আসন আট, ক্যাথলিক দলের ছয়, মুর্বা দলের দুই, বাদ বাকী সব আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের। মোট সভ্য-সংখ্যা ২৫৭।

নির্বাচনের পর আলি শাস্ত্রমিজোয়ো আবার মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। এতদিন পরে 'পার্লামেন্টে ভোট যার সারা দেশে ক্ষমতা তার' প্রবাদ-বাক্যটি প্রমাণিত হতে লাগল। অসামাজিক দুর্বৃত্তরা সরকারী দলগুলির পক্ষছায়ায় সারা দেশে লুঠ, খুন করে সন্ত্রাসের ঝড় বইয়ে দিল। চতুর্দিকে অশান্তি, অসহায় দেশবাসীর হতাশা। বল-প্রয়োগে শাসন-ক্ষমতা দখল এবং আঞ্চলিক বিদ্রোহের গুজব ছড়িয়ে দেশকে শাসনের কঠিন নিগড়ে বাঁধা হল। ফলে প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সুয়েজ আক্রমণে বিচলিত হয়ে উঠে শাস্ত্রমিজোয়ো সরকার এই দুই দেশের প্রতি কঠিন বাক্য-বান হানলেন; কিন্তু রাশিয়ার হাঙ্গারি আক্রমণের ব্যাপারে রইলেন আশ্চর্য-নীরব। কয়েকদিন পরেই রাশিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়া লাভ করল তাদের প্রথম ঋণ আর সেই সঙ্গে হল্যাণ্ডের কাছ থেকে নেওয়া ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে তারা করল অস্বীকার। চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ও উত্তর ভিয়েৎনামের সঙ্গে বাণিজ্যিক সখ্যতায় আবদ্ধ হল ইন্দোনেশিয়া।

মে-জুলাই মাসে পশ্চিম ইউরোপ পরিভ্রমণ করলেন সুকর্ণ, আবার অগাস্ট-অক্টোবরে গেলেন রাশিয়া এবং চীনে। দিব্যজ্ঞান নিয়ে তিনি এবার ফিরে এলেন। রাশিয়া এবং চীন দেখে তাঁর দিব্যদৃষ্টি খুলে গিয়েছিল। দেশবাসীদের জানালেন যে ইন্দোনেশিয়ায় রাজনৈতিক দলগুলির ছেলেখেলা দেখে তিনি বরাবর ব্যথিত, এখন রাশিয়া এবং চীন দেখে এসে তিনি দেশবাসীকে সতর্ক করে দিতে চান। বললেন ঃ

> আমি ডিক্টেটর হতে চাই না। প্রকৃতপক্ষে আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। কিন্তু আমার গণতন্ত্র উদারপন্থী গণতন্ত্র নয়। আমাদের এই ইন্দোনে-

কিন্তু এই সময় থেকেই দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও গুরুতর আকার ধারণ করতে থাকে। মাসউমি এবং পি. এস. আই দল জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার সুযোগ নিয়ে দেশে আঞ্চলিক বিদ্বেষ প্রচার করতে শুরু করে। যবদ্বীপের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি, কিন্তু আকরিক বা বনজ সম্পদ অন্যান্য দ্বীপের তুলনায় নগণ্য। অন্যান্য দ্বীপের সম্পদ বিদেশে রপ্তানি করে সেই অর্থের বিনিময়ে চাল আমদানি করে যবদ্বীপের জনসাধারণের ভরণপোষণ নির্বাহ হয়। মাসউমি এবং পি. এস. আই দল এই বৈষম্য দেখিয়ে সমগ্র দেশে অসন্তোষ ছড়াতে লাগল।

সুমাত্রা এবং সুলাওয়েসি দ্বীপে সামরিক বাহিনীর মধ্যেও অসন্তোষ জমা হচ্ছিল। চারদিকে অর্থ নিয়ে যথেচ্ছাচার, অথচ সেনাবাহিনী বেতন পায় না। এই দ্বীপ দুটির সেনাধ্যক্ষরা দেশীয় সম্পদ বিদেশে বিক্রী করে সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ করতেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে আপত্তি জানাল। ফলে সরকারের সঙ্গে এই দুই দ্বীপের সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরোধ বাধল। কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকার অমান্য করে সামরিক বাহিনী সুমাত্রা এবং সুলাওয়েসি নিজেদের দখলে আনল। এদের সঙ্গে যোগ দিল মাসউমি এবং পি. এস. আই দল।

এই বিদ্রোহী সামরিক দল কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসায় আসতে চাইল, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অনমনীয় মনোভাবে কোন মীমাংসায় আসা সম্ভব হল না। সুমাত্রার বিদ্রোহীরা পেমিরিন্তা রেভোলিউশনার রিপাবলিক ইন্দোনেশিয়া বা বৈপ্লবিক ইন্দোনেশিয়া গণতন্ত্র সরকার প্রতিষ্ঠা করল। সুলাওয়েসিতে বিদ্রোহীদল প্রতিষ্ঠা করল পেরমেস্তা বা সামগ্রিক সংগ্রাম। এই বিদ্রোহী সরকারের প্রধান মন্ত্রী মাসউমি দলের শরিফুদ্দীন প্রবীর-নেগারা। এই দলে ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ নাৎসির ও বুরহানুদ্দীন হরাতাপ এবং পি. এস. আই দলের ডক্টর সুমিত্র জোয়োহাদি কুসোমো।

এই বিদ্রোহ দমনের ভার নসুশানের ওপর দিয়ে সুকর্ণ চল্লিশ দিনের জন্য ভারতবর্ষ, যুগোশ্লাভিয়া, সিরিয়া, পাকিস্তান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড এবং জাপান পরিভ্রমণে গেলেন। দেশে অন্তর্যুদ্ধ লাগতে দেখে আমেরিকা ইন্দোনেশিয়াকে অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য করতে অস্বীকার করল। বিদ্রোহীরা তাদের অস্ত্রশস্ত্র লাভ করত সিঙ্গাপুর এবং ম্যানিলা থেকে। আমেরিকার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে এপ্রিল মাসে সুকর্ণ পোল্যাণ্ড, চোকোশ্লোভাকিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়া থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করতে লাগলেন। বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্র সাহায্যের জন্য তিনি আমেরিকা এবং চীনকে তীব্রভাবে সমালোচনা করতে লাগলেন। আমেরিকা-বিদ্বেষ চরমে উঠলে আমেরিকা বিদ্রোহীদের সমালোচনা করে ইন্দোনেশীয় সরকারকে ছোটখাটো অস্ত্র এবং কিছু চাল সরবরাহ করল।

অনুগত সরকারী বাহিনীর তৎপরতায় এবং নসুশানের ব্যক্তিত্বে বিদ্রোহীরা আত্ম-সমর্পণ করল এবং যথাসামান্য দণ্ডের বিনিময়ে তাদের আবার গণতান্ত্রিক সরকারে ফিরিয়ে আনা হল।

এই সময়ে ইন্দোনেশিয়া আবার সবল পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে। টিটো এবং হো চি মিন ইন্দোনেশিয়া পরিদর্শনে আসেন। চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা, ভারতের সঙ্গে নৌ-বিষয়ক সহযোগিতা, মালয়ের সঙ্গে সৌহার্দ-চুক্তি এবং ফিলিপাইনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়।

১৯৫৯ সনের এপ্রিল মাসে সুকর্ণ আবার বিশ্ব-পরিক্রমায় গেলেন। এবার গন্তব্যস্থান হল তুর্কি, ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা, জাপান এবং উত্তর ভিয়েৎনাম। বিদেশ থেকে ফিরে এসে সুকর্ণ বিধানসভাকে নির্দেশ দিলেন বর্তমান সংবিধানের পরিবর্তে ১৯৪৫ সনের সংবিধান প্রয়োগ করতে। দু'মাস বিতর্কের পর বিধানসভা সুকর্ণের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল।

ক্ষিপ্ত সুকর্ণ ঘোষণা করলেন :

> আমার আদেশ যদি অমান্য করা হয় তবে আমাকে রাষ্ট্রপতি, সামরিক বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ, প্রধানমন্ত্রী, সর্বোচ্চ উপদেষ্টা সমিতির সভাপতি এবং এমন কি ইন্দোনেশীয় বিপ্লবের মহান্ নেতা বলে সম্ভাষণ করার প্রয়োজন কি ?

সুকর্ণ বিধান-পরিষদ বাতিল করে দিয়ে বর্তমান সংবিধান রদ করে ১৯৪৫ সনের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। ফলে ডক্টর জুয়ান্দা পদত্যাগ করলেন।

নতুন সংবিধান অনুযায়ী দ্বিতীয় ক্যাবিনেট কের্জা প্রতিষ্ঠিত হল। রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বও গ্রহণ করলেন এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর জুয়ান্দাকে করলেন প্রথম মন্ত্রী। এই সময়ে চীনের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার কূটনৈতিক বিরোধ দেখা দেয়। যে-সব চীনা ইন্দোনেশিয়ায় বাস করে অথচ ইন্দোনেশিয়ার নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে, তাদের পল্লী-অঞ্চলে ব্যবসার অধিকার থেকে ইন্দোনেশীয় সরকার বঞ্চিত করে। চীন এই আইনের তীব্র প্রতিবাদ করে, কিন্তু ইন্দোনেশিয়া এই প্রতিবাদে কর্ণপাত করে না। সুবন্দ্রিও পেকিং-এ গেলেন আলাপ-আলোচনা করতে, কিন্তু চীনা সরকার তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করল না। ইন্দোনেশিয়া দশ হাজার চীনাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে এই দুর্ব্যবহারের প্রত্যুত্তর দেয়।

১৯৬০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ক্রুশ্চেভ ইন্দোনেশিয়া পরিদর্শনে এসে পাঁচশ' কোটি টাকা ঋণ দিতে স্বীকার করেন। এপ্রিল মাসে সুকর্ণ আবার দু'মাসের জন্য বিশ্ব-পরিক্রমায় গেলেন।

এরই মাঝে সুকর্ণ নিজের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আবার একটি নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশের ফলে নির্বাচিত পার্লামেণ্ট ভেঙে দেওয়া হল এবং তার পরিবর্তে একটি নতুন পার্লামেণ্ট গঠিত হল। এই পার্লামেণ্টের মোট ২৮১ জন সভ্যই রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ স্বয়ং নির্বাচন

করবেন। সমস্ত রাজনৈতিক দল ভেঙে দিয়ে দেশে মাত্র দশটি রাজনৈতিক দল স্থাপিত হবে এবং পার্লামেন্টে রাজনৈতিক দল থেকে মাত্র ১৩০ জন সভ্য থাকবেন। কোন্ দল থেকে কজন সভ্য নির্বাচিত হবেন তা রাষ্ট্রপতি স্থির করবেন। বাকী ১৫১ জন সভ্য হবেন সামরিক বাহিনী, কৃষক, শ্রমিক, মহিলা সমিতি প্রভৃতি থেকে। রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন ক্ষমতাই এই পার্লামেন্টের থাকবে না এবং এই পার্লামেন্ট-অনুমোদিত আইন রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করলেই গ্রাহ্য হবে। রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হল 'মজেলিস পেরমুসিয়াওয়ারাতন রাকিয়াৎ সেমেন্তারা'র ওপর। পাঁচ বছরে একবার এই পরিষদের অধিবেশন বসবে এবং তারাই দেশের সামগ্রিক নীতি নির্বাচিত করবে। এই পরিষদে পার্লামেন্টের ২৮১ জন সভ্য, ৯৪ জন আঞ্চলিক প্রতিনিধি এবং ২৪১ জন বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সমিতির প্রতিনিধি থাকবেন।

মন্ত্রীসভার সমস্ত ক্ষমতা চলে গেল প্রধান উপদেষ্টা সমিতির হাতে। এই সমিতির সভ্য-সংখ্যা রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে পঁয়তাল্লিশ এবং রাষ্ট্রপতি অবশিষ্ট সভ্যদের নির্বাচিত করবেন। এই সমিতি পার্লামেন্টে কি বিষয়ে আলোচনা হবে তা নির্ধারণ করবে। মন্ত্রীসভা বা ক্যাবিনেট কের্জার সংগঠন হল: রাষ্ট্রপতি নিজেই প্রধানমন্ত্রী, একজন প্রথম মন্ত্রী, দু'জন উপ-প্রথম মন্ত্রী, আটজন উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং বহু মন্ত্রী। ১৯৬৩ সনের নভেম্বর মাসে প্রথম মন্ত্রী ডক্টর জুয়ান্দার মৃত্যুর পরে আর কেউ প্রথম মন্ত্রী নিযুক্ত হন নি, পরিবর্তে ডক্টর লেইমেনা, ডক্টর সুবন্দ্রিও এবং চইরুল সালেকে উপ-প্রথম মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। ১৯৬০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় ফ্রন্ট গঠিত হয়। এই জাতীয় ফ্রন্টের কাজ ছিল সুকর্ণের স্বপক্ষে পথে-ঘাটে মিছিল এবং আন্দোলন সংগঠন করা।

১৯৬০ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে সুকর্ণ

ওলন্দাজদের সঙ্গে সর্বপ্রকার কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং মাসউমি ও পি. এস. আই দলকে নিষিদ্ধ করেন। ফলে দেশে মাত্র আটটি রাজনৈতিক দল রইল।

এইভাবে সুকর্ণ সর্বতোভাবে নিজের ক্ষমতা সুরক্ষিত করলেন। এখন তাঁর প্রধান সহায়ক হয়ে দাঁড়াল কমিউনিস্ট পার্টি বা পি. কে. আই। সামরিক বাহিনীকেও পার্লামেণ্ট আসন দিয়ে এবং নসুশানকে প্রতিরক্ষা-সচিবে উন্নীত করে দুই পরস্পর-বিরোধী শক্তিকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে লাগলেন সুকর্ণ। কমিউনিস্ট পার্টি এবং সামরিক বাহিনী পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধ হয়েও সুকর্ণের ব্যক্তিত্বের কাছে সাময়িক নতি-স্বীকার করল। কমিউনিস্ট পার্টির এই নতি-স্বীকারের মূলে ছিল কূটনীতি। মাদিউনের ভুল যাতে পুনরনুষ্ঠিত না হয় তার জন্য এবার তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সুকর্ণকে তোষামোদ করে তাঁরই সাহায্যে বড় হয়ে ইন্দোনেশিয়ার অধিকার হস্তগত করার জন্য তারা মেপে পথ চলতে লাগল।

বিশ্বে ইন্দোনেশিয়া স্বীকৃতি লাভ করেছে, কিন্তু তাদের সীমানা সম্পূর্ণ কোথায়? এখনও পশ্চিম ইরিয়ান তাদের সীমানার বাইরে। এবার পশ্চিম ইরিয়ানের দাবী জোরদার হয়ে উঠল। সামরিক শক্তির হুমকিও সুকর্ণ দেখালেন। ইন্দোনেশিয়া রাশিয়ার সঙ্গে অস্ত্র-সরবরাহের চুক্তি সম্পন্ন করে নসুশানকে মস্কোয় পাঠাল আটশ' কোটি টাকার অস্ত্র সংগ্রহ করতে। ওলন্দাজদের সঙ্গে পশ্চিম ইরিয়ান নিয়ে ছোটখাটো সামরিক সংঘর্ষও বাধল।

ওলন্দাজরা পশ্চিম ইরিয়ানে দৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় তৎপর হয়ে উঠল। ১৯৬১ সনের এপ্রিল মাসে তারা হল্যাণ্ডিয়াতে পাপুয়ান পরিষদ গঠন করে পশ্চিম ইরিয়ানবাসীদের স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য প্রস্তুত করতে লাগল। সুকর্ণ এই সময় আবার আড়াই মাসের জন্য বিশ্ব-

পরিক্রমায় নির্গত হলেন। আমেরিকায় গিয়ে প্রেসিডেণ্ট কেনেডির কাছ থেকে এই আশ্বাস নিয়ে ফিরে এলেন যে পশ্চিম ইরিয়ান সম্বন্ধে আমেরিকা সচেতন থাকবে। জুলাই মাসে রাশিয়া থেকে বিমান আসতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে সুকর্ণের আমেরিকা-প্রীতি হ্রাস পেল এবং রাশিয়া-প্রীতি মাথা নাড়া দিয়ে উঠল। সেপ্টেম্বর মাসে বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত নির্দলীয় রাষ্ট্র-সম্মেলনে সুকর্ণ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলেন এবং সেই সময়েই ভারতের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়। জহরলালের বিশ্ব-প্রতিষ্ঠা সুকর্ণের বিশেষ পীড়াকর হয়ে ওঠে। অক্টোবর মাসে রাশিয়া ইন্দোনেশিয়াকে দশটি ক্ষুদ্র রণতরী উপহার দেয়।

পশ্চিম ইরিয়ান সম্বন্ধে ইন্দোনেশিয়ার দাবী চাপা দেওয়ার জন্য হল্যাণ্ড এবার একটি কূটনৈতিক চালের আশ্রয় নিল। নভেম্বর মাসে হল্যাণ্ড রাষ্ট্রসঙ্ঘে একটি প্রস্তাব আনে যে তারা রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিযুক্ত একটি আন্তর্জাতিক কমিশনের অধীনে পশ্চিম ইরিয়ানকে রাখতে চায় যাতে পাপুয়ানরা সম্ভবমতো শীঘ্র স্বায়ত্তশাসন লাভ করতে পারে। ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করলেন ডক্টর সুবন্দ্রিও এবং মহম্মদ ইয়ামিন। বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন করল, কিন্তু কোন মীমাংসায় আসা গেল না।

১৯৬১ সনের ১৯শে ডিসেম্বর পশ্চিম ইরিয়ান মুক্তির আহ্বান জানিয়ে সুকর্ণ তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'ত্রিকোরা' বা ত্রিমুখী অভিযান ঘোষণা করলেন। ইন্দোনেশিয়ার নৌবাহিনী পশ্চিম ইরিয়ান অভিমুখে অগ্রসর হল, কিন্তু ওলন্দাজরা একটি জাহাজকে পশ্চিম ইয়িয়ানের দক্ষিণে আরু দ্বীপের কাছে নিমজ্জিত করল। এই রণতরীতে ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার উপ-নৌ-প্রধান কমোডোর য়োস সুদর্শো। তিনিও মারা গেলেন। ইন্দোনেশিয়ার বিমান থেকে ছত্রীবাহিনী পশ্চিম ইরিয়ানে নামতে শুরু করল।

এই সংঘর্ষ বন্ধ করার জন্য আমেরিকা অগ্রসর হল। আমেরিকার

মধ্যস্থতায় ওয়াশিংটনে বহুদিন আলোচনার পর ১৯৬২ সনের পনেরই অগাস্ট একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। তার ফলে ১৯৬৩ সনের পয়লা মে পশ্চিম ইরিয়ানের শাসনের ভার ইন্দোনেশিয়ার হাতে চলে এল যদিও ১৯৬৯ সনে একটি গণভোট দিয়ে পাপুয়ানদের মত নিতে হবে যে তারা ইন্দোনেশিয়ার অধীনে থাকতে চায়, না স্বাধীনতা চায়।

কিন্তু আন্তর্জাতিক গোলমাল না বাধিয়ে স্থকর্ণের যেন স্বস্তি নেই। পশ্চিম ইরিয়ানে শান্তি ফিরে এল তো নজরে পড়ল মালয়সিয়া!
১৯৬১ সনের মে মাসে মালয় উপদ্বীপের প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান সিঙ্গাপুর, ব্রুনেই, সারাওয়াক, সাবা (উত্তর বোর্নিও) এবং মালয়কে একত্রিত করে একটি শক্তিশালী ফেডারেল সরকার গঠনের প্রস্তাব করেন। ব্রিটিশ সরকার এই প্রস্তাবে আপত্তি করে না এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্রিটিশ কমিশনর-জেনারেল লর্ড সেলকার্ক অগাস্ট মাসে জাকর্তায় স্থকর্ণকে এই মালয়সিয়া গঠনের প্রস্তাবের কথা জানান। স্থকর্ণ এবং ইন্দোনেশীয় সরকার তখন এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দেন।
২০শে নভেম্বর রাষ্ট্রসজ্ঘের সাধারণ পরিষদে মালয়সিয়া গঠনের প্রস্তাবটি সমর্থন করে ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্র-সচিব ডক্টর স্থবন্দ্রিও বলেন:

> We are not only disclaiming the territories outside the former Netherlands East Indies, though they are of the same island, but—more than that—when Malaya told us of her intention to merge with British Crown Colonies of Sarawak, Brunei and British North Borneo as one Federation, we told them that we have no objections and that we wish them success with this merger so that everyone may live in peace and freedom.

কিন্তু তাদের এই 'no objection' ইন্দোনেশিয়া ভুলে গেল কয়েক-দিনের মধ্যে। পি. কে. আই ৩০শে নভেম্বর ঘোষণা করল যে আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম্ অনুযায়ী এই মালয়সিয়া রাষ্ট্র-গঠন একটি ব্রিটিশ 'নিও-কলোনিয়েলিস্ট' ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করার জন্য তারা পি. কে. আই-প্রভাবিত সরকারের ওপর চাপ দিল।

পি. কে. আই এবং ইন্দোনেশিয়ার সামনে একটি সুযোগ উপস্থিত হল। বোর্নিও (কালিমান্তান)-এর পার্টি রাকিয়াৎ মালয়সিয়া গঠনের বিরুদ্ধে ছিল। এই দলের নেতা এ. এম. আজাহারি পি. কে. আই-এর ঘোষণার পর কয়েকবার গোপনে জাকর্তায় এসে ইন্দোনেশীয় নেতাদের সাহায্য ভিক্ষা করেন। ইন্দোনেশীয় কালিমান্তানের মালিনানে গেরিলা-যুদ্ধ শিক্ষাশিবির খোলা হল। এইখানে ইন্দোনেশীয় সামরিক বাহিনীর কাছে শিক্ষালাভ করল তেন্তারা নাশিওনাল কালিমান্তান উতারা (উত্তর বোর্নিও জাতীয় সেনাবাহিনী)। মালয় এবং সিঙ্গাপুরস্থিত মালয়সিয়া-বিরুদ্ধ দলগুলির সঙ্গেও আজাহারি যোগাযোগ করলেন এবং কয়েকবার ফিলিপাইনেও যাতায়াত করলেন। ১৯৬২ সনের জুন মাসে ফিলিপাইনও উত্তর বোর্নিওর কিছুটা অংশ দাবী করেছিল। ৮ই ডিসেম্বর ব্রুনেই-এ বিদ্রোহ ঘোষণা হল এবং ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা থেকে আজাহারি নিজেকে কালিমান্তান উতারার প্রধানমন্ত্রী বলে ঘোষণা করলেন। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী এক সপ্তাহের মধ্যেই এই বিদ্রোহ দমন করল।

আজাহারির এই বিদ্রোহে ইন্দোনেশিয়া বিশেষভাবে জড়িত ছিল। মালয় ইন্দোনেশিয়াকে অভিযুক্ত করায় ইন্দোনেশিয়া প্রতিবাদ জানায়। ১৯৬৩ সনের ৮ই জানুয়ারি সুকর্ণ মালয়সিয়া গঠনের তীব্র প্রতিবাদ জানান। ২১শে জানুয়ারি সুবন্দ্রিও ঘোষণা করেন যে মালয়সিয়া গঠনের অর্থই ইন্দোনেশিয়ার শত্রুতাচরণ ; ইন্দোনেশিয়ার ধৈর্যেরও সীমা আছে এবং ইন্দোনেশিয়া মালয়সিয়া সংগঠিত হতে দেবে না।

ফেব্রুয়ারি মাসে আজাহারি জাকর্তায় উপস্থিত হয়ে স্বাধীন কালিমান্তান সরকার গঠন করলেন। আজাহারিকে আশ্রয় দেওয়া এবং ইন্দোনেশিয়ায় বিদ্রোহী সরকার গঠনে প্রশ্রয় দেওয়ার বিরুদ্ধে টুঙ্কু প্রতিবাদ জানালেন।

প্রত্যুত্তরে সুবন্দ্রিও টুঙ্কুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন :

(১) ১৯৫৮-৬১ সনের বিদ্রোহে টুঙ্কু নাকি সুমাত্রা অধিকার করতে চেয়েছিলেন।

(২) ইন্দোনেশিয়ার প্রথমমন্ত্রী ডক্টর জুয়ান্দার মালয় পরিদর্শনের সময় নাকি টুঙ্কু গল্‌ফ্‌ খেলতে গিয়েছিলেন এবং···

(৩) ইন্দোনেশিয়াকে আমন্ত্রণ না জানিয়েই টুঙ্কু নাকি ঘোষণা করেছিলেন যে ইন্দোনেশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সমিতিতে যোগদান করবে।

মালয় এবং ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে বিরোধ ক্রমাগত বেড়ে যেতে লাগল। পি. কে. আই সুকর্ণকে এই বিতণ্ডায় উৎসাহিত করতে লাগল। সামরিক কর্তৃপক্ষও সুকর্ণের মনোরঞ্জনের জন্য এই নাটকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করল। চারদিকে সাজ সাজ রব।

মার্চ মাসে অস্ট্রেলিয়া মীমাংসার জন্য উপস্থিত হল। সেই সময় এবং পরের মাসে এলেন রাশিয়া থেকে মার্শাল মালিনোভোস্কি এবং চীন থেকে লিউ শাও চি। মালয়-বিরোধ কিছুদিনের জন্য চাপা পড়ল। মে মাসে টোকিওতে হঠাৎ টুঙ্কুর সঙ্গে সুকর্ণের সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা দুজনে একটি যুক্ত ইস্তাহারে ১৯৫৯ সনে সম্পাদিত মালয়-ইন্দোনেশিয়ার সৌহার্দ্য-চুক্তিতে আস্থা প্রকাশ করেন। সমস্ত বিরোধের অবসান হয়ে গেল। ৭ই জুন মালয়, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের পররাষ্ট্র-সচিবেরা ম্যানিলাতে মিলিত হন এবং মালয়সিয়া গঠনে সম্পূর্ণ সমর্থন জানাতে স্বীকার করেন যদি রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারি জেনারেল একটি নিরপেক্ষ তদন্তে বোর্নিও-বাসীদের মনোভাব মালয়সিয়া প্রস্তাবের পক্ষে বলে ঘোষণা করেন।

৩০শে জুলাই এই তিন রাষ্ট্র-প্রধানের মিলিত হওয়ার কথা, কিন্তু ১০ই জুলাই হঠাৎ সুকর্ণ ঘোষণা করলেন যে আগের দিন ব্রিটেন মালয়াসিয়া গঠনে সম্মতি দেওয়ায় মালয় ইন্দোনেশিয়ার শত্রুতা করেছে।

সুকর্ণ সদম্ভে ঘোষণা করলেন : আমরা মালয়সিয়াকে চিবিয়ে টুকরো টুকরো করে থুতু ছিটোব।

কিন্তু ৩০শে জুলাই সুকর্ণ ম্যানিলাতে তিন রাষ্ট্র-প্রধানের সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে পররাষ্ট্র-সচিবদের চুক্তিতে স্বাক্ষর দিলেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ থাণ্ট বোর্নিওতে ভোট গ্রহণের পর ঘোষণা করলেন যে অধিকাংশ বোর্নিওবাসী মালয়সিয়ার সহিত যুক্ত হতে চায়। ১৬ই সেপ্টেম্বর মালয়সিয়া গঠিত হল। ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন মালয়সিয়াকে স্বীকৃতি দিল না। সেইদিন থেকে 'মালয়সিয়াকে চূর্ণ কর' আন্দোলন শুরু হল। মালয়সিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হল ইন্দোনেশিয়া।

মালয়, সিঙ্গাপুর, সারাওয়াক এবং সাবা (উত্তর বোর্নিও)-র বিভিন্ন অঞ্চলে ইন্দোনেশিয়ার ছত্রী-বাহিনী অবতরণ করল। ছোট ছোট যুদ্ধ জাহাজে করে শত শত সৈন্য ধাওয়া করল মালয়ের দিকে। মালয়সিয়ার কয়েকটি অঞ্চলে সংঘর্ষ বাধল। ইন্দোনেশিয়ায় এই অভিযানে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করল পি. কে. আই। তাদের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিল সেনাবাহিনী। সংবাদ-পত্র, রেডিও মারফৎ শুধু 'নেকোলিম' (Necolim বা Neo-colonialism)-এর ষড়যন্ত্রে ইন্দোনেশিয়ার 'নাসাকোম'-এর উচ্ছেদের বিভীষিকা জানানো হতে লাগল। চারদিকে হত্যাকারী শয়তান-বেশী টুঙ্কু আবদুল রহমনের ছবি। দেশের জন-সাধারণের মনে মালয়সিয়া সম্বন্ধে আতঙ্ক এবং ঘৃণার বীজ ছড়ানো হতে লাগল।

সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি রাষ্ট্রসঙ্ঘে মালয়সিয়া ইন্দোনেশিয়ার এই আক্রমণ সম্বন্ধে অভিযোগ জানাল। মালয়সিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাইল

বিন দাতো আবছুল রহমন তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপিত করলেন। উত্তর দিলেন ইন্দোনেশিয়ার উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্নুজারো চোন্দ্রোনেগোরো :

> আমাদের দেশেই শিক্ষিত কিছুসংখ্যক সারাওয়াক এবং সাবার যুবকদের সঙ্গে একত্রে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকেরা তথা-কথিত 'মালয়সিয়া' রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। কিছুকাল ধরে তারা সেখানে সংগ্রামেও লিপ্ত। এ কথা গোপনীয় নয়। আমি বুঝতে পারছি না যে কেন মালয়সিয়া এই ব্যাপারে এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সারাওয়াক এবং সাবা'র সংগ্রামের ব্যাপকতর তুলনায় মালয়ের সংগ্রাম অত্যন্ত ছোটখাটো ধরনের। তবে কেন এ নিয়ে এত হৈ-চৈ? নিজেদের দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দূর করতে অপারগ হওয়াই কি 'মালয়সিয়া' সরকারের এত উষ্মার কারণ?

রাষ্ট্রসঙ্ঘ ব্যর্থ হল এই গোলমাল নিবারণ করতে। কালক্রমে সিঙ্গাপুর মালয়সিয়া থেকে পৃথক হয়ে যাওয়াতেও বন্ধ হল না মালয়ের ওপর ইন্দোনেশিয়ার আক্রমণ। তার কারণ তু'টি। টুঙ্কু আবছুল রহমনের আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তা স্নুকর্ণের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল। আর কমিউনিস্ট পার্টি রুশ-ভাষ্যে দেখেছিল মালয়সিয়া সংগঠনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত।

কতকাল ধরে চলত এই 'কনফ্রন্টাসি' বা 'ক্রাশ মালয়সিয়া' আন্দোলন, কে জানে। এই আন্দোলন শেষ হল আবার স্নুকর্ণ এবং পি. কে. আই-এরই আর এক চক্রান্তে, যার ফলে ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে এই তু'টি নাম-ই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

ইতিহাসের সে আর এক কলঙ্কময় অধ্যায়, আর এক ঘৃণ্য বেদনাকর কাহিনী।

১০

ইন্দোনেশিয়ার এক বিচিত্র মেজাজ আছে।

ইন্দোনেশীয়দেরও। সিন্টার সঙ্গে সিঙ্গাপুরে যখন প্রথম পরিচয় তখনও তার মেজাজে মাঝে মাঝে আশ্চর্য বোধ করতাম, কখনও কখনও বিরক্তও হয়েছি। ভাবতাম, মেয়েটা 'মুডি'; কিন্তু জাকর্তায় এসে দেখছি এখানকার সকলেই যেন 'মুডি'।

এই কয়েকদিন ধরে জাকর্তায় প্রতিদিন পোস্টার আর ব্যানার ক্যাম্পেইন চলছিল। শুরু হয়েছিল মিছিল। কারণে অকারণে মিছিলের পর মিছিলে পথ-ঘাটে যান-চলাচল বন্ধ, লোকের পক্ষে পথ চলাও দুষ্কর। যত না লোক মিছিলে চলেছে তার চেয়েও বেশি পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই মিছিল দেখছে। কলকাতার পথে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের ভিড়ের মতো—যেন তারা মেলা দেখতে এসেছে, বাড়ি ফেরার তাড়া নেই, কাজকর্মের তাগিদ নেই—অলস ছুটির দিনের মতো অকারণ খুশিতে সময় কাটানো।

এই মিছিল এই পোস্টার চলছে মালয়সিয়ার সঙ্গে কনফ্রন্টাসির যুগ থেকে, পশ্চিম ইরিয়ান দাবীর সময় থেকে। পশ্চিম ইরিয়ান সমস্যা সমাধান হওয়ার পর থেকেই মিছিলের উদ্দেশ্য শুধু মালয়সিয়ার টুঙ্কু আবদুল রেহমানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা। মালয়সিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে আমেরিকা আর ভারতকে। এই মিছিলকারী দলের প্রায় সকলেই পি. কে. আই-এর সমর্থক, সেই জন্যই ভারত আর আমেরিকাও জেহাদের লক্ষ্য হয়েছে। চীনের সঙ্গে ভারতের বিরোধের পর থেকেই ভারত ইন্দোনেশিয়ার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, মিত্র হয়েছে

পাকিস্তান,—মুসলমান রাষ্ট্র বলে নয়, চীনের বন্ধু বলে। ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানরা ধর্মান্ধ নয়।

কমিউনিস্টরা ধর্ম মানে না, সেইজন্য ইন্দোনেশিয়ায় তাদের কম নাজেহাল হতে হয় নি। সুবিধামতো তারা ধর্ম এবং একেশ্বরবাদ মেনেও নিয়েছে এবং তার বিরুদ্ধাচরণও করেছে। ধর্মকে তারা তাদের রাজনৈতিক প্রয়োজনমতো ব্যবহার করে। 'নাসাকোম' সরকারে তাদের প্রবেশ রাজনৈতিক কারণে প্রয়োজন বলেই 'আঙ্গামী' দলকে মেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে একত্রে মন্ত্রিত্ব করছে, অথচ বাইরে পি. কে. আই এই সব দলের বিরুদ্ধাচরণ করতেও কুণ্ঠিত হচ্ছে না। জোটবদ্ধ একটির পর একটি দলকে নিশ্চিহ্ন করতে তারা নিয়ত-তৎপর।

প্রফেসর জামিল বলেন—ওদের রাজনীতি হয়েছে সুবিধাবাদীর রাজনীতি। সব দেশেই ওরা এই রকম—নিজেদের সুবিধানুযায়ী সবকিছু মেনে নেয়, একটু প্রতিষ্ঠিত হলেই নিজেদের প্রকৃত রূপ দেখায়।

প্রফেসর জামিলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সেদিন ফ্রেণ্ডশিপ স্কোয়ারে। জাকর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক। বয়স বেশ হয়েছে, কিন্তু এখনও খুব কর্মঠ। ইংরাজিতেই কথাবার্তা হচ্ছিল।

প্রফেসর জামিল বললেন—আপনাকে দেখেই আমার কথাটা মনে হচ্ছে। আপনি ভারতীয়, আমার উচিত হচ্ছে এখন আপনার সঙ্গে কথা না বলা, পারলে শত্রুতা করা। কারণ, সব দেশেরই সরকার হয়েছে সেই দেশের জনগণের রাজনৈতিক মতবাদ, ভাবনা-চিন্তা সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করবে। আমাদের সরকার বলছে, ভারতবর্ষ আমাদের শত্রু, সুতরাং আমারও মেনে নেওয়া উচিত যে আপনি আমার শত্রু। অথচ ভারতবর্ষ হঠাৎ কেন শত্রু হল—একথা আমরা ভেবে দেখতে পারি না। রাজনৈতিক প্রচারে আমরা বিভ্রান্ত। সমস্ত সংবাদপত্র, রেডিও, সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান সরকারের হাতে। সব সময়েই

শুনতে হচ্ছে, পড়তে হচ্ছে—ভারতবর্ষ আমাদের শত্রু। শেষ পর্যন্ত আমাদেরও তাই বিশ্বাস করতে হচ্ছে।

আমি বললাম—আমি রাজনীতি চর্চা করি না, কিন্তু এটুকু আমি বুঝে উঠতে পারি না যে কেন ভারতবর্ষ ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে শত্রুতা করবে। আমাদের দেশে আমি তো ইন্দোনেশিয়ার প্রতি কোন বৈরীভাব লক্ষ্য করি নি।

জামিল একটু হেসে বললেন,—আপনাদের নজরে শত্রুতা ধরা পড়বে না। সমস্ত বৈরীভাবের মূল হয়েছে আমাদের প্রেসিডেণ্ট স্থকর্ণের অহমিকা, দম্ভ। আমাদের দেশের স্বাধীনতার প্রধান হোতা তিনি, দেশকে ভালবাসেনও তিনি—তাই দেশের সকলে তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে, অত্যন্ত ভালবাসে। তাই তিনি সর্বসাধারণের 'বাপক'—পিতা। তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলে দেশের লোকেরা ক্ষমা করবে না—একথা তিনিও জানেন, সকলেই জানে। তাই প্রতিটি রাজনৈতিক দল নিজেদের আদর্শ ত্যাগ করে একমাত্র আদর্শ নিয়েছে স্থকর্ণের মনোরঞ্জন করার, তাঁর অহমিকায় ইন্ধন যোগানোর। স্থবন্দ্রিয়ো এই ব্যাপারে সর্বপ্রথম, তারপরেই আসছে পি. কে. আই। স্থবন্দ্রিয়ো আর পি. কে. আই স্থকর্ণকে এত উঁচুতে তুলে ধরেছে যে তিনি আর নীচের দিকে তাকাতেই পারছেন না। অথচ স্থকর্ণ সহজেই অতীত ভুলে যাচ্ছেন। দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার সময় যখন ওলন্দাজদের সঙ্গে আমরা মরণ-যুদ্ধে লিপ্ত তখন আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল ভারতবর্ষ, আমেরিকা আর অষ্ট্রেলিয়া—কমিউনিস্টরা তখন বিদ্রোহ করে আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন করে তুলেছিল। একবার নয়, দ্বিতীয়বারও মুসোর নেতৃত্বে তারা স্থকর্ণের হাত থেকে শাসনভার ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল। স্থকর্ণ আজ সে কথা ভুলে গেছেন। আজ আইদিত, নিয়োতো আর লুকমান, স্থকর্ণকে 'বাপক' 'বাপক' বলে তৈলাক্ত করছেন, আজ স্থকর্ণকে তৈলাক্ত করে দেশের

শাসনভারে হস্তক্ষেপ করেছেন এবং খুব শিগগিরই একদিন তাঁরা এই সুকর্ণকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সমস্ত শাসনক্ষমতা হস্তগত করবেন। চীনের যা পররাষ্ট্রনীতি, আমাদের আজ তাই পররাষ্ট্রনীতি। চীন আজ পাকিস্তানের বন্ধু এবং ভারতবর্ষের শত্রু, তাই ইন্দোনেশিয়ারও মিত্র আজ পাকিস্তান, শত্রু হল ভারতবর্ষ। আমি বলছি, বিশ্বাস করুন, পি. কে. আই একটা কিছু মতলবে আছে, কারণ তারা হঠাৎ খুব বেশিরকম নাহদাতুল উলামাদের সঙ্গে ভিড়ে ধর্মের জিগির তুলতে শুরু করেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—এ দেশে ধর্মের জিগির আবার কি?

জামিল বললেন—ইসলাম বিপন্ন। আমাদের দেশে নয়, আমাদের দেশের বাইরে। রান অব্ কচ্ছ আর কাশ্মীর নিয়ে ভারত আর পাকিস্তানের বিরোধে পাকিস্তানকে মদৎ দেওয়ার জন্য পি. কে. আই-এর এখন এই শ্লোগান।

প্রশ্ন করলাম—প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ এই কথা বিশ্বাস করেন?

জামিল উত্তর দিলেন—বললাম যে বাপকের এখন নিজের বুদ্ধি বলতে কিছু নেই। পি. কে. আই তাঁকে বুঝিয়েছিল যে এশিয়ায় তাঁর নেতৃত্বের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী আপনাদের জহরলাল, ইন্দোনেশিয়ার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতবর্ষ। জহরলাল আজ নেই, কিন্তু ভারতবর্ষ আছে। সুতরাং ভারতবর্ষকে অপদস্থ করতে পারলে ইন্দোনেশিয়া নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারবে। আজ দেশে চরম অভাব-অনটন, যন্ত্রপাতির অভাবে কল-কারখানা বন্ধ, গাড়ি বাস-বন্ধ, কিন্তু পি. কে. আই তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে না—করলেই সুকর্ণ তাদের সরকার থেকে তাড়িয়ে দেবেন। মোখতার লুবিস তাঁর দৈনিক পত্রিকা 'ইন্দোনেশিয়া রায়া'তে দেশের চরম দুর্দশার কথা উল্লেখ করে একটা প্রশ্ন করেছিলেন —'এইজন্যই কি আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম?' ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে তিনি জেলে। শাহরিরের পি. এস. আই দল সুকর্ণের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল,

পি. এস. আই.-কে বাতিল করে দেওয়া হল। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম নেতা সুতান শাহরিরকে ষড়যন্ত্রের মিথ্যা অজুহাতে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন।* যে ডক্টর হাত্তা এবং শাহরিরের সহযোগিতায় দেশ স্বাধীন হল, সুকর্ণ দেশের একচ্ছত্র নেতা হলেন, তাঁদের সম্বন্ধে সুকর্ণ বলেন—Hatta and Sjahrir never created any might. All they did was talk. অথচ দেশের এই চরম অর্থনৈতিক দুর্দশার কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যখন অপব্যয় বন্ধ করে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে শক্ত করতে তাঁকে অনুরোধ করা হল, জবাবে তিনি বললেন—I never thought of mundane things like money. Only people, who have never breathed the fire of nationalism, can concern themselves with such trivia. এতেই বুঝতে পারবেন বড় বড় কথা কে বলেন—হাত্তা আর শাহরির, না সুকর্ণ?

আজও আমি সকালে মের্ডেকা স্কোয়ারে বেড়িয়ে ফেরার সময় দেখেছি তার পাশের 'কালি-কালি'র (খাল) ধারে গলায় লাল রুমাল-বাঁধা তেন্তারা রাকিয়াতের লোকেরা কুচকাওয়াজ করছে। তেন্তারা রাকিয়াত হল পিপলস্ আর্মি। কনফ্রন্টাসির আমলে সুবন্দ্রিয়োর হাতে গড়া সৈন্যদল, যাদের মাতব্বরীর ফলে ইন্দোনেশীয় সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ওঠে। এই প্যারেড করা এবং মিছিল করা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নেই। এদের কপালে যেন লেখা আছে On President's Service অর্থাৎ রাষ্ট্রপতিকা সেবামেঁ। যখনই কোন জায়গায় বা কারুর রিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানানোর প্রয়োজন হয়ে

* ১৯৬৬ সনের এপ্রিল মাসে শাহরির কারাগারে বন্দী অবস্থায় মারা যান।

পড়বে সুকর্ণের, এই দল ছুটে যাবে সেখানে। এদের সাত খুন মাপ। দেশের সর্বসাধারণ এদের ভয় করে, এমন কি মন্ত্রীরাও।

একদিন দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পরে হঠাৎ হোটেলের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখলাম লাল-সাদা জাতীয় পতাকা নিয়ে চলেছে একটার পর একটা মিছিল। আছে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা, আছে অফিস-কারখানার কর্মচারীরা, আছে তেন্তারা রাকিয়াতের সদস্যরা, আছে অন্যান্য রাজনৈতিকদলের মিছিল। যদিও এরা 'বাপক সুকর্ণ হিদুপ' 'নাসাকোম হিদুপ' 'টুঙ্কু গঞ্জাঙ' আর 'নেকোলিম গাণ্টুঙ' বলে চীৎকার করতে করতে চলেছে, তবুও তাদের মুখে বা চেহারায় সেই মারমুখী ভাব নেই, সাজগোজও বেশ সুন্দর—যেন কোন উৎসবে যোগ দিতে চলেছে। বেচা, সাদো, বাস, ট্যাক্সি—সমস্ত গাড়িতেই পতাকা উড়ছে। সকালে উঠে জাকর্তার যে মেজাজ লক্ষ্য করেছি, দুপুরে তা সম্পূর্ণ বদলিয়ে গিয়েছে। জাকর্তার কখন কি যে মেজাজ হবে তা বোঝা দুষ্কর।

এই আনন্দ-উৎসবের কারণ আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। একটু পরিচিত কাউকে ছাড়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হয় না। প্রফেসার জামিলের মতো অনেক উদার ব্যক্তি এদেশে আছেন, কিন্তু তাঁদের চিনতে পারাও কঠিন। তাই নিজে থেকে কেউ আলাপ না করলে কথা বলার চেষ্টাও করি না।

সকালবেলায় যখন বাইসাইকেল, সাদো, বেমো বা বেচায় চড়ে কিংবা বাস-বোঝাই হয়ে অফিস-বাবুদের যেতে দেখি নি, তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল যে আজ নিশ্চয়ই ছুটির দিন। এত উৎসব-মিছিল দেখে এখন সেই কথা মনে পড়ল। এ ধরনের উৎসব-মুখর মিছিল আমি আগেও দেখেছি। সন্ধ্যাবেলায় দল বেঁধে নর-নারীদের যেতে দেখেছি ওয়েয়াঙ দেখতে, কখনও বা নাচের আসরে যেতে। কিন্তু তখন সেই মিছিলে কোন পতাকা দেখি নি। আজ যত না লোক, তত

জাতীয় পতাকা। সেই সঙ্গে শ্লোগানের ঝড়। সুতরাং ছুটি যদি হয় তবে কোন সামাজিক বা ধর্মীয় কারণে নয়, একান্তই রাজনৈতিক কারণে। এদিক দিয়ে এই মিছিলের সঙ্গে আমাদের দেশের মিছিলের অনেক মিল আছে, জাকর্তার সঙ্গে কলকাতার।

একটু পরেই এলেন কিম উ তান। সেদিন টেলিফোন করার পর আজই তিনি সময় করে আসতে পারলেন। যদিও ছুটির দিন, ম্যাটিনি শো-তে কোন লোক হবে না—সকলেই চলেছে মিছিল করে।

কিমের কাছ থেকে জানলাম আমি এই মিছিলের ব্যাপার। সেদিন বিকেলে প্রেসিডেণ্ট স্নুকর্ণ বক্তৃতা দেবেন। বক্তা হিসাবে স্নুকর্ণের প্রচুর খ্যাতি, দেশ-নেতা হিসেবেও সবচেয়ে শ্রদ্ধেয়। বক্তা হিসেবে স্নুকর্ণের খ্যাতি স্বীকার করেন তাঁর অতি বড় শক্ররাও। কিন্তু আমাদের দেশের নেতাদের মতো তিনি শ্রোতাদের রক্ত গরম করে তুলতে পারেন না। তিনি বক্তৃতা শুরু করেন ধীরে ধীরে, মৃদু কণ্ঠে। আস্তে আস্তে বক্তৃতার গতি বৃদ্ধি করেন, কণ্ঠস্বর ওঠে উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে। একটা কথাকে বারবার নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেন, মাঝে মাঝে ইংরাজি, ফরাসী, ওলন্দাজ, জার্মান কয়েকটা কথা বলে ফেলেন—বাহাসা ইন্দোনেশিয়াতে যে সে-কথা তিনি বলতে পারেন না, তা নয়—তিনি যে নানা ভাষা জানেন এ কথাটা জানানোর জন্যই হুম্ করে বিদেশী ভাষা প্রয়োগ করেন, শ্রোতাদের মাঝে হর্ষধ্বনিও ওঠে। স্নুকর্ণ এই ধরনের হর্ষধ্বনিতে আনন্দ উপভোগ করেন।

স্নুকর্ণ বক্তৃতা দেওয়ার আর্ট জানেন, জানেন শ্রোতাদের বিভ্রান্ত করে নিজের করে নিতে। যে-শ্রোতারা উচ্ছ্বসিত হয়ে হাততালি দেয়, শেষ পর্যন্ত তারা হয়তো বুঝতে পারে না সমস্ত বক্তৃতার অর্থ কী? কিন্তু তাতে কিছুই আসে যায় না তাদের। স্নুকর্ণের বক্তৃতা শুনতে আবার তারা যায়। এ যেন তাদের জাতীয় উৎসব।

নিজের বক্তৃতা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন। নিজের বক্তৃতা সম্বন্ধে তাঁর নিজের ধারণা :

> A two-way conversation between myself and the People, between my Ego and my Alter-Ego. A two-way conversation between Sukarna-the-man and Sukarna-the people, a two-way conversation between comrade-in-arms and comrade-in-arms. A two-way conversation between two comrades who in reality are One!

আর সেই বক্তৃতার সময় তাঁর মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন :

> আমি তখন একেবারে আবিষ্ট হয়ে যাই। আমার দেহের মধ্যে যা-কিছু আধিভৌতিক নয়, সব কিছু উপছিয়ে পড়ে। চিন্তা উপছিয়ে পড়ে, তেজ উপছিয়ে পড়ে, আবেগ উপছিয়ে পড়ে। আমার দেহাবদ্ধ আত্মার সঙ্গে জড়িত সব কিছু যেন তখন শিহরিত হয়ে, প্রজ্বলিত হয়ে, ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তখন আমার কাছে যেন আগুনও খুব বেশি উত্তপ্ত নয়, মহাসাগরও খুব বেশি গভীর নয় এবং আকাশের তারাও খুব বেশি উঁচু নয়।

কিম জিজ্ঞাসা করলেন—কোনদিন প্রেসিডেণ্ট স্থকর্ণের বক্তৃতা শোনেন নি, যাবেন আজ শুনতে?

উত্তর দিলাম—বক্তৃতার একটা কথাও তো আমি বুঝব না, গিয়ে কি করব?

বুঝবেন না সত্যি,—বললেন কিম—কিন্তু মস্ত একটা অভিজ্ঞতা হবে। এ বক্তৃতা জীবনে কোনদিন ভুলবেন না। অপূর্ব বক্তৃতা করার ভঙ্গী, আশ্চর্য বক্তৃতা দেবার ক্ষমতা, হাজার হাজার লোককে তন্ময় করে, আচ্ছন্ন করে, জাহু করে রাখার ক্ষমতা শুধু তাঁরই আছে। লোকে বোঝে না

তিনি কি বলছেন, বুঝতে পারে না যে কি বলতে চাইছেন—যুক্তির ধার ধারেন না, এক প্রসঙ্গ থেকে আর এক প্রসঙ্গে সহজেই চলে যান—তবু ভাল লাগে। যেন আমরা মুগ্ধচিত্তে এক বিরাট অভিনেতার অভিনয় দেখে যাচ্ছি। তাঁর এই বক্তৃতা, জনসাধারণকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখার ক্ষমতাকে ভয় করত ওলন্দাজরা, জাপানীরা। লোকের সহর্ষ হাততালির কোনদিন অভাব হয় নি, কিন্তু—

থেমে গেলেন কিম। প্রশ্ন করলাম—কিন্তু আবার কি?

একটু হেসে বললেন—আমেরিকার কোন খেলা দেখেছেন?

বললাম—না, আমেরিকায় যাওয়ার সৌভাগ্য হয় নি।

কিম বললেন—দু'দল যখন আমেরিকায় খেলতে নামে, তখন দু'দলের কয়েকজন লোক আনা হয় চীৎকার করে নিজেদের দলকে উৎসাহিত করার জন্য। এদের একজন নেতা থাকেন, তাঁকে বলা হয় cheer-leader. সুকর্ণের বক্তৃতার সময় এই কয়েক বছর ধরে দেখছি cheer-leader এবং তাঁর অধীনে হাততালি-দেওয়া লোক। বক্তৃতার মাঝে হঠাৎ চিয়ার-লীডার হাততালি দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলে মিলে চট্‌পট্‌ হাততালি দিতে শুরু করল। চিয়ার-লীডার চীৎকার করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলে চীৎকার করল। চিয়ার-লীডার শ্লোগান দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলে শ্লোগান দিতে শুরু করল। সুকর্ণের আগে চিয়ার-লীডারের প্রয়োজন হয় নি, এখনও প্রয়োজন নেই—তবে জানেন কিনা,—ওঁকে খুশি করার জন্যে এখন সকলেই প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ওঁর এসব এখন ভালও লাগে।

সুকর্ণের বক্তৃতা সম্বন্ধে আমি খুব উৎসাহ বোধ করলাম। বললাম—এ রকম বক্তৃতা আমি নিশ্চয়ই শুনতে যাব, আর তা ছাড়া স্বচক্ষে ওঁকে একবার দেখাও হবে। মনে হয়, উনি খুব রসিকও।

রসিক তো নিশ্চয়ই—উত্তর দিলেন কিম,—মাঝে মাঝে সিরিয়াস বিষয় নিয়ে এমন রসিকতা করেন যে লোকে একেবারে ঘাবড়িয়ে

যায়। একটা উদাহরণ দিই। ইরিয়ান বরাট বা পশ্চিম ইরিয়ান নিয়ে ওলন্দাজদের সঙ্গে আমাদের অনেকদিনের বিরোধ। আমাদের নেতারা ইরিয়ান বরাট-এর অধিবাসীদের উদ্দেশ্য করে সব সময়ে বলতেন যে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তি পেলেই ইরিয়ান বরাটকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করবেন। লাঙ্গি (স্বর্গ) নেমে আসবে ইরিয়ান বরাটে, পথে-ঘাটে তখন এমাস (সোনা) ছড়িয়ে থাকবে। ওলন্দাজরা চলে গেল। সারা ইন্দোনেশিয়াতে যে খাদ্যকষ্ট, যে দারিদ্র্য, যে অভাব—সব দেখা গেল ইরিয়ান বরাটে। ওলন্দাজদের অধীনে তাদের খাওয়াদাওয়ার কষ্ট অন্ততঃ ছিল না। লোকে ভীষণ খুঁতখুঁত করতে লাগল। এরকম এক পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট স্থকর্ণ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা আজও আমার মনে আছে। এত সিরিয়াস ব্যাপারকে এমন খেলো করে তুলতে আর কেউ পারতেন না। দাঁড়ান, আমি হোটেলের বালাই পুস্তাকা (লাইব্রেরি) থেকে স্থকর্ণের বক্তৃতামালা নিয়ে আসি।

আমি বলে উঠলাম,—থাক, দরকার নেই। মুখে মুখে বলুন না কেন?

যেতে যেতে কিম বললেন,—আমি ওরকম রসিয়ে বলতে পারব না, অথচ আপনার জানা দরকার।

একটু পরেই একটা বই নিয়ে ফিরে এলেন কিম। কয়েকটা পাতা উলটিয়ে বললেন,—ওঁর বক্তৃতা মানে লম্বাচওড়া বক্তৃতা। ইরিয়ান বরাটের প্রসঙ্গটাই আমি আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি :

> ইরিয়ান বরাটে গোপনে গুজব ছড়িয়ে একটা গেরকাঙ্গ (আন্দোলন) গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে যে লাল-সাদা-নীল পতাকার অধীনে থাকার সময়ের তুলনায় গণতন্ত্রের অধীনে ইরিয়ান বরাটের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। খারাপ? কোন বিষয়ে খারাপ হচ্ছে? যদি আমরা প্রশ্ন করি : কোন বিষয়ে খারাপ হচ্ছে?—তখন দেখা যাবে যে প্রকৃত সমস্যা হয়েছে যে এখন ইরিয়ান বরাটে যথেষ্ট পরিমাণে টিন-পূর্ণ বিয়ার নেই। বুঝলেন ব্যাপারটা—যথেষ্ট টিন-পূর্ণ বিয়ার নেই!

ইরিয়ান বরাটের ভাই ও বোনেরা! শুনছেন আপনারা, ইরিয়ান বরাটের ভাই ও বোনেরা। কোটাবারু, সোরেঙ আর মেরোকের ভাই-বোনেরা—ত্রিকোরা পর্বত, সুকর্ণ পর্বত, সুদিরমান পর্বত, ইয়ামিন পর্বতের অঞ্চলের ভাই-বোনেরা!—আমাদের গণতন্ত্র ইরিয়ান বরাটের লোকদের টিন-পূর্ণ বিয়ার দেওয়ার কথা কোনদিন বলে নি। আমাদের গণতন্ত্র কথা দিয়েছিল যে 'দেসা' (স্কুল) তৈরি করবে, তা করেছেও; আমাদের গণতন্ত্র কথা দিয়েছিল যে 'মেরডেকা' (স্বাধীনতা) এনে দেবে, এনে দিয়েছে; আমাদের গণতন্ত্র কথা দিয়েছিল যে আলোক এবং ঔজ্জ্বল্য এনে দেবে, এনে দিয়েছে।

বইটা বন্ধ করে কিম বললেন—ইরিয়ান বরাট দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য দাবী জানাল, সুকর্ণ সে কথাটাকে ঘুরিয়ে সকলকে জানিয়ে দিলেন যে তাদের দাবী হয়েছে বিয়ারের। এর পর তারা আর তাদের দাবী জানাতে সাহস করতে পারে? লোকে হাসাহাসি করবে যে!

বললাম—এটা দোষের নয়, রাজনৈতিক চাল। সমস্ত দেশেই এই খেলা চলে। যখন কোন সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয় না এবং জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে, তখন সরকার তাদের দৃষ্টি অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পাকিস্তানে যখনই কোন আন্দোলনের আভাস দেখা দিয়েছে তখনই কাশ্মীর নিয়ে কিংবা অন্য কোন অজুহাতে ভারতবর্ষের দিকে তারা দৃষ্টি সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। সব দেশেই এই হাল। কিন্তু রাজনীতি থাক, খবর কি বলুন।

কিম বললেন—আপনাকে কথা দিয়েও সেদিন আসতে পারি নি। এখন ব্যাপার হয়েছে এই যে আপনার ছবিটার মুক্তি এখন দিতে সাহস হচ্ছে না। বাইরে একটা গুজব জোর ছড়িয়ে পড়েছে যে শীগগিরই একটা গোলমাল বাধবে। কেউ বলছে যে ৫ই অক্টোবর সেনাবাহিনী দিবসে গোলমাল বাধবে, কেউ বলছে তার আগে। এই অবস্থায় মুক্তি দিয়ে ছবিটাকে মার খাওয়াতে চাই না।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, বললাম—তবে আমি আর এখানে থেকে কি করব ? আমি দেশে ফিরে যাই।

আমার ছবিটা ?—প্রশ্ন করলেন কিম।—আমাকে যে একটা ছবি তুলে দেবেন বলেছেন। আমি এ ব্যাপার অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি।

বললাম—মুস্কিল হয়েছে কি যে—মানে, সিণ্টা 'সিতি নুরবায়া' গল্পটা পছন্দ করছে না।

কিম বললেন—সিণ্টা আমাকেও বলেছে। ওর পছন্দমতো গল্পই করুন না কেন ?

এবারে আমি সাহস করে বলেই ফেললাম,—মিঃ তান, ছবি করতে আমার বিশেষ আপত্তি নেই, কিন্তু বাজারের গুজব যে শীগ্‌গিরই ভারতের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার গোলমাল বাধবে। তখন এখানে আমি থাকলে আমার কি অবস্থা হবে ভেবে দেখুন।

গুজবটা যে আমিও শুনি নি, তা নয়,—বললেন কিম,—আসলে এই ভয়েই আপনার ছবি মুক্তি দিতে সাহস পাচ্ছি না ; কিন্তু মিঃ সেন, আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ আপনার কোন ভয় নেই। বিপদ দেখলেই আমি নিজে এসে আপনাকে এখান থেকে নিয়ে আমার বাড়িতে রাখব। সেখানে আপনার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগবে না।

বললাম—ধন্যবাদ মিঃ তান। আমি বিশ্বাস করি যে আপনি আমাকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন ; কিন্তু 'মব্ ভায়োলেন্স'কে সব সময়ে পুলিশ বা সরকারই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আমার ভয় ওই রকম পরিস্থিতিকে।

কিম মাথা নীচু করে বসে ভাবতে লাগলেন। তারপর বললেন—সে কথা সত্যি, মিঃ সেন। আমি যা করতে পারি তা-ই আমি বলেছিলাম, কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও সব কিছুই আমার সাধ্যের মধ্যে নয়। আমার মনে হয়, আপনার দেশে ফিরে যাওয়াই উচিত। আপনি যদি চান তো

আমাদের কন্ট্রাক্ট আমি নাকচ করে দেব। দেশের পরিস্থিতি ভাল হলে না হয় আমাদের ছবি হবে।
উত্তর দিলাম—আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আর ছোট করব না। যেদিন আপনি ডাকবেন সেদিন এসে আমি আপনার ছবি করে দিয়ে যাব। আপনার সহৃদয়তা এবং মহানুভবতা কোনদিন ভোলবার নয়।
কিম বললেন—ওসব কথা বাদ যাক। এবারে বক্তৃতা শুনতে যাওয়ার জন্য তৈরি হন।
ঠিক এই সময়ে সিণ্টা এল। কিমকে দেখে খুশিতে উপছিয়ে উঠল। কিমের গলাটাকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলল—বাপক, নতুন ছবির গল্প তবে ঠিক ?
একটু দ্বিধান্বিত দৃষ্টিতে কিম একবার আমার দিকে তাকালেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন—মিঃ সেন দেশে ফিরে যাচ্ছেন।
আমার দিকে ফিরে তাকাল সিণ্টা : চোখে দুষ্টু চাউনি, মুখে অবিশ্বাসের হাসি। মাথা ঝাঁকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করল—সেত্য ? (সত্য ?)
মাথা নেড়ে জানালাম—হ্যাঁ।
খিলখিল করে হেসে উঠল সিণ্টা, বলল—হ্যাঁ, যাচ্ছেন আর কি ! সব ধাপ্পা, আমাকে রাগানোর চেষ্টা। বাপক, ছবি শুরু হলে আপনি বুঝবেন মিঃ সেন সাতু রাতু-তুকাণ্ড (এক রাজ-শিল্পী)।
আমি চোখের ইসারায় কিমকে সিণ্টার কাছে আপাতত সত্য কথাটা ভাঙতে নিষেধ করলাম। মনে হল, কিমও যেন স্বস্তি ফিরে পেলেন। দেশে ফেরার আগে সিণ্টাকে জানানোই শ্রেয় বলে মনে হল।
জিজ্ঞাসা করলাম—তা তুমি এখন এলে যে ?
সিণ্টা উত্তর দিল—দেখুন বাপক, আমার যেন আসতে নেই। বেশ, আপনার অসুবিধা হলে চলে যাচ্ছি। আমি সেধে থাকতে চাইও না।
কপট রাগ করে সিণ্টা ফিরে দাঁড়াল।
॥, সুন্দরী মেয়ে সিণ্টা। বাটিকের কাজ-করা রঙিন সারঙ পরনে

গায়ে গাঢ় লাল একটা কাবায়া তার ফর্সা চেহারায় সুন্দর মানিয়েছিল। হাত-খোঁপায় গোঁজা একটা লাল ফুল। চোখে আজ গগলস্ই নেই, চিত্র-নায়িকার সাজসজ্জা নেই। আজ সিণ্টা একেবারে বুমিপুত্র (দেশীয়) সজ্জায় সেজে এসেছে। দেশী সাজ যে কত সুন্দর হতে পারে, সিণ্টাকে দেখে বুঝতে পারলাম।

আমি আর কিম ছজনেই তার রাগ দেখে হেসে উঠলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম—রাগ করলে ?

মাথা ঝাঁকি দিয়ে উত্তর দিল—ত্রিদা। (না)

বললাম—তবে বসো।

ত্রিদা—বলেই সে হেসে ফেলল।

তার হাসি দেখে কিমের একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। সিণ্টার সুন্দর ঝকঝকে সাজানো দাঁত আর মিষ্টি হাসি দেখে তিনি বলেছিলেন —যেন তোকো গিগি (দাঁতের দোকান)। এই হাসি দিয়েই সে দর্শকদের হৃদয় জয় করে নিতে পারে। কথাটা অত্যন্ত সত্য।

আমরাও হেসে উঠলাম। বললাম—আর রাগ দেখাতে হবে না। বসো।

সিণ্টা বলল—তুহু ? (থাকব ?) আপনাদের কোনরকম অসুবিধা হবে না ?

বললাম—না।

একটা কৌচে বসে গম্ভীরভাবে বলল—ত্রিমাকাকি। (ধন্যবাদ।)

কিম বললেন—আমরা আজ বুঙ্গ কর্ণের বক্তৃতা শুনতে যাব ভেবেছিলাম।

সিণ্টা বলল—হাজার হাজার লোক যাবে। ওই ভিড়ে ওঁর ভাল লাগবে না।

কিম বললেন—ওঁর খুব ইচ্ছা যে একবার সুকর্ণকে দেখেন।

সিণ্টা বলল—তবে চলুন, আমিও যাব। কিন্তু মিঃ সেন, আমি বলছি আপনার ভাল লাগবে না। ভাল লাগলে আমি আপনাকে সেলামাতান (ভোজ) দেব, না লাগলে কিন্তু আপনি—

বললাম—বেশ। কিন্তু তুমি এখন এই দুপুর বেলায় হঠাৎ এলে কেন ?
সিণ্টা হেসে উঠে বলল—কারণ বললে আপনারাও সকলে হাসবেন। ব্যাপারটা হল এই যে, হঠাৎ একটা 'লিণ্ডু' (ভূমিকম্প) হল। আমার যেন কেমন ভয় করল—
বাধা দিয়ে বললাম—ভূমিকম্প ?
বিশ্বাস হচ্ছে না ?—বলল সিণ্টা,—জিজ্ঞাসা করুন বাপককে।
কিম বললেন—ভূমিকম্প প্রায়ই হয়। আগ্নেয়গিরির ওপরে আমাদের দেশ বসে রয়েছে—ভূমিকম্প হলেই আমরা বুঝতে পারি। তবে খুব মারাত্মক ভূমিকম্প হয় না।

স্টেডিয়ামে যখন আমরা গিয়ে পৌঁছোলাম তখন সমস্ত আসন প্রায় ভরে এসেছে। প্রায় এক লাখ লোক সুন্দরভাবে বসতে পারে। আমাদের দেশের সভার মতো ফাঁকা ময়দানে বা পার্কে সুকর্ণের সভা হয় না। ভিড়ের বাইরে একটু দূরে বসে লাউড-স্পীকার মারফৎ বক্তৃতা শোনার উপায় নেই। স্টেডিয়ামের একদিকে প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণের বক্তৃতা দেবার জন্য সুসজ্জিত মঞ্চ করা হয়েছে। তাঁকে ঘিরে অর্ধ-চন্দ্রাকারে লোকদের বসবার আসন। এখনই সমস্ত স্টেডিয়াম লোকের চাপা গলায় গম্‌গম্ করছে, বক্তৃতা শুরু হলে সমস্ত স্টেডিয়াম একেবারে ফেটে পড়বে।
স্টেডিয়ামের দেয়ালে দেয়ালে বড় বড় ব্যানার ঃ বুরবাকোন বি. পি. এস। হিতুপ নাসাকোম। গাণ্টুঙ কাবির। হিতুপ বুঙ্গ কর্ণ। গঞ্জাঙ আমেরিকা। গাণ্টুঙ নেকোলিম। হিতুপ পাকিস্তান। গঞ্জাঙ ইণ্ডিয়া। চারদিকে ইন্দোনেশিয়ার লাল-সাদা পতাকা পত-পত করে উড়ছে। লাল ফেস্টুনের ওপর সাদা রঙ দিয়ে লেখা পার্টির নাম দেখে বোঝা

যায় যে কোথায় কারা বসেছে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংস্থা KASI, ছাত্রদের দুটি সংস্থা KAMI ও KAPPI, যুব সংস্থা, কৃষক সংস্থা BTI, শ্রমিক ইউনিয়নের SOBSI ফ্রন্ট পেরমুদা, সাংবাদিক সংস্থা PWI, নারী সংস্থা GERWANI, PPMI এবং আরো অনেকদল এক এক জায়গায় ভিড় করে বসেছে। কেউ 'ইন্দোনেশিয়া রায়া' গাইছে, কেউ বা মাঝে মাঝে শ্লোগান দিচ্ছে। বদ্ধ জায়গায় এই চীৎকারে অস্বস্তি লাগে।

তারপর হঠাৎ শুরু হল আকাশে গড়্ গড়্ শব্দ। একটা হেলিকপ্টার স্টেডিয়ামের ওপর ঘুরে বেড়াতে লাগল। এবারে জনতার উল্লাস চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেয়ে গেল। তারপর সেই হেলিকপ্টার থেকে পড়তে লাগল হ্যাণ্ডবিল নানা রঙের কাগজে ছাপা। সেই হ্যাণ্ডবিল কুড়োনোর ধুম লেগে গেল দর্শকদের মধ্যে। সিণ্টাও কুড়িয়ে পেল একটা।

হঠাৎ সাইরেনের শব্দ দূর থেকে কাছে ছুটে এল। সাইরেন থামার সঙ্গে সঙ্গে বুম্ বুম্ করে তোপের শব্দ সমস্ত স্টেডিয়ামকে কাঁপিয়ে তুলল। এই উত্তেজনা শেষ হতে না হতেই হাজার হাজার গ্যাস-ভরা বেলুন আকাশে উড়তে শুরু করল। সমস্ত ব্যাপারটাই একটা কার্নি-ভালের মতো। এর পর বেজে উঠল মিলিটারি ব্যাণ্ড। বাজনার তালে তালে সৈন্যবাহিনী মার্চ করে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করল এবং চারধারে ছড়িয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের ওপর একটা ফোকাস্ পড়ল এবং প্রবেশ করলেন প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ।

এবার শ্রোতাদের মাঝে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দধ্বনি আর হাততালির তুফান বয়ে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুকর্ণ উপভোগ করলেন এই জয়ধ্বনি। সুকর্ণের পরনে দুধের মতো সাদা সামরিক পোশাক, মাথায় কালো রঙের পিজি (টুপি), হাতে একটা ছড়ি। বয়সের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয়।

একটা হাত তুলে সমস্ত শব্দ তিনি থামিয়ে দিলেন। স্টেডিয়াম একেবারে নিস্তব্ধ। তারপর সমস্ত স্টেডিয়ামটি একবার ভাল করে দেখে নিয়ে সুকর্ণ প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বললেন ঃ ভাই আর বোনেরা··· কথা বলার তাড়া নেই, শ্রোতাদের দিকে ভাল করে তাকানো নেই, আপন মনে আস্তে আস্তে বলে চলেছেন তিনি, তাঁরই ভাষায়—a two-way conversation between my Ego and my Alter-Ego. কি বললেন প্রথমে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম না, এত আস্তে তিনি বলছিলেন।

তারপর একটু জোরে বলতে শুরু করলেন। ডান হাতের তর্জনী তুলে শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন ঃ

> আপনারা···আপনারা···আপনারা···আর আপনারা···আপনারা কি নিজেদের জনসাধারণের 'আম্পেরা'র (দুঃখ-দৈন্য) বাণীর প্রতিধারক বলে মনে করেন? আপনারা কি এ বিষয়ে সত্যকার সজাগ যে আপনারাই হয়েছেন জনসাধারণের 'আম্পেরা'র বাণীর প্রতিধারক? আপনারা কি আপনাদের অস্থিমজ্জা দিয়ে অনুভব করতে পারেন যে আপনারাই হয়েছেন জন-সাধারণের 'আম্পেরা'র বাণীর প্রতিধারক?

শ্রোতাদের মাঝে এতটুকু সাড়াশব্দ নেই। নিঃসাড়ে সকলে কথাগুলো গিলছে। একটি কথাকেই বারবার তিনি বলে চলেছেন, বিরক্ত লাগার কথা—কিন্তু বিচিত্র বলার ঢঙে এতটুকু একঘেঁয়ে লাগে না। আমিও তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলাম।

উদাস দৃষ্টি একবার স্টেডিয়ামের ওপর থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আবার সুকর্ণ বলতে লাগলেন ঃ

> ইন্দোনেশীয় জনসাধারণের এই Social consciousness এই সমাজ সচেতনতাই হয়েছে ইন্দোনেশীয় জনসাধারণের 'আম্পেরা'র বাণীর মৌল উপাদান। সুতরাং ইন্দোনেশীয় রাকিয়াত ইন্দোনেশীয় Marhaen ইন্দোনেশীয় জনসাধারণের 'আম্পেরা'র বাণীই হয়েছে মানব-জাতির সমাজ-সচেতনতারই একটি অংশ।

এবারে শ্রোতারা এক পশলা হাততালি দিয়ে সুকর্ণকে অভিনন্দিত করল। সুকর্ণের কণ্ঠস্বরও উচ্চগ্রামে উঠল। তিনি বলতে লাগলেন ঃ

> সুতরাং ইন্দোনেশীয় জনসাধারণের 'আম্পেরা'র বাণীই হল সমগ্র মানবজাতির 'আম্পেরা'র বাণীর একটি অংশ! সুতরাং জনসাধারণের 'আম্পেরা'র আমাদের বাণী শুধু আমাদের কোন জাতীয় ধারণা বা কোনরকম জাতীয় আদর্শ নয়। জনসাধারণের 'আম্পেরা'র আমাদের বাণী মানবজাতির 'আম্পেরা'র বাণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, মানবজাতির 'আম্পেরা'র বাণী জনসাধারণের 'আম্পেরা'র আমাদের বাণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ইন্দোনেশিয়ার বিপ্লব মানবজাতির বিপ্লবের সঙ্গে একত্র সংবদ্ধ, মানবজাতির বিপ্লব ইন্দোনেশীয়ার বিপ্লবের সঙ্গে একত্র সংবদ্ধ।

এই একই ভাবে চলতে লাগল সুকর্ণের বক্তৃতা। একই কথার পুনরাবৃত্তি, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথাকে নানাভাবে বলা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চলতে লাগল। বিস্ময়-বিমুগ্ধ শ্রোতাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমিও শুনে যেতে লাগলাম। যখন তিনি দ্রুত কথা বলে যান, তখন বুঝতে পারি না। আবার যখন ধীরে ধীরে প্রতিটি কথা লোকের মনে গেঁথে দেবার জন্য বলেন তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না। প্রায় ঘণ্টা খানেক বাদে তিনি জনসাধারণের 'আম্পেরা'কে ত্যাগ করলেন। সারা পৃথিবীর দুঃখ দৈন্য নিয়ে তিনি নাড়াচাড়া করে গেলেন, কিন্তু একবারও উল্লেখ করলেন না ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণের চরম দুঃখদুর্দশার কথা, 'সাণ্ডাঙ্গ পাঙ্গান' বা খাওয়া-দাওয়ার সঙ্কটময় অবস্থার কথা, ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক ভরাডুবির কথা।

এবারে প্রসঙ্গের পরিবর্তন হল ঃ

> আজ্ঞে হ্যাঁ! আমি জানি যে যারা আমাকে পছন্দ করে না তারা আমাকে বিদ্রূপ করে বলে যে আমি একজন man of feeling—একজন gevoelsmens—আর রাজনীতির ক্ষেত্রে man of the arts-এর চরিত্রই আমার মধ্যে বেশি আছে—আমি একটু বেশি

> রকমের আর্টিস্ট। এই সব উপহাসকর উক্তিতে আমি সত্যিই খুশি। খোদাকে ধন্যবাদ যে অনুভূতি আর শিল্পীর বৈশিষ্ট্য নিয়েই আমার জন্ম। আর আমি গর্ব অনুভব করি যে ইন্দোনেশীয় জাতিও হয়েছে এক Nation of Feeling—এক gevoelsvok—একটি Nation of Artists—এক artistenvolk.

আবার হর্ষধ্বনি, উল্লাস, হাততালি। আবার সুকর্ণ মোড় ফিরলেন ঃ

> একই যুগের মধ্যে আমরা বহু বিপ্লবের সম্মুখীন হয়েছি, বহু বিপ্লব ঘটিয়েছি। এই বিপ্লবের মাঝ থেকেই জন্ম হয়েছে ইন্দোনেশিয়ায় নতুন মানবের। আমরা—এই নতুন মানুষেরা সত্য পথে পদক্ষেপ করেছি। আমাদের আদর্শ মহান, তাই আমাদের ওপর আছে খোদার আশীর্বাদ, সমস্ত মানবজাতির—বিশেষ করে New Emerging Forces-এর আশীর্বাদ। মানবজাতির এই সমাজ-সচেতনতাই আমাদের জয়ের পথ দেখিয়ে দেবে।
>
> সুতরাং, ভাইবোনেরা, ইন্দোনেশিয়ার আবালবৃদ্ধবনিতারা, আপনারা মাথা উঁচু করে দাঁড়ান। পিছু হটবেন না, থেমে পড়বেন না। মাটির ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়ান। যদি কোন সময়ে আপনাদের কোনরকম বিভ্রান্তি আসে, যদি কোন সময়ে আপনাদের মনে হতাশা সঞ্চার হয়, যদি কোন সময়ে আমাদের বিপ্লবের ধারা বুঝতে অপারগ হন—তবে মানবজাতির সমাজ-সচেতনতার সমর্থক জনসাধারণের 'আম্পেরা'র বাণীর উৎসমুখে ফিরে যাবেন। আপনাদের মনের সমস্ত বিভ্রান্তি, সমস্ত হতাশা, সমস্ত জটিলতা দূর হয়ে যাবে।

একটানা পৌনে দু'ঘণ্টা বক্তৃতার পর সুকর্ণ থামলেন।

শ্রোতার দল দাঁড়িয়ে উঠে তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তাঁকে বিদায়-অভিনন্দন জানাল। আবার আকাশে বেলুন উঠল, আবার বেজে উঠল মিলিটারি ব্যাণ্ড, শুরু হল সেনাবাহিনীর মার্চ—সুকর্ণ সেনাবাহিনীর সঙ্গে স্টেডিয়ামের বাইরে বেরিয়ে গেলেন। সাইরেন বেজে উঠল।

ভিড় কমতে সময় লাগল প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। রাত্রি তখন অবগুণ্ঠন সরিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। একটু শীত শীত ভাব পড়েছে।

কিম বললেন—চলুন, যাওয়া যাক। আপনাকে হোটেলে পৌঁছিয়ে দিয়ে আমি বাড়ি যাব। সিণ্টার তো নিজের গাড়িই আছে।

বললাম—চলুন।

সিণ্টা বলল—আপনি যান বাপক। আমি বুঙ্গ সেনকে পৌঁছিয়ে দেব। ওঁর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

১১

য়হ্ রাত য়হ্ চাঁদনি ফির কঁহা
শুন যা দিল কী দস্তান।

এই রাত, এই চাঁদনী কোনদিন ভুলতে পারব না। এমন রাতেই সেই কথা বলা যায়, এমন মধু-মদির জ্যোছনায়। সেইজন্যই বোধ করি সিণ্টা তার জীবনের একটি পরিচ্ছেদ উন্মুক্ত করার জন্য কিমের কাছ থেকে আমাকে ছাড়িয়ে এনেছিল।

তুপাশে গাছের প্রহরী, মাঝখানে সুপ্রশস্ত হাইওয়ে। জ্যোৎস্নার মায়াময় আলো-আঁধারির মাঝখান দিয়ে তীব্রগতিতে সিণ্টার মোটর গাড়ি ছুটে চলেছে। খোঁপা-বাঁধা চুল কখন খুলে পড়েছে, হাওয়ায় চুলগুলো উড়ছে। নিষ্কম্প মুখ প্রাণহীন, আবেগহীন। স্টিয়ারিং-এর ওপর রাখা হাত তুটি শুধু গাড়ির ঝাঁকানিতে থর থর করে কাঁপছে।

গাড়িতে উঠে অবধি সিণ্টা একটা কথা বলে নি, অকারণে আমিও তাকে বিব্রত করতে চাই নি। প্রয়োজন হলে সে বলবেই এবং বলবার প্রয়োজনেই আমাকে নিয়ে তার এই সুদূর অভিসার। সিণ্টার এই আত্মমুখী নিঃসঙ্গতা, এই নিস্পৃহ উদাসীনতা কিংবা এই স্বেচ্ছা-নীরবতা আমার কাছে একেবারে নতুন নয়। হাস্যমুখরা, প্রাণোচ্ছলা সিণ্টাকে সিঙ্গাপুরেও মাঝে মাঝে এ ধরনের খোলসের অন্তরালে আশ্রয় নিতে

দেখেছি। মাঝে মাঝে যখনই সে কোন কারণে নিজেকে নিঃসহায় মনে করে, যখনই তার বিশ্বাসের পাঁচিল ভেঙে পড়ে, তখনই সে নিজের চারপাশে এক দূরত্বের ব্যবধান গড়ে তুলে নিঃসঙ্গতার প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়াতে চায়।

কোথায় যাচ্ছি, জানি না। কেন যাচ্ছি, জানি না। শুধু জানি, সিণ্টা নিয়ে চলেছে। তার এই নীরন্ধ্র নীরবতার কারণ আমি আঁচ করতে পারি শুধু। তার মনে বইছে ঝড়, সে ঝড় না থামলে তার গাড়িও থামবে না। এখন যে-কথা বলতে চায় সেই কথা বলার জন্যই হয়তো সে দুপুরবেলায় আমার হোটেলে এসেছিল, লিণ্ডু বা ভূমিকম্পের ভয়ে নয়। ভূমিকম্পের দেশে যার বাস, সামান্য ভূমিকম্পে সে ভয় পেতে যাবে কেন?

এতক্ষণ গাড়ি ছুটে চলেছিল নিষ্প্রদীপ অথচ জ্যোৎস্নালোকিত প্রশস্ত পথ ধরে। শহর থেকে দূরে, আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার বাইরের দেশের বুক চিরে আমরা ছুটে চলেছিলাম। কিন্তু এখন আবার দূরে আলোর রোসনাই দেখা গেল, আবার আমরা প্রবেশ করতে লাগলাম ফেলে-আসা যন্ত্র-সভ্যতার দেশে।

গাড়ি এসে থামল একেবারে সমুদ্রের কোল ঘেঁষে। একটু দূরে সারি সারি জাহাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে। এতক্ষণে বুঝলাম আমরা এসেছি তাঞ্জুঙ-প্রিয়কে। জাকর্তার বন্দর। অতীত-কলকাতায় স্ট্র্যাণ্ডের মতোই সুন্দর বেড়ানোর জায়গা। অনেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কেউ বা সমুদ্রের ধারে বসে রয়েছেন।

গাড়ি থেকে নেমে আমরাও পথ ধরে কিছুদূর হেঁটে গেলাম, তারপর একটা ওআরিঙিন গাছের নীচে একটা বেঞ্চির ওপর দুজনে গিয়ে বসলাম।

এতক্ষণও সিণ্টা একটি কথাও বলে নি। আমিও তার এই আত্মমগ্নতা ভাঙবার চেষ্টা করলাম না। সমুখের অনন্ত-বিস্তার সমুদ্রের দিকে

তাকিয়ে রইলাম। আকাশ থেকে চাঁদ তার সমস্ত জ্যোৎস্না ঢেলে দিয়েছে এই সমুদ্রের বুকের ওপর। জাহাজের আলোগুলো এই জ্যোৎস্নার কাছে কত নিষ্প্রভ, কত অবান্তর মনে হচ্ছে।

সমুদ্রের জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হল: এই সেই ভারত মহাসাগর যার একপ্রান্তে আমাদের দেশ, আর এক প্রান্তে এই দেশ। একই সমুদ্র, একই সবুজ জল, একই তরঙ্গ। তখনই মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের এই দেশকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটি কবিতার দুটি পংক্তি:

> আমি তোমায় চিনেছি আজ, তুমি আমায় চেনো—
> নূতন পাওয়া পুরানোকে আপন বলে জেনো।

এতক্ষণ পর সিণ্টা তার উদাস দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল আমার দিকে, তারপর একটু হাসল।

বলল—আমার ওপর খুব রাগ করছেন, না?

বললাম—রাগ করি নি, তবে তোমাকে চেনবার চেষ্টা করছি শুধু।

চিনতে পারলেন?—একটু ঘেঁষে এসে বসল সিণ্টা।

না,—মাথা নেড়ে জানালাম।

একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে সিণ্টা বলল—আমি শুধু ভাবছি একটা কথা—এরকমভাবে আর কখনও ভাবি নি। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় তো আজ নয়, সিঙ্গাপুরে—প্রায় সাত আট মাস হল। কিন্তু কোনদিন এ কথা আমার মনে হয় নি। আমার দেশ বলীদ্বীপে, আমিও আপনার মতোই হিন্দু—যদিও আমাদের দেশে জাত বা ধর্মের কোন গোঁড়ামি নেই। আমাদের দুজনের সংস্কৃতিও এক, আমাদের দুজনের কাজও এক। কেন এমন হল? কেন আপনি এত দূর দেশ থেকে এখানে এলেন? কেনই বা আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় হল? আপনার কথা মনে হলেই আমার হাজার হাজার বছর আগেকার কথা মনে পড়ে যায়। আমাদের পূর্বপুরুষেরা তখন আপনাদের দেশ থেকেই

এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, যেমন আজ আপনি এসেছেন। তাঁরা আর ফিরে যান নি, আর আপনি ?—

বললাম—ফিরে যাব।

একটা ঘা খেল যেন সিণ্টা। চমকে আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি আমার চোখের ওপর রেখে বলল—তবে আমিও যাব।

তারপরেই হেসে ফেলে বলে উঠল—তাড়িয়ে তো আর দিতে পারবেন না।

জিজ্ঞাসা করলাম—হরাতোনোও যাবে কি ?

মুখের ভাবটা তার কঠিন হয়ে এল, প্রায়-নীরস কণ্ঠে জবাব দিল—হরাতোনোর কথা আমাকে বলবেন না। আজ থেকে ওর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

বললাম—কেন ? রাগারাগি করেছ ?

—যে হরাতোনোকে আমি জানতাম সে হরাতোনো আর নেই। কয়েকটা বছরে সে কত বদলিয়ে গিয়েছে ! আজ সে অন্য মানুষ। প্রতি লোককে সে আজ সন্দেহ করে, প্রতিটি কাজে তার সন্দেহ হয়। চারদিকে সে ষড়যন্ত্র দেখছে। তার দৃষ্টি এখন অন্য দিকে। তার কাছে আজ আমি বীরোক্রাট, নেকোলিম পুতুল ;—আর আপনি হয়েছেন দালাণ্ড। আমাকে নাচিয়ে বেড়াচ্ছেন। এই কথা আজ সে বলে গেছে। এই সংবাদ আমার কাছে মোটেই প্রীতিপদ নয়। আমাকে নিয়ে সিণ্টার সঙ্গে হরাতোনোর মনোমালিন্যও যেমন দুঃখের, সেইরকম বিপদের এবং ভয়ের হয়েছে আমার সম্বন্ধে হরাতোনোর বিরূপ ধারণা। ইতিপূর্বেই হরাতোনা আমার সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করে তা জানতে পেরে গেছি। আমার হোটেলে বসে আভাসে ইঙ্গিতে এবং কখনো বা স্পষ্টভাবেই জানিয়েছে সে কথা। বিদেশের কয়েকটি বন্ধুর মাঝে একজন শত্রুই মারাত্মক বিপজ্জনক। এখন আমার

এখানে থাকা মোটেই উচিত নয়—না কাজের লোভে, না রোমান্সের মোহে।

আমি বললাম—দেখ সিণ্টা, আমি তোমাকে স্নেহ করি। তোমাকে আমি অনেকদিন ধরে দেখছি, তোমার যাতে ভাল হয়, তুমি যাতে সুখী হও, তা-ই আমার করা কর্তব্য। হরাতানো তোমাকে ভালবাসে, তাই তোমার ওপর সে জোর দেখাতে চায়। সেইজন্যই সে চায় না যে তুমি আমার সঙ্গে বেশি মেলামেশা কর। ওকে দুঃখ দিয়ে তোমার তো কোন লাভ হবে না। একটা সিগারেটের বিজ্ঞাপনে দেখেছি made for each other. তুমি আর হরাতোনোও 'মেড ফর ঈচ আদার'।

আপনি কিছু বুঝবেন না,—বলল সিণ্টা,—আপনাকে নিয়ে আমাদের মধ্যে কিছু হয় নি। হরাতোনোর বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। আর···আর ওর সম্বন্ধে যে-কথা শুনছি—

শোনা কথায় কান দিও না,—বললাম তাকে। গুজবে বিশ্বাস করো না। আর তাছাড়া, আমি তোমার চেয়ে অনেক—অনেক বড়।

ত্রিদা তুআন,—হেসে ফেলল সিণ্টা,—না মশাই। আপনি আমার চেয়ে বেশি বড় ন'ন।

—অনেক বড়? জানো, আমার বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি!

—আর আমারও প্রায় তিগাপোলু (ত্রিশ)!

বললাম—ইমপসিব্‌ল। অসম্ভব। তোমার চেহারাতেই মালুম হয় তোমার বয়স—

আপনার চেহারাতেই বা আপনার বয়স মালুম হবে না কেন?—প্রশ্ন করল সিণ্টা।

বললাম—না তা নয়। আমার বিশ্বাসই হয় না যে তোমার অত বয়স হবে। আমি বরাবরই ভেবে এসেছি তোমার বয়স বাইশ চব্বিশ হবে।

তা কি করে হয়?—বলল সিণ্টা।—বাবা যখন মারা গেলেন তখন

আমার বয়স তুজুঃ কি দেলাপন (সাত কি আট) তারপর কতদিন হয়ে গেল !

একটু উদাস হয়ে গেল সিণ্টা।

তার বাবার মৃত্যুর কাহিনী আমি জানতাম না, তা নয়। সিণ্টাই আমাকে বলেছে। তারপর আজ কতদিন হতে পারে—সে ধারণাও আমার আছে। অথচ আমার কোনদিন মনে হয় নি যে তার বয়স প্রায় ত্রিশ হবে। সত্য কথা বলতে গেলে, ওর বয়সের কথা কোনদিন মনেই করিনি।

সিঙ্গাপুরে স্যুটিং-এর অবসরে মাঝে মাঝেই ওর সঙ্গে গল্প করতাম, ওর কথা শুনতাম, বাহাসা শিখতাম। আমাদের ভাষার সঙ্গে ওদের ভাষার অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে অবাক হতাম। পূজাকে ওরা বলে ডেউ অরচান্যো (দেব অর্চনা) বইকে বলে পুস্তকা, বাড়িকে বলে আস্তানা, গুরুকে বলে গুরু। ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম শুধু নতুন ভাষার লোভে। ভাষার বহু সাদৃশ্য দেখলেও সংখ্যা গণনার মধ্যে সাদৃশ্য না দেখে অবাক হয়েছি। সাতু, দিয়া, তিগা, এম্পত, লিমা, এনম, তুজুঃ, দেলাপন, সেম্বিলন, নোল—আর এক, তুই, তিন, চার ইত্যাদির মধ্যে কোন সাদৃশ্যই খুঁজে পাই নি। আমাদের হিন্দী ভাষার সঙ্গেই বেশি মিল। নারী (বনিতা)-কে ওরা বলে ওঅনিতা, হিন্দীর মতোই।

দূর থেকে যেন সিণ্টার গলা ভেসে এল। ধরা গলায় বলল— আপনার কাছেই কেন যে আমি আমার মন খুলতে পারি। হাজার হাজার বছর আগে আমাদের তুজনের পূর্ব-পুরুষরাই একই দেশের লোক ছিলেন বলেই কি আপনার সঙ্গে আমার এই আত্মিক সম্বন্ধ, যাতে আপনাকে পর বলে মনে হয় না? আপনার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকেই আমার সেই পূর্বপুরুষের দেশ ভারতবর্ষকে কাছ থেকে বড় দেখতে ইচ্ছা হয়েছে। কোনদিন সে ইচ্ছা পূর্ণ হবে কি না জানি না,—তবু—

একটু চুপ করে থেকে সিণ্টা আবার বলতে লাগল—আপনাকে আমার অনেক কথাই বলেছি, হরাতোনোর কথাও।—এখন সেই হরাতোনোর কথাই আমার বারবার মনে পড়ছে। কিন্তু এখন দেরী হয়ে যাবে। চলুন, ফিরে যেতে যেতে গাড়িতে বলব সে কথা—

আশ্চর্য গভীর রাত্রি।

পৃথিবীর যে-কোন দেশে, যে-কোন স্থানে, যে-কোন বন্ধ ঘরে সমস্ত গভীর রাত্রি একই অন্ধকার, একই নৈঃশব্দ্য, একই নিঃসঙ্গতা, একই অসহায়তা নিয়ে আসে। একই ছায়া দোলে মনে, একই ছায়া বাসা বাঁধে ঘরে। সমস্ত দেহ-মন সেই বন্ধ ঘরে অন্ধকার ছায়ার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে একসময়ে নিঃঝুম হয়ে পড়ে, আর তখন রাত্রির অন্ধকার হৃদয়ের গভীর থেকে কথা বলে ওঠে।

জানলার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালে নিদ্রিতা জাকর্তার মোহিনী মূর্তি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এক শীতল অন্ধকার নিঃসীম আকাশ জুড়ে, নগরী জুড়ে নিঃসঙ্গ অন্ধকার। শুধু দূরে—বহুদূরে একটি ক্ষীণ আকাশ-প্রদীপ জ্বলছে—মেরডেকা স্কোয়ারের ন্যাশনাল মনুমেণ্টের ওপরের আলো।

জানলা বন্ধ করলেই আরো অন্ধকার।

সেই অন্ধকারে বসে আছি আমি একা। মেহেদি হোসেন খাঁ সাহেবের একটা গানের কলি বারবার মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল—নিদ ন আওয়ে সজন বিনা।

এই অন্ধকারে একা একা শুধু মনে পড়ছিল সিণ্টার কথা। গাড়িতে ফিরতে ফিরতে সিণ্টা বলেছিল তার কথা। এই দুঃসাহসী মেয়ের সেই আশ্চর্য কাহিনী শুনে তার প্রতি শ্রদ্ধার মাত্রা আমার শুধু বেড়েছিল। বিস্ময়কর কাহিনী হওয়া সত্ত্বেও স্তম্ভিত হই নি, কারণ তার অন্য

কাহিনীও আমি শুনেছি। আমার মনে শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেই এক নির্জন সুন্দর জ্যোৎস্নাময়ী রাতের কথা, যেদিন প্রথম সাত আট বছরের মেয়ে সিণ্টার কাহিনী আমি শুনি। সিণ্টার সেই রাত্রির ভাবাবেগই যেন এখন এখানে এই কয়দিন সজোরে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে।

মনে মনে ফিরে যাই সিঙ্গাপুরে, এক বছর আগে।

নির্বান্ধব সিঙ্গাপুরে ছবি তোলার পর অবসর যাপন অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ত যদি না আমার ছবির নায়িকা সিণ্টা মাঝে মাঝে এসে আমার সঙ্গে গল্প করত। প্রথম প্রথম শুধু আমাকে বীচ রোড বা মাইসোর রোড ধরে ঘুরে বেড়াতে হত। ভিক্টোরিয়া হল-এর সামনে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড ঘড়িটার ঢং ঢং শব্দ শুনে রাত্রে হোটেলে ফিরতাম। র‍্যাফল্স্ হোটেল সেখান থেকে দূরে নয়—তবু ওইটুকু পথ কত দীর্ঘ মনে হত। প্যালেস গে থিয়েটারে বসে একা সিনেমা দেখতে দেখতেও বিরক্ত লাগত। পার্লস্ হিল, পোর্ট ক্যানিং, ক্যালাঙ ক্রীক, ক্যাপেল হারবার—কয়েকদিনের মধ্যেই সব কিছু দেখা শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সিণ্টা-ই আমার অবসর সময়টুকু ভরিয়ে রাখবার চেষ্টা করত। সন্ধ্যাবেলা হয় আমার হোটেলে বসে তুজনে গল্প করতাম, নয় তুজনে বেড়াতে যেতাম। ছুটির দিন হলে সিঙ্গাপুরের আশেপাশের অসংখ্য পুলো (দ্বীপ)-র এক একটিতে গিয়ে উঠে পিকনিক করতাম। পুলো অনিক মাটি, পুলো রেম্পাঙ্গ, পুলো সেন্টকো, পুলো ডোঙ্গাস, পুলো সেবারোক, পুলো সাম্বু ইত্যাদিতে সিণ্টার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি।

আমার মতো সিণ্টাও এই দেশে বিদেশিনী। যদিও তার জন্ম এই দেশে, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে আবার যখন সে ফিরে এল তখন সব কিছুর পরিবর্তন হয়ে গেছে। তার পরিচিত লোকজনও আর কেউ নেই। সেইজন্যই সে-ও এখানে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করত। বোধহয় সেইজন্যই আমরা তুজনে একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম।

স্টুডিওতে কিংবা শুটিং-এর সময়ে সিণ্টা আমাকে পরিচালকের সম্মান দেখিয়ে তফাতে থাকবার চেষ্টা করত, কিন্তু কাজ শেষ হলে সে ঠিক আপনজনের মতো হয় উঠত। এইভাবে চলেছিল প্রায় মাস আটেক। ছবিও শেষ হল। সেই সময় একদিন বিকেলে সিণ্টা এল আমার হোটেলে।

বলল—আজ আপনাকে আমি নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। আজ আপনাকে আমি চীনা মন্দির দেখাব, হোটেলে খাওয়াব—

জিজ্ঞাসা করলাম—চীনে হোটেলে ?

হেসে সিণ্টা বলল,—খাওয়াতে পারি, কিন্তু আমার ইচ্ছা সিঙ্গাপুর গার্ডেন ক্লাবে খাওয়া—

বললাম—সিঙ্গাপুর গার্ডেন ক্লাব তো মাল্টি-মিলিওনেয়ারদের আড্ডা।

বড়লোকদের ক্লাব নিশ্চয়ই,—বলল সিণ্টা—তবে টাকা খরচ করলে আমরাও যেতে পারি।

বললাম—তা যেতে পারি, কিন্তু অত টাকা খরচ করার দরকার কি ?

আপনি হাড়-কিপটে,—খিলখিল করে হেসে উঠল সিণ্টা, বিচিত্র ভ্রূভঙ্গী করে বলল—যে মেয়ে আপনার ঘরে উঠবে সে দেখছি শুকিয়ে মরবে।

আমিও অনুরূপ হেসে জবাব দিলাম—তোমার ভাগ্য ভাল যে তুমি আমার ঘরে উঠবে না।

চোখ তুলে থমকিয়ে তাকাল সিণ্টা। তারপর বলল—ভাগ্যে থাকলে তাও হতে পারে। আপনি তো আর ডুকুন (গনৎকার) ন'ন যে আগে থেকে বলতে পারবেন।

ডুকুন না হলেও বলা যায়,—উত্তর দিলাম।—আমি আমার কথা জানি, আমি তোমার কথা জানি, তোমার হরাতোনোর কথা জানি।

সিণ্টাকে জব্দ করার জন্যই হরাতোনোর প্রসঙ্গ তোলা। আমাকে সে

হরাতোনোর কথা অত্যন্ত আবেগের সঙ্গেই বলেছে, কিন্তু তারপর সে হরাতোনোর প্রসঙ্গ একেবারে চাপা দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেই এসেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সিণ্টা বলল—এখন উঠুন।

সিঙ্গাপুরে সিণ্টা-ই আমার গাইড। বুকিট টিমোর রোড, আয়ার রাজা রোড ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এসে পড়েছিলাম চীনা-পল্লীতে। অধিকাংশই মালয়ী-চীনা, জাত-চীনার সংখ্যা কম। মালয়ী-চীনা মেয়েরা অনেকটা মালয়ীর মতো—সারঙ আর কোর্তা পরে, পান খায়। মালয়ী-চীনা মেয়েদের এখানে বলে নোঞ্ঞা।

পথঘাট বিশেষ পরিষ্কার নয়, বাড়িঘরের অবস্থাও তদ্রূপ। গ্র্যানাইট পাথরের থাম, লাল ইটের দেয়াল, সবুজ টালির ছাদ—আর্কিটেক-চারেও এক বিশেষ চীনা-ছাঁদ।

চীনা-পল্লীর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম যে শেষ পর্যন্ত সিণ্টা মত বদলিয়ে চীনা হোটেলেই নিয়ে যাবে, কিন্তু এসে উঠলাম এক চীনা মন্দিরে। দল বেঁধে চীনা বুড়োবুড়ী, ছেলেমেয়ে মন্দিরে যাচ্ছে, আসছে—মাঝে মাঝেই পটকার চট্‌পট্‌ চট্‌পট্‌ শব্দ। সেই ভিড়ে মিশে আমরা দুজনেও মন্দিরে প্রবেশ করলাম। বুঝতে পারলাম, সিণ্টার এখানে যাওয়া-আসা আছে। সিণ্টাই আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল চীনা দেবদেবীর সঙ্গে—যুদ্ধের দেবতা কোয়াঙ-তী, বিদ্যার দেবী গুয়েন-চাঙ আর করুণার দেবী কুয়ান-য়িন।

চাপা গলায় সিণ্টা জিজ্ঞাসা করল—পূজো করবেন?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

দুজনে এসে দাঁড়ালাম মন্দিরের মধ্যে বড় বেদীর পাশে। দু'ধারে দোকান। দোকানে দোকানে সাজানো লাল রঙের বাতি, পটকা, ধূপকাঠি, কাগজে লেখা মন্ত্র। সিণ্টার নির্দেশমতো কিনলাম পূজার সামগ্রী। দেবতার সামনের বেদীতে পূজার সামগ্রী রেখে দেবতাকে

প্রণাম জানালাম, মনে মনে প্রার্থনা করলাম। তারপর বাতিগুলো জ্বালিয়ে বিরাট ড্র্যাগনমূর্তির পিঠের কাঁটার ওপর সেগুলি বসিয়ে, ধূপকাঠি জ্বেলে ধূপদানিতে বসিয়ে দূরের একটা বিরাট পিতলের বাসনের মধ্যে মন্ত্র-লেখা কাগজগুলোয় আগুন ধরিয়ে ফেলে দিলাম। পূজো শেষ হলে চলল পটকা ফাটানোর পালা।

নতুন এবং আশ্চর্য এক অভিজ্ঞতা।

এই সাত্ত্বিক পরিবেশ থেকে বাইরে বেরিয়ে মনটা কেমন উদাস হয়ে গিয়েছিল। তুজনের মুখে একটিও কথা ছিল না। একটি কথা না বলেই আমরা গাড়িতে করে গিয়েছিলাম সিঙ্গাপুর গার্ডেন ক্লাবে। রাজসিক পরিবেশে রাজসূয় ডিনার শেষ হয়েছিল মাত্র কয়েকটি কথার মধ্য দিয়ে। ডিনারের পর তুজনে সেই নরম জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে হেঁটে উঠলাম সিগলাপ-এর সমুদ্রতীরে। চারদিকে ঘন নারকোল বন, তারই মাঝে সাদা বালি জ্যোৎস্নায় চিকচিক করছে আর সমুদ্রের তুরন্ত তরঙ্গ তার বুকে আছড়িয়ে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে ফেনিল হয়ে উঠছে। সমুদ্রের ঢেউ ছাড়িয়ে দূরে ছোট ছোট দ্বীপগুলি এক একটি স্বপ্নপুরীর মতো দেখাচ্ছিল।

সেই বালির মধ্যে পা ছড়িয়ে তুজনে পাশাপাশি বসলাম। আমার মন ফিরে গেল প্রায় বিশ বছর আগে। সে রাতও ঠিক এইরকম জোৎস্নাময়ী ছিল, সে রাতেও আমার সঙ্গে আর একটি মেয়ে ছিল, সে রাতেও এই রকম এক সমুদ্রতীর আমাদের উন্মনা করে তুলেছিল। ডেড-সী'র সেই রাতের কথা* হঠাৎ আমার তখন মনে পড়ে গেল। সিণ্টা তখন আর সিণ্টা নয়, যেন নোরা আমার পাশে বসে আছে। এ যেন সিঙ্গাপুরের সমুদ্র নয়,—ডেড-সী। দূরের ধূসর নারকোল বন-ঘেরা পুলো ব্লাকাঙ মাটি, পুলো সুবর, পুলো সাম্বু ছাড়িয়ে আমার চোখ আমার মন চলে গিয়েছিল প্যালেস্টাইনে।

* লেখকের 'আরব-কাঁটা ইজরায়েল' দ্রষ্টব্য।

চোখের সামনে নিঃসীম অন্ধকার, হৃদয় জুড়ে শূন্যতা।

চমক ভাঙল সিণ্টার কথায়। কী যে বলল বুঝতে পারলাম না, তার মুখের দিকে নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

সিণ্টার মুখও কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। তার হাত দিয়ে আমার হাতটাকে নাড়া দিয়ে প্রশ্ন করল—কি হয়েছে?

আমি আমার দু'হাতের মধ্যে তার ডান হাতটাকে চেপে ধরলাম। হাতের মুঠোর মধ্যে তার নরম হাতটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। সিণ্টা কিছু বলল না, মাথা নীচু করে বসে রইল।

এইভাবে অনেকক্ষণ বসেছিলাম। হঠাৎ সিণ্টা আবার বলল—কি হয়েছে বললেন না তো?

আস্তে আস্তে বললাম—কিছু না।

কিছু না তো চুপ করে আছেন কেন?

এমনিই।

এমনিই!—সিণ্টা চোখ তুলে তাকাল। তার চোখে দুষ্টু হাসি ঝিলিক দিচ্ছে। বলল—মন্দিরে মনে মনে কি প্রার্থনা করলেন?

বললাম—কবে দেশে ফিরব—এই ধরনের আর কি।

আর?—

আরও অনেক কিছু—সব কথা কি মনে থাকে? তুমি বলতে পার কি প্রার্থনা করেছ?

নিশ্চয়ই পারি।

বল তো?

ইস্—নিজে বলবেন না, আমার মনের কথা জেনে নিতে চান,—বলে খিলখিল করে হেসে উঠল সিণ্টা। বলল—প্রার্থনার কথা বলতে নেই, ফল হয় না। দেবতা যে জাগ্রত তা আমি বুঝতে পারছি, কেমন তাই না?

সিণ্টা গা ঘেঁষে বসে আমার কাঁধের ওপর মাথা রেখে বলল—কেন এখানে এলাম জানেন?

উত্তর দিলাম—না।

এই জায়গা থেকেই আমি সাত আট বছর বয়সে এই দেশ ছাড়ি—সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। কী ভয়ঙ্কর সেই দিনগুলো, আজও মনে করলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়।

সেই স্তব্ধ জ্যোৎস্নামুখর রাত্রি অতন্দ্র চাঁদের চোখের সামনে গভীর হতে লাগল। কৃষ্ণ-সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা আমাদের পায়ের তলায় আছড়িয়ে পড়তে লাগল। লবণাক্ত বাতাস নারকোল বনের মাথায় মাথায় দোলা জাগিয়ে তুলল। ধূ-ধূ করা সাদা বালির ওপরে শুধু আমরা দুজনে। তারই মাঝে সিণ্টা বলে চলল তার অতীতের কাহিনী।

১৯৪১ সনে আমরা ফিরে যাই।

জার্মানির মতো জাপানও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। প্রথম ধাক্কাতেই তারা আমেরিকার পার্ল হারবারের নৌ-ঘাঁটি বিধ্বংস করে মিত্রশক্তির হৃদয়ে আতঙ্ক এবং অবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছে। এশিয়া এবং বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে জাপানী অভিযান অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ব্রিটিশ ও ওলন্দাজ সামরিক কর্তৃপক্ষ ছিলেন সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

ব্রিটিশদের ধারণা ছিল যে জাপানীরা যুদ্ধে নিপুণ নয় এবং তাদের 'জিরো' প্লেন ব্রিটিশ প্লেনের চেয়ে নিকৃষ্টতর। সেইজন্য জাপানী আক্রমণ সহজে প্রতিহত হবে মনে করে তারা নিশ্চিন্ত ছিল। জাপান মিত্রশক্তির এই দুর্বলতা সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় হালওয়াকিব ছিল। ১৯৩৭ সন থেকে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে তারা চীনের অধিকাংশ উপকূল এবং তীরবর্তী দ্বীপগুলি অধিকার করে বসেছিল। জার্মানি ফ্রান্স এবং নেদারল্যাণ্ড অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রান্সের ভিসি সরকার

দেশ ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে। জাপানী অগ্রগতিতে ভীত সৈন্য-বাহিনীর দলত্যাগের সংখ্যা প্রতি মুহূর্তে বাড়তে লাগল। মিলিটারি পুলিসের সঙ্গে তারা লড়াই করতে লাগল, বন্দুক নিয়ে ভয় দেখিয়ে দলে দলে তারা অসামরিক যাত্রীদের জাহাজে উঠে সিঙ্গাপুর ছেড়ে পালাতে লাগল। চারদিকে অরাজকতা, চরম বিশৃঙ্খলা।

কিন্তু সিঙ্গাপুরের সংবাদপত্রগুলো পড়লে এই সংবাদ পাওয়া যাবে না। বড় বড় হেড লাইন ; SINGAPORE MUST STAND : It SHALL Stand. কিংবা পণ্ডিত নেহরু এবং চিয়াং কাইসেকের সাক্ষাৎকারের বিবরণ। জাভা সী-তে জাপান ও হল্যাণ্ডের মধ্যে দারুণ সংঘর্ষ হয়েছে। আরও বড় খবর—সিঙ্গাপুরে জাপানীদের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি।

অথচ সিঙ্গাপুরে জ্বলছে আগুন। জ্বলন্ত পেট্রোল রিজার্ভয়েরের কালো ধোঁয়া সমস্ত আকাশ অন্ধকার করে রেখেছে। প্রতি মুহূর্তে অগ্রগামী জাপানীদের কামানের শব্দে সিঙ্গাপুর থরথর করে কাঁপছে। সিঙ্গাপুরের সমুদ্রে শুধু পলায়নরত ছোট-বড়, ভাল-মন্দ জাহাজ, মোটর লঞ্চ, নৌকো, সাম্পান, ডিঙ্গি, টোঙ্কান।

জাপানী রেডিও ঘোষণা করল : There will be no Dunkirk at Singapore. The British are not going to be allowed to get away with this time. All ships leaving will be destroyed.

তা-ই হল। জাপানী বোমারু-বিমান হানা দিল সমুদ্রে। কোন জাহাজ বা নৌকো সিঙ্গাপুরের সমুদ্র ছেড়ে যেতে পারল না।

জাপানীরা আয়ার রাজা রোড দিয়ে একেবারে বিনা বাধায় সিঙ্গাপুরের উপকণ্ঠে সামরিক হাসপাতালে প্রবেশ করল। হাসপাতাল বা রেড-ক্রস তাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারল না। অর্ধেক ডাক্তার এবং রোগী বেয়নেটের আঘাতে প্রাণ দিল।

ব্রিটিশ সেনাবাহিনী একবার শেষবারের মতো বাধা দেবার চেষ্টা করল। উত্তরে জাপানীরা চতুর্দিক থেকে বোমাবর্ষণ করতে লাগল। সিঙ্গাপুরের গভর্ণর স্যার শেণ্টন থমাস সিঙ্গাপুরের দায়-দায়িত্ব হস্তান্তর করলেন সামরিক অধিকর্তা লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল পার্সিভালের হাতে। জাপানী বোমা এবং গোলাবর্ষণ যখন তীব্রতর হয়ে উঠল, যখন আত্মরক্ষা আর কিছুতেই সম্ভব নয় তখন জেনারেল পার্সিভাল জাপানী সেনাপতি য়ামাসিতার কাছে ১৫ই এপ্রিল রাত্রি পৌনে আটটায় আত্ম-সমর্পণ করলেন।

তবু যুদ্ধ শেষ হল না।

তখনও হাজার হাজার ব্রিটিশ সৈন্য গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। আত্মরক্ষার জন্য মাঝে মাঝেই তারা গুলি চালাচ্ছে। হঠাৎ দল বেঁধে বাইরে বেরিয়ে জনসাধারণের বাড়ি ঢুকে খাবারদাবার লুটপাট করে সরে পড়ছে।

জাপানী সৈন্যরা হুঁসিয়ার করে দিল সকলকে—ব্রিটিশ সৈন্যদের সাহায্য করলে মৃত্যু। সিণ্টার বাবা ধর্মাদির দোকান লুট করেছিল ব্রিটিশ সৈন্য—ধর্মাদি কেন বাধা দিতে পারেন নি, তাই জনসাধারণকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য তাঁকে রাস্তার চৌমাথায় দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হল।

পনেরই এপ্রিল।

রাত্ত তখন ন'টা।

মরণপ্রায় এই নগরীর ওপরে শ্বাসরুদ্ধ করা, গভীর, অপ্রবেশ্য কালো এক আচ্ছাদন যেন পড়ে রয়েছে। প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি অফিস—বোমা-বিধ্বস্ত হোক বা না-ই হোক—এই মসীকৃষ্ণ ধোঁয়ার গহ্বরে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি পথ, প্রতিটি গলি, হাসপাতাল,

সমুদ্রতীর—সব জায়গা জুড়েই এই ধোঁয়া। বারুদের গন্ধে ভারি ধোঁয়া হাল্কা শীতের রাতে জমাট বেঁধে নগরীর বুকে বসতে শুরু করেছে।

সন্ধ্যাবেলাতেও রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই কালো ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে নীল আকাশে কয়েকটা তারাকে জ্বলতে নিভতে দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু সামান্য একটু বাতাসে আকাশের সমস্ত ফাঁক কালো ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। নগরীর বাইরে থেকে বিধ্বস্ত পেট্রোল ট্যাঙ্কের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে এসে নগরীর ওপরে জমছে।

এ ধোঁয়া কোথা থেকে আসছে তা কেউ জানে না। হয়তো কালাঙ বিমানবন্দর থেকে, হয়তো ইলেকট্রিক কোম্পানির কারখানা থেকে, হয়তো আশেপাশের তৈলদ্বীপগুলো থেকে। কেউ জানে না, কেউ বলতে পারে না। এইটুকু শুধু সকলে জানে যে প্রতিনিয়ত প্রাণান্ত-কারী কালো বিষধোঁয়া এই নগরীর শ্বাসরুদ্ধ করার চেষ্টা করছে, আর রাত ন'টার মধ্যেই নিশ্চন্দ্র নিষ্প্রদীপ মধ্যরাত্রির কালিমা সারা নগরীতে। জ্বলন্ত বাড়িগুলো থেকেও এখন আর এতটুকু আলো দেখা যাচ্ছে না—অনেক আগেই তারা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সিঙ্গাপুরের জীবনও ঠিক তাই।

মৃত্যুর নীরবতা ধীরে ধীরে সিঙ্গাপুরকে ঘিরে ধরছে। মাঝে মাঝে এক একটা গোলা ভীতিকর শিষ দিয়ে মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে হয়তো জলের মধ্যে পড়ছে, নয়তো কোন বাড়ির ওপরে পড়ে ক্ষণেকের জন্য একটু আগুন জ্বালিয়ে বিস্ফোরণের তীব্র শব্দ করছে। সেই আগুন কালো ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। তবু এই আগুন, এই শব্দ যেন রাত্রির একান্ত অবাস্তবতা ও অপার্থিবতাকে বাস্তব করে তুলছিল এবং তার পরেই রাত্রির নীরবতাকে আরো গভীর, আরো মর্মন্তুদ করে তুলছিল। মাঝে মাঝেই নগরীর উত্তর-পশ্চিম সীমানা ছাড়িয়ে, ফোর্ট ক্যানিং বা পার্লস্ হিল ছাড়িয়ে মেশিনগানের খটাখট

শব্দ ভেসে আসছিল ; কিন্তু তা-ও সুদূর, তা-ও অবাস্তব,—যেন স্বপ্নে শোনা বহুদূরাগত প্রতিধ্বনি। সেই রাত্রে সমস্ত কিছুই যেন স্বপ্নের মতো, ছায়া-ছায়া, অশরীরী।

সেই অন্ধকারের মধ্যে পথ হাতড়িয়ে চলেছে ছোট্ট একটা দল—নরনারী-শিশু। দূর থেকে দেখলে মনে হয় তারা অতি বৃদ্ধ—বয়সের চাপে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সকলের মনের ওপর দিয়েই এক প্রবল ঝড় বয়ে গিয়েছে—কী যে সে ঝড় কেউ আর তা স্মরণ করতেই চাইছে না।

এরই মাঝে একটি ছোট্ট মেয়েকে মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে উঠতে শোনা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে একটি হাত তার মুখটিকে সজোরে চেপে ধরছে। শব্দ নয়, কোন শব্দ নয়—এই বর্বর অত্যাচারের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এই ছোট্ট দল রাত্রির গভীর অন্ধকারে গা-ঢাকা দিতে চেষ্টা করছে। জাপানীরা দেখতে পেলে তাদের আর নিস্তার নেই। জাপানীরা এখনও ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীদের আত্মসমর্পণ নিয়ে ব্যস্ত। শুধু আজকের রাতটাই আত্মরক্ষার একমাত্র সুযোগ—যদি না অবশ্য ধরা পড়ে যায়। কাল সকাল থেকে সিঙ্গাপুরের বাইরে যাওয়া অসম্ভব। চারদিকে জাপানী সৈন্য পাহারা দিতে শুরু করবে।

এই ছোট্ট মেয়েটিই আমাদের সিণ্টা। চোখের ওপরে সে দেখেছে তার বাবাকে জাপানীরা গুলি করে মেরে ফেলেছে। সেই কথা সে ভুলতে পারছে না, বাবার কথা মনে হতেই সে কেঁদে উঠছে। অস্ফুটস্বরে সে একবার বলল—বাপক !

মা কথা বললেন না। সিণ্টার বাপক আর নেই। তাঁকে এখানে রেখেই তাঁরা বেরিয়ে পড়েছেন। সিণ্টার ছোট্ট হাত দুটো শক্ত করে ধরে জোরে জোরে হাঁটতে লাগলেন।

একটা ছোট্ট গলির ধারে একটি ছোট ছেলে একঘেয়ে কেঁদেই চলেছে। তার পাশে ভাঙা-চোরা ইট-পাথর-বালির মাঝে পড়ে রয়েছে একটা নারী-মূর্তি, আকাশের দিকে তার চোখ ছুটো বিস্ফারিত—নিষ্প্রাণ। কিন্তু সেই শিশুটির কান্না শুনেও কেউ একবার একটুক্ষণের জন্যও দাঁড়াল না।

কয়েক ঘণ্টা পরে তারা নারকোল বন পার হয়ে এল সিগলাপের সমুদ্রতীরে।

বড় বড় ঢেউ ডাঙার ওপর আছড়ে পড়ছে। দূরের সমুদ্র কালো। কয়েকজন এগিয়ে গিয়ে চারদিক ভাল করে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তারপর হতাশার স্বরে ফিরে এসে বলল—না, কেউ নেই।

সেই ছোট্ট দলটি নারকোল বনের মধ্যেই গা ঘেঁষে বসে পড়ল। পুরুষেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল যে কাপ্তেন চী লিঙ এখানেই তাদের অপেক্ষা করতে বলেছে, টাকাও নিয়ে গেছে—অথচ তার পাত্তা নেই। জাপানীদের হাতে ধরা পড়ল, না টাকা মেরে পালিয়ে গেল!

প্রায় ঘণ্টাখানেক সেখানে তারা বসে রইল। যত রাত গভীর হচ্ছে, ততই তাদের উৎকণ্ঠা বেড়ে উঠতে লাগল। সকাল হলেই পলায়নের আর কোন পথ থাকবে না। এদের পথও অনেক দূর। সকলেই ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসী। ইন্দোনেশিয়ার যে-কোন দ্বীপে উপস্থিত হতে পারলে তবু তারা একটু নিশ্চিন্ত হতে পারে। অবশ্য যদি সমুদ্র-মধ্যে জাপানী আক্রমণে তারা নিমজ্জিত না হয়।

হঠাৎ খুব দূরে যেন তারা ঘর্ঘর্ শব্দ শুনতে পেল। নারকোল গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তারা দেখতে লাগল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। অতি দূরে কালো মতো একটা কি যেন দেখা যাচ্ছে। সেটি আস্তে আস্তে বড় হল। ছোট্ট একটা মোটর লঞ্চ। সেই মোটর লঞ্চ থেকে ছুটো নৌকো নামানো হল। তারপর নৌকো ছুটো এতটুকু শব্দ না করে এগিয়ে এল তাদের দিকে।

আধঘণ্টা পরে পঁচিশ জনের সেই দল দুটো নৌকো বোঝাই করে সমুদ্র ভেঙে চলল মোটর লঞ্চের দিকে। আরো আধঘণ্টা লাগল মোটর লঞ্চে ফিরে যেতে। তারপর সেই অন্ধকার রাত ভেদ করে মোটর লঞ্চটি ছুটে চলল সুমাত্রার দিকে।

সিণ্টা সিঙ্গাপুর ত্যাগ করেছিল সেই রাত্রেই।

১২

বলীদ্বীপে ফিরে এসেছিল সিণ্টা।

কিন্তু সে কোনদিন ভুলতে পারে নি তার শৈশবের স্মৃতি-রঞ্জিত সিঙ্গাপুরকে, আর ভুলতে পারে নি জাপানীদের হাতে তার বাবা ধর্মাদির মৃত্যু। মামারবাড়িতে একা বসে বসে সে শুধু মনে করত সেই-সব দিনগুলিকে। মামারবাড়িতে আসত যেত অনেকে। এখানেই বসে সে শুনতে পেত জাপানীদের অগ্রগমনের কথা। বলীদ্বীপে যেদিন জাপানীরা অবতরণ করল সেদিন সে ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। বলীদ্বীপের অধিবাসীরাও প্রথমে শঙ্কাভিভূত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তাদের নতুন সাহস দিলেন শাহরির। জাপানীদের ভয় করো না, জাপানীদের সঙ্গে হাত মিলিও না, সুযোগ পেলেই জাপানীদের ক্ষতি করো। জাপানীরা স্বরাজ দিতে আসে নি। দেবে না জাপানী উড়ো-জাহাজ এদেশে ছুঁড়ে স্বরাজ।

ইন্দোনেশিয়ার যৌবন চঞ্চল হয়ে উঠল। যুবকেরা দলে দলে গুপ্তসমিতি গড়ে জাপানীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল। মামারবাড়ি থেকে সিণ্টার মামাতো ভাই সুমাত্রো এসে যোগ দিয়েছিল এই দলে। সুমাত্রোর কাছে আসত একটি অত্যন্ত ডানপিটে ছেলে। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুল। অত্যন্ত সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা। তার নাম হরাতোনো। হরাতোনো এসে প্রায় গল্প করত কবে কোথায় তারা কিভাবে জাপানীদের সঙ্গে লড়াই করেছে।

ছোট্ট মেয়ে সিণ্টার চোখে হরাতোনো প্রথম দিনই এক পরম বিস্ময় হয়ে দেখা দিল। ভক্তি শ্রদ্ধায় তার মন ভরে উঠল। হরাতোনো হয়ে উঠল তার হিরো। হরাতোনোও সিণ্টার মনোভাব স্পষ্ট বুঝতে

পেরেছিল, সেইজন্যে সিন্টার কাছে তার বাহাতুরির গল্প করতে তার ভালই লাগত।

সিন্টাও যোগ দিয়েছিল হরাতোনোর দলে। তার কাজ ছিল চিঠি বিলোনো এবং জাপানীরা কি করছে না করছে তার খবর দেওয়া। এই ছোট্ট মেয়েটিকে জাপানীরা কোনদিন সন্দেহের চোখে দেখে নি। ক্রমে হারাতোনোর দলের সঙ্গে সে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। তার মা ভয় পেয়ে গেলেন, মামা সুমাত্রো আর হরাতোনোকে ধমকালেন এবং সিন্টাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন; কিন্তু সিন্টা সব কিছু ভুলতে পারে, বাবার মৃত্যুর কথা ভুলতে পারে না।

আর ভুলতে পারে না যেদিন গভীর রাতে একটি ছোট্ট মোটর লঞ্চ সমেত পাঁচজন ইংরেজ ধরা পড়েছিল। জাপানী সমুদ্রতীর-রক্ষীদল ছোট ছোট ট্রলার, মোটর লঞ্চে করে ঘুরে বেড়াত সারা দিনরাত। তাদের ভয়—কখন ইংরেজ-আমেরিকান-অষ্ট্রেলিয়ানরা গোপনে এসে ইন্দোনেশিয়ার যে-কোন দ্বীপে এসে হানা দেয়। সুমাত্রো-হরাতোনোর দলও কোলেক কিংবা প্রাহুতে করে গভীর অন্ধকারে নদীতে, সমুদ্রে জাপানী লঞ্চের ওপর হানা দেওয়ার চেষ্টা করত। এমনিতে তাদের ওপর জাপানীদের সন্দেহ হত না--ইন্দোনেশীয় কিংবা মালয়ী জেলের দল মাছ ধরার জন্য সবসময়েই নদীতে কিংবা সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা মোটর লঞ্চ তারা ডুবিয়ে দিতে পেরেছিল, গুটি কয়েক জাপানীদলকে তারা গুম করতে পেরেছিল।

সেদিন রাতেও সুমাত্রো, হরাতোনো, দিকজয়া আর আবুগণি একটা কোলেকে চড়ে মাছ ধরার অছিলায় সাগরের উপকূলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ আবুগণি শুনতে পেল একটা এঞ্জিনের ঝক্‌ঝক্ শব্দ। একটু পরেই থেমে গেল সেটা। অন্যান্য তিন বন্ধুকে জানাল সে কথা। চারদিকে তাকিয়ে দেখল তারা—কুয়াশা আর ধোঁয়ায় কিছু দেখা গেল না। তবু নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য প্রায় তীর ঘেঁষে এগিয়ে গেল।

প্রায় আধ মাইল এগিয়ে গিয়ে তারা দূরে একটা কালো মতো কি মাঝ-সমুদ্রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল।

এবার নিঃসন্দেহ হয়ে তারা আস্তে আস্তে অগ্রসর হল। কাছাকাছি এসে দেখল যে, ছোট্ট একটা মোটর লঞ্চে একটা জাপানী পতাকা উড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে তারা স্থির করল যে সেই মোটর লঞ্চটিকে তারা আক্রমণ করবে।

কিন্তু সুমাত্রোর কেমন যেন সন্দেহ হল। বলল—জাপানী মোটর লঞ্চে সার্চ লাইট নেই কেন, আর মাত্র দু'জন কেন ডেকে দাঁড়িয়ে আছে? একদিক দিয়ে তারা নিঃসন্দেহ হয়েছিল যে মোটর লঞ্চে বেশি লোক নেই। থাকলে আরো অনেক লোক জেগে চারদিকে লক্ষ্য রাখত। তারা অত্যন্ত সন্তর্পণের সঙ্গে কোলেকটি লঞ্চের পিছন দিকে বেঁধে চুপি চুপি লঞ্চে উঠে পড়ল। সেই দুটি লোক রিভলভারে হাত দেওয়ার আগেই তাদের হাতে বন্দী হয়েছিল। আর দুজন শুয়ে ছিল, তাদের বন্দী করতেও বেশি সময় লাগে নি।

কিন্তু সুমাত্রোর সন্দেহই ঠিক। তদের চেহারা দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে তারা জাপানী নয়। হাতে মুখে কালো-বাদামী রঙ মাখা। তারা ভাঙা ভাঙা মালয়ী ভাষায় জানাতে চাইছিল যে তারা মালয়ী জেলে; কিন্তু তাদের কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল যে তারা বিদেশী।

এবারে সুমাত্রো তাদের পরিচয় দিল। তাদের পরিচয় শুনে একজন বিদেশী তার বাঁধা হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বলল—আমার নাম ক্যাপ্টেন ক্রুস্ কানিংহাম। এরা আমার বন্ধু এবং সহকর্মী—লেফটেনান্ট প্যাডি কার্স, সার্জেন্ট জন লুডউইক আর মেট টাইগার হামাস্।

তারপর তাদের কাছ থেকে জানা গেল যে উত্তর-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া থেকে তারা এই মোটর লঞ্চে করে বেরিয়েছে সিঙ্গাপুর সম্বন্ধে খবর আনতে এবং পারলে জাপানীদের সেখানে কিছু ক্ষতি করতে। তাদের এই দুঃসাহসে সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। যেখানে তারা ধরা পড়েছে

তারপর থেকে সমস্তটাই জাপানী রাজত্ব। যে-কোন মুহূর্তে তারা ধরা পড়ে যেতে পারে। এত অল্প লোকে তারা সামান্য লড়াইও করতে পারবে না। তাদের চেহারা, তাদের গায়ের রঙ, তাদের কথাবার্তা— সব কিছুই জাপানীরা সহজে ধরে ফেলবে।

হরাতোনোই প্রথম প্রস্তাব দিয়েছিল যে তারা যদি সঙ্গে থাকে তবে দলও ভারী হবে এবং তাদের দেখলে জাপানীরা বিশেষ সন্দেহ করবে না। প্রয়োজনের সময় কানিংহাম তার দলবল নিয়ে এঞ্জিন-ঘরে আত্মগোপন করবেন।

উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল সুমাত্রো, দিকজয়া আর আবুগণি-ও ; কিন্তু কানিংহাম প্রথমে চুপ করে ছিলেন। তিনি এদের ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন নি। কিন্তু সুমাত্রো এতদূর উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল যে কানিংহাম তাদের সঙ্গে নিতে রাজি না হলে তাঁদের বন্দী করে সে তার দলবল নিয়েই সেই মোটর লঞ্চে করে সিঙ্গাপুর যাবে ঘোষণা করল। শেষ পর্যন্ত কানিংহামকে সম্মত হতে হল।

আর সময় নেই। দলের সকলকে খবর দিয়ে আসার জন্য সুমাত্রো একা কোলেক নিয়ে ফিরে গেল। কিন্তু সেখানে আর এক প্রবল সমস্যা দেখা দিল। এই অভিযানে সকলেরই উৎসাহ দেখা গেল, কিন্তু সিণ্টা একেবারে ধরে বসল যে সে সিঙ্গাপুরে যাবেই। সে সিঙ্গাপুর ভাল করে চেনে, সে সকলকে চিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। তাছাড়া তার বাবাকে জাপানীরা ওখানেই হত্যা করেছে· তখন সে জাপানীদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে নি, কিন্তু এবারকার সুযোগ সে ছাড়বে না।

বাধ্য হয়ে সুমাত্রো সিণ্টাকে নিয়ে মোটর লঞ্চে উপস্থিত হল। সিণ্টাকে দেখে কানিংহাম আর তাঁর দলবল ঘোরতর আপত্তি জানালেন। বললেন—আমরা চড়ুইভাতি করতে যাচ্ছি না।

সিণ্টা বলল আমি চড়ুইভাতি করতে যাচ্ছি। সমুদ্রের ধারে চড়ুইভাতি করার সবচেয়ে ভাল জায়গা কোনটা আমি জানি। আমিই

আপনাদের তা দেখিয়ে দিতে পারব। আর আমি যদি না যাই, তবে কেউ যেতে পারবে না।

অনেক কথা কাটাকাটির পর সিণ্টাকে সঙ্গে নিতে কানিংহাম রাজি হলেন।

গভীর রাত্রে মোটর লঞ্চ চলতে শুরু করল।

স্থির হয়েছিল যে সুমাত্রোর দলের দুজন এবং কানিংহামের দলের দুজন একসঙ্গে পাহারা দেবে। জাপানীদের সঙ্গে দেখা হলে সুমাত্রোর দলই কথাবার্তা চালাবে।

সেই অন্ধকার ভেদ করে উত্তর দিকে লঞ্চটি চলতে লাগল। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা লোম্বক আর বলীদ্বীপের মধ্যবর্তী সমুদ্রে এসে উপস্থিত হল। কাছেই বলীদ্বীপের দেন পাসরে জাপানীদের বিমানঘাঁটি। মাঝে মাঝেই জাপানী বিমান আকাশে উঠে চারদিক ঘুরে ফিরে দেখছে। এ সময়ে এই প্রণালী দিয়ে যেতে গেলে জাপানীরা সন্দিগ্ধ হবে। সুতরাং সেখানেই ঘুরে ঘুরে তারা সকলে মাছ ধরতে লাগল।

সন্ধ্যা হতেই আবার তারা যাত্রা শুরু করল। রাতের অন্ধকার বাড়তে না বাড়তেই সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ডাইনে বাঁয়ে দেখা দিল দুটি আগ্নেয়-গিরি। একদিকে লোম্বকদ্বীপের বারো হাজার ফুট উঁচু গুনোঙ রোঞ্জানি, আর একদিকে বলীদ্বীপের দশ হাজার ফুট উঁচু গুনোঙ আগুঙ্গ। আর এই দুই দ্বীপের মাঝে সমুদ্র প্রণালীর ঠিক মধ্যখানে দেখা যেতে লাগল ছোট্ট একটা স্টীমারের মতো নুসা বেসর দ্বীপটিকে।

বলীদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় কয়েকটি সার্চ লাইট ঘুরে ঘুরে সমুদ্র-প্রণালী আলোকিত করে তুলতে লাগল। কানিংহাম আত্মরক্ষার জন্য লোম্বক দ্বীপ ঘেঁষে মোটর লঞ্চটিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন।

ডিজেল এঞ্জিনের শক্তি খুব বেশি ছিল না, ঘণ্টায় সাত আট মাইল সহজেই যেতে পারে ; কিন্তু সে রাতে তারা দারুণ বিপর্যয় এবং উৎ-কণ্ঠার মধ্যে পড়েছিল। প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় একবার যব-সাগর তার সমস্ত জল উজাড় করে দেয় ভারত মহাসাগরে। সেই সময়ে স্রোতের বিপরীত দিকে তারা তিন ঘণ্টায় তিন মাইলও যেতে পারে নি। গভীর রাতে আবার স্রোত বদল হল। এবার ভারত মহাসাগর থেকে জল ছুটে এল। সেই স্রোতে দ্রুত ছুটে চলল লঞ্চটি। নুসা বেসর দ্বীপ পার হয়ে গেল রাত্রির অন্ধকারের মধ্যেই। মাঝে মাঝে দু-একবার তারা নুসা বেসর থেকে সমুদ্রে আলো পড়তে দেখেছে, কিন্তু লোম্বক দ্বীপের কোল ঘেঁষে থাকাতে তারা ধরা পড়ে নি।

তারা আশা করেছিল যে রাত্রির অন্ধকার আর ভোরের কুয়াশার মধ্যেই তারা বলী আর লোম্বক দ্বীপ দুটিকে অতিক্রম করে যেতে পারবে। কিন্তু ভোর হয়ে রোদ পুনোঙ আগুঙ্গের চূড়া ছুঁতেই দুই ধার থেকে কুয়াশা কাটতে শুরু করল। একটু পরেই দুই দ্বীপেরই তীরভূমি পরিষ্কার হয়ে গেল। শুধু লোম্বক দ্বীপের কাছাকাছি একটা কুয়াশার পর্দা তখনও ছিল, কানিংহাম মোটর লঞ্চের মুখ ঘুরিয়ে সেই কুয়াশার মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেললেন।

কিন্তু উৎকণ্ঠার আর শেষ হল না। বলীদ্বীপ শেষ হল তো শুরু হল যবদ্বীপ। যব সাগরে হাজার হাজার প্রাহু আর কোলেকের ছড়াছড়ি আর জাপানীদের সতর্ক পাহারা। লোম্বক দ্বীপ অতিক্রম করে সুমাত্রোর কথামত তারা ধরল কাঙ্গা দ্বীপপুঞ্জের পূর্বদিককার সমুদ্র উপকুলের পথ। এখানে জাপানীরা প্রহরা বসায় নি এইজন্য যে এখান থেকে সবটুকুই তাদের নৌবাহিনীর কর্তৃত্বাধীনে। তাছাড়া এখানকার সমুদ্র অগভীর বলে জাপানী পাহারাদার জাহাজ আসতে চাইবে না। দশদিন ধরে চলল এই দুর্যোগময় সমুদ্র যাত্রা। চোদ্দ দিনের মাথায় এসে পৌঁছুলো তারা বোর্নিওর কুলে।

এবারে তারা একটি ছোট্ট জাহাজকে যেন তাদের পিছু নিতে দেখল। প্রথমটা সকলেই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কানিংহামের আদেশে চারজন ইংরেজ সমস্ত দেহে রঙ মাখতে বসলেন। প্রত্যেকেই পরেছেন ইন্দোনেশীয় পোশাক। সুমাত্রো, হরাতোনো, দিকজয়া, আবুগণি আর সিণ্টা ডেকের ওপর উঠে এল। কানিংহাম চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে তাদের মধ্যে রইলেন ; আর প্যাডি, জন ও টাইগার এঞ্জিন রুমে বসে রইল। ঠিক সেই সময়ে আকাশে মেঘ দেখা গেল। ক্রমে সেই কালো মেঘ সারা আকাশ ছেয়ে ফেলল এবং পর মুহূর্তে শুরু হল প্রবল ঝড় আর বৃষ্টি। সেই ঝড়বৃষ্টিতে সমুদ্রের জল প্রায় ত্রিশ চল্লিশ ফুট ফেঁপে উঠল। প্রচণ্ড ঢেউ-এ লঞ্চটিকে যেন সমুদ্রের মধ্যে আছাড় মারতে লাগল। সিণ্টাকে কেবিনের মধ্যে বন্ধ করে রেখে তারা সেই বৃষ্টিতে প্রথমে প্রাণভরে ভিজে নিল। খাবার জলের অভাব হওয়ার আশঙ্কায় তারা এতদিন স্নান করতে পারে নি। তারপর জল ধরার পালা।

ঘণ্টাখানেক বাদে ঝড় থেমে গেল। আকাশ একটু পরিষ্কার হতেই পিছনের জাহাজটাকে আর তারা দেখতে পেল না। তাদের একটা ফাঁড়া কেটে গেল।

পরদিন ভোরবেলায় তারা পোমপোঙ দ্বীপ ছাড়িয়ে রিও এবং লিঙ্গা দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি এসে পড়ল। এই ছোট ছোট দ্বীপগুলি সমুদ্রের বুকে ইতস্তত ছড়িয়ে যেন সিঙ্গাপুরে যাওয়ার একটা সুন্দর পথ তৈরি করেছে। এক একটা দ্বীপে এক একটা পা রেখে সমুদ্র ডিঙিয়ে চলে গেলেই যেন হয়। দ্বীপগুলি সিঙ্গাপুরের দিকে এগিয়ে একেবারে উত্তরে সিঙ্গাপুরের প্রায় শ খানেক মাইল দূরে হঠাৎ বাঁ-দিকে মোড় ফিরে সুমাত্রার দিকে চলে গিয়েছে। সিঙ্গাপুর আর তাদের মাঝখানে সিঙ্গাপুর প্রণালী, তার মাঝে মাত্র গোটা কয়েক দ্বীপ।

এই সব দ্বীপ শুধু জঙ্গলময়। কখনো কখনো কোথাও মাটির চালাঘর, কোথাও বা কিছু কিছু খেত দেখা যায় ; কিন্তু অধিকাংশ

লোকই মাছ ধরে সংসার চালায়। চারদিকে সবুজ সবুজ আর সবুজ—গাছপালা, বনজঙ্গল, পাহাড় মাটি—সব কিছুই সবুজ। দ্বীপের সরল অধিবাসীরা মাছ ধরতে ধরতে তাদের কোলেক বা প্রাহু থেকে উঁকি মেরে তাদের একবার দেখে নিয়ে নিজেদের কাজেই মন দিচ্ছিল।

বেঙ্গকু দ্বীপের কাছাকাছি আসামাত্র আকাশে হঠাৎ একটা এরোপ্লেন দেখা দিল। এরোপ্লেনটি ঘুরে ঘুরে তাদের লঞ্চটিকে লক্ষ্য করতে লাগল। কানিংহামের আদেশমতো টাইগার, জন আর প্যাডি আবার নীচে গিয়ে আশ্রয় নিল। ডেকের ওপরে রইল সুমাত্রো, হরাতোনো, দিকজয়া, আবুগণি আর সিণ্টা। জাপানী প্লেনটি একেবারে নীচে নেমে এসে লঞ্চটির মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তারা ঝুঁকে পড়ে হাততালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাল। জাপানী পাইলট দু তিনবার তাদের ভাল করে লক্ষ্য করে শেষ পর্যন্ত নিঃসন্দেহ হয়ে উড়ে গেল।

কানিংহাম মোটর লঞ্চটিকে নিয়ে গিয়ে পুলো ডুরিয়ানের এক কোণায় অন্ধকারে নিয়ে গিয়ে রাখলেন।

সিঙ্গাপুর আর মাত্র ত্রিশ মাইল। কানিংহাম এবার সকলকে নিয়ে মিটিং-এ বসলেন। তাঁর মতে তাঁদের যাত্রার শেষ হয়েছে। এবার একটা ছোট দ্বীপ বেছে নিয়ে সেখানে মোটর লঞ্চটি লুকিয়ে রেখে দিয়ে কোলেকে চড়ে সিঙ্গাপুরে যাত্রা করতে হবে। কানিংহাম জানালেন যে তিনি স্থির করেছেন—পঞ্জাঙ্গ দ্বীপে গিয়ে আস্তানা গাড়বেন এবং সেই রাত্রেই তা করতে হবে।

কানিংহাম একদা এই সমুদ্রপথে জাহাজ নিয়ে ব্রিটেন থেকে জাপান যেতেন আর আসতেন। সুতরাং সিঙ্গাপুর সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা সব চেয়ে বেশি। এইজন্য সকলেই মেনে নিল সে কথা। কিন্তু এতদিন পরে মুখ খুলল সিণ্টা। আপত্তি জানাল সে।

বলল—পঞ্জাঙ্গ সিঙ্গাপুরের একেবারে মুখোমুখি হবে। ওখানে বেশি লোকজন থাকে না সত্য, মোটর লঞ্চ লুকিয়ে রাখাও কঠিন না,—কিন্তু কোলেকে করে সিঙ্গাপুরে নামতে গেলে জাপানীদের হাতে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

কানিংহাম বললেন—তুমি তো অনেক কিছুই জান দেখছি সিণ্টা। তুমি যা বললে হয়তো সত্যি, কিন্তু পঞ্জাঙ্গ যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। কারণ পঞ্জাঙ্গ দ্বীপটা তো আমি জানি, আর তার পরের কাজ আমাদেরই করতে হবে।

প্যাডি একবার বলেছিল—ক্যাপ্টেন, সিণ্টার কথাটা আর একবার ভেবে দেখলে হয় না!

কানিংহাম উত্তর দিয়েছিলেন—সময় হলে দেখব।

সেই রাত্রে তারা পঞ্জাঙ্গে এসে উপস্থিত হল। ভাগ্য ভালই বলতে হবে। লঞ্চটিকে লুকিয়ে রাখার জন্য জায়গার অভাব হল না। পাহাড়ের মাঝখানে সমুদ্র সরু খালের মতো হয়ে একজায়গায় ঢুকে গেছে। তার চারদিকে বন-জঙ্গল। সেইখানে তারা মোটর লঞ্চটি রাখল।

কিন্তু সিণ্টার কথাই সত্যি হল। লুকিয়ে থাকার জন্য পঞ্জাঙ্গ অতি চমৎকার জায়গা, কিন্তু সেখান থেকে বেরোবার উপায় নেই। গলাঙ্গ-বারু থেকে প্রতিমুহূর্তে একটা সার্চলাইট ঘুরে ঘুরে সিঙ্গাপুরের সামনের সমুদ্রটিকে আলোকিত করে তুলছে। এই আলোকিত সমুদ্র ভেদ করে তাদের পক্ষে সিঙ্গাপুরে যাওয়া সম্ভব নয়।

সুতরাং কানিংহাম এবার সিণ্টাকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি ঠিক বলেছিলে মা। এখান থেকে সিঙ্গাপুরে যাওয়া সম্ভব না। আমাদের এখন কোন দ্বীপে গেলে সুবিধা হবে বল তো?

সিণ্টা বলল—আমার মনে হয় পুলো ডোঙ্গাসে যাওয়া উচিত। বাতামের উত্তরে আর পুলো সাম্বুর ঠিক পিছনে। এই দ্বীপটা সিঙ্গাপুরের পিছনে এবং খুব কাছে, অথচ কোনকালে লোকজন কেউ

এখানে থাকে না। আর এখান থেকে সিঙ্গাপুরের সিগলাপ সমুদ্রতীর দেখা যায়। সিগলাপেও সন্ধ্যার পর কেউ আসে যায় না।

কানিংহাম সিণ্টার পিঠ চাপড়িয়ে দিলেন।

পরদিন গভীর রাত্রে তারা মোটর লঞ্চ চালিয়ে পুলো ডোঙ্গাসে এসে উপস্থিত হল। চারদিকে আমবন, তারই নীচে চিকচিক করছে সমুদ্রতীর। মোটর লঞ্চটি আস্তে আস্তে যেতে যেতে একটা খাড়ি দেখে তার মধ্যে গিয়ে ঢুকল। আমবনের মধ্যে হারিয়ে গেল লঞ্চটি। বাইরে থেকে কিংবা দ্বীপের ভিতর থেকে আর তাকে দেখার উপায় নেই।

সকলে নেমে পড়ল ডোঙ্গাসে।

আমবন পার হয়ে ছোট্ট একটা পাহাড়। তারই গায়ে কয়েকটা ওয়ারিঙিন গাছ বাতাসে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছে। কাছেই একটা ছোট্ট পুকুর। যেন তারা এক স্বপ্নরাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। মোটর লঞ্চের ডিজেল আর মাছের গন্ধ থেকে রেহাই পেয়ে ভিজে মাটি আর বুনো ফুলের গন্ধ তারা প্রাণভরে আঘ্রাণ করতে লাগল।

রাত্রে আর কিছু করার নেই। ঠাণ্ডা পাথরের ওপর তারা শুয়ে রইল। পরদিন সকাল থেকে শুরু হল মোটর লঞ্চে করে আনা তিনটি কোলেককে জলে নামিয়ে সাজসরঞ্জামে ভর্তি করা। বন্দুক, গুলি, ছোরা, ম্যাপ, বাইনোকুলার, খাবার, জল, আর লিম্পেট মাইন কোলেকে তুলে রাখা হল। একটা নৌকোয় রাখা হল শুধু খাবার আর জল। অন্য দুটোতে অস্ত্রশস্ত্র। তার কারণ জানালেন ক্যাপ্টেন কানিংহাম। একটা নৌকোয় করে প্রথমে সিণ্টা, হরাতোনো আর আবুগণি সিঙ্গাপুরে যাবে। জাপানীরা তাদের দেখতে পেলে খোঁজ করেও কিছু পাবে না। কানিংহাম তাইতে বুঝতে পারবেন যে জাপানীরা এদিকে লক্ষ্য রাখছে কি না। হরাতোনোর কাছ থেকে

ফাউ হিসেবে পথের ধারের একটা কনভয়কেও উড়িয়ে দিয়ে এসেছে। কানিংহাম সকলকে জড়িয়ে ধরলেন।

এখন ফিরে যাবার পালা, কিন্তু ঠিক এখনই ফেরার উপায় নেই। জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই এবার সমুদ্র অবরোধ করে চারদিক খোঁজ করবেন।

ঠিক তাই হল। সিঙ্গাপুর থেকে অনেকগুলো সার্চলাইট সামনের সমুদ্রকে দিনের মতো পরিষ্কার করে তুলল। মোটর লঞ্চের মধ্যে বসে বসে তারা জাহাজের লাল আগুন দেখতে পাচ্ছিল। একটু পরেই আকাশে কয়েক ঝাঁক এরোপ্লেন উড়ে গেল। সারা রাত ধরে আকাশে এরোপ্লেনের আনাগোনা, আর সমুদ্রে জাহাজের ঝকঝক। আঁতিপাতি করে জাপানীরা শত্রুদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

পরদিন সারাদিনেও সেই একই ব্যাপার। পাহাড়টার চূড়ায় উঠে শুধু তারা একবার দেখেছিল যে হাজার হাজার দেশী শাম্পান, কোলেক আর প্রাহু বিধ্বস্ত জাহাজগুলোর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ বাধা দিচ্ছে না।

কানিংহাম বললেন—একদিক দিয়ে ভাল হল। জাপানীরা নিশ্চয়ই সন্দেহ করেছে সিঙ্গাপুরের থেকেই গুপ্তচরেরা এই কাজ করেছে। তাদের দৃষ্টি পড়বে সিঙ্গাপুরের ওপর। হাজার মাইল দূর থেকে জাপানী সমুদ্র ভেঙে কেউ যে আসতে পারে তা তাদের সন্দেহ হয় নি।

সেই রাতে আবার তারা ফেরার পথ ধরল।

১৩

Me, I was nothing, but I came from the people.
I was made of the people. I am Indonesia.
—Soekarna

শ্রীকৃষ্ণের শতনাম মাকে গাইতে শুনেছি আমার ছেলেবেলায়, অবতার-রূপে তাঁকে আমরা কল্পনা করি—তাঁর শত নামে আমরা আশ্চর্য হই না। স্বাধীনতাকামী দেশ তাদের প্রিয় নেতাদের উপাধি-ভূষিত করেছে ভালবেসে—একটি সর্বজনাদৃত উপাধিতেই তারা খুশি এবং দেশনায়কেরাও একটি ভালবাসার ধনেই ধন্য হয়েছেন। কিন্তু অল্পেতে খুশি হবে দামোদর শেঠ কী? নৈব নৈব চ। সুকর্ণ এত অল্পে খুশি হবার পাত্র ন'ন—তা তাঁর সরকারী উপাধির তালিকা দেখলেই প্রতীয়মান হয়!

গ্রেট লিডার অব দি রেভোলিউশন, মাউথপীস অব দি ইন্দোনেশিয়ান পিপ্‌ল্, মেইন বেয়ারার অব দি মেসেজ অব দি পিপ্‌ল্'স্ সাফারিঙ্গ, সুপ্রীম কম্যাণ্ডার অব দি আর্মড্ ফোর্সেস্, সুপ্রীম কম্যাণ্ডার অব দি ইকনোমিক অপারেশানাল কম্যাণ্ড, সুপ্রীম পিপ্‌ল্'স্ ইণ্ডাস্ট্রি বিল্ডার, সান অব দি ডন, সুপ্রীম পাইওনিয়ার, ফাদার অব দি পেজেণ্টস্, সুপ্রীম বিল্ডার, সুপ্রীম প্রোটেক্টর, গ্র্যাণ্ড স্কিপার, চীফ বয় স্কাউট, প্রেসিডেণ্ট, প্রাইম মিনিস্টার, অনারারি চেয়ারম্যান অব দি অ্যাকশন টু কোম্ব্যাট মাইস্ কমিটি, সেভিয়র অব ইন্দোনেশিয়া, গ্রেট শেপ্‌হার্ড

অব ইন্দোনেশিয়ান প্রোগ্রেসিভ উইমেন, সুপ্রীম পেজেণ্ট, লায়ন অব দি প্ল্যাটফর্ম···

ওপরের সব কটি এবং আরো অনেক উপাধি রয়েছে হাজি রাদেন সুকর্ণ অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের। কস্তুরী-মৃগের মতো তিনি নিজের সুবাসেই বিভোর, নিজের জ্যোতির ছটায় নিজেই উদ্ভাসিত। বাক-সর্বস্ব সুকর্ণ-ই শুধু বলতে পারেন: 'হাত্তা এবং শাহরির কোন শক্তি সৃষ্টি করতে পারেন নি। শুধু তাঁরা বক্তৃতাই দিয়ে গেছেন······আমি ঈশ্বরের কাজ করছি।' ইতিহাস কিন্তু বিপরীত কথা বলে।

অতি সংক্ষেপে সুকর্ণের পরিচয় কি? সুকর্ণের আত্মজীবনীর শুরু এইভাবে:

> The simplest way to describe Sukarna is to say that he is a great lover. He loves his country, he loves his people, he loves women, he loves art and above all, he loves himself.

এই চরিত্র-চিত্রণ অবশ্য সুকর্ণের নিজের নয়। 'দি স্টোরি অব ইন্দোনেশিয়া'তে লুই ফিসার সুকর্ণের এই সংক্ষিপ্ত চরিত্র এঁকেছেন। খুশিমনেই সেটি আত্মসাৎ করেছেন সুকর্ণ নিজের জীবনীতে। সব কিছু তিনি ভালবাসেন, কিন্তু সবার ওপরে তিনি ভালবাসেন নিজেকে। সুকর্ণের জীবনে এইটিই সবচেয়ে বড় কথা। এই একটি পরম-সত্যে তিনি সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসী এবং অকপটে তিনি তা স্বীকার করেছেন। স্বাধীনতা-লাভের পর ইন্দোনেশিয়ার ক্ষত-বিক্ষত ইতিহাস এই একটি সত্যকে ঘিরেই রচিত হয়েছে। এবং এই একটি সত্যই লবঙ্গ বনে ঝড় তুলে সুকর্ণের স্বপ্ন-সৌধ ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গিয়েছে।

এশিয়ার আর কোনও জন-নায়কই মানব-জীবনের সর্ব-স্বীকৃত মূল্য-বোধকে এমনভাবে আঘাত দিয়ে আনন্দ উপভোগ করেন নি। মদ্যপান,

বহু-বিবাহ, নারী-সঙ্গ, আত্ম-শ্লাঘা, অর্থ-অপচয়—এই সব তিনি সহজভাবেই নিজের জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং মার্ক্সবাদেও বিশ্বাস—এই দুটি পরস্পর-বিরোধী বিশ্বাস একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব এবং মার্ক্সবাদ নিয়ে এরকম ছেলেখেলা আর কোনও জননায়ক কোনও দেশেই করতে সাহস পান নি। ইন্দোনেশিয়ার গোঁড়া কমিউনিস্টদের পর্যন্ত তাঁর এই মার্ক্সবাদের ছেলেখেলা নীরবে সহ্য করতে হয়েছিল।

তবে কি ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসে সুকর্ণের সত্যকার দান কিছুই নেই? শুধু কি তিনি কথার ফানুস ছিলেন? লোক-ভোলানো বক্তৃতার আফিঙে জনগণকে নেশাগ্রস্ত করেই এতদিন ধরে রাষ্ট্রনেতা এবং সর্বজনপ্রিয় নেতা হয়ে উঠেছিলেন? তাহলে ইন্দোনেশিয়াকে তিনি কি দিয়েছেন?

ইন্দোনেশিয়াকে তিনি দিয়েছেন দুটি জিনিস: আত্মমর্যাদাবোধ এবং একতা। প্রায় আট হাজারটি বড় ছোট দ্বীপের সমষ্টিকে একত্র করে একটি দেশ ও একটি জাতিতে একতাবদ্ধ করেছেন তিনি। হাজার হাজার দ্বীপে অসংখ্য জাতি-উপজাতি একটি জাতিতে পরিণত করেছেন তিনি। মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু, মায়াবাদী প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়, বিভিন্ন দ্বীপের বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম-বিশ্বাস, আচার-ব্যবহারকে একত্রিত করে সকলকে 'ইন্দোনেশীয়' করে তুলেছেন তিনি। তাঁরই সুবুদ্ধি এবং প্রচেষ্টায় ধর্ম বা ভাষা নিয়ে এই দেশে কোন বিরোধ বাধে নি। সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার জন্য একটি মাত্র ভাষা তিনি রেখেছেন 'বাহাসা ইন্দোনেশিয়া'—একটি ছোট্ট জাতির সহজবোধ্য ভাষাকে তিনি জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিয়েছেন; যদিও ইচ্ছা করলে তাঁর নিজের যবদ্বীপ, যার জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি,—তার ভাষাকে জাতীয় ভাষা করতে তিনি সহজেই পারতেন। রোম্যান অক্ষরে বাহাসা ইন্দোনেশিয়ার লিখন প্রচলিত করতেও তিনি ভীত হন নি। দেশের লোককে

তিনি দিয়েছেন আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদাবোধ। তাঁর নিজের উক্তি :
Our people need confidence. This I must give them before I am taken away.
এ শপথ তিনি রক্ষা করেছেন।

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের অফিসের একটি দেয়াল জুড়ে রয়েছে একটি মানচিত্র—যবদ্বীপের গৌরবোজ্জ্বল যুগের মজপহিত সাম্রাজ্যের সীমা উজ্জ্বল রঙে চিহ্নিত। ইন্দোনেশিয়ার সমস্ত দ্বীপ ছাড়াও তার মধ্যে পাওয়া যাবে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, নিউগিনি, বোর্নিও এবং মালয় উপদ্বীপ। ১৩৬৫ সনে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী প্রপঞ্চ তাঁর 'নগরাকের্তাআগাম।' গ্রন্থে মজপহিত রাজ-বংশের গুণকীর্তন করতে গিয়ে এই বিশাল সাম্রাজ্যের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। ফিলিপাইন, নিউগিনি, বোর্নিও কিংবা মালয় মজপহিত সাম্রাজ্যের অধীনে কোনদিন এসেছিল বলে ইসিহাসে জানা যায় না, কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার অধিকাংশ দ্বীপকে একত্রিত করেছিলেন মজপহিত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী গজমদ, যাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য জোগিয়াকর্তায় একটি নতুন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নামকরণ তাঁর নামে করা হয়েছে। এই মজপহিত সাম্রাজ্যই ছিল বরাবর সুকর্ণের স্বপ্ন। তাই ইরিয়ান বরাট নিয়ে কলহ, তাই মালয় এবং বোর্নিও নিয়ে কনফ্রন্টাসি।

১৯৩০ সনের ডিসেম্বর মাসে সুকর্ণ একবার বলেছিলেন :

> প্রথমে আমরা জনগণকে অবহিত করি যে আমাদের অতীত গৌরবময় ছিল, তারপর আমরা তাদের মনে এই ধারণা দৃঢ়বদ্ধ করতে চেষ্টা করি যে বর্তমান অত্যন্ত অন্ধকার এবং সব শেষে তাদের আমরা সুন্দর, সুখী এবং আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বলি।

ওপরের কথাগুলো সুকর্ণ বলেন, কিন্তু বিশ্বাস করেন তিনটি কাজে—এক—জনগণকে তাঁর বক্তৃতায় ভোলাতে ; দুই—প্রতিপক্ষ দলগুলিকে

পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত করে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে এবং তিন—এক সঙ্গে বহু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সম্মুখীন না হয়ে একটি একটি করে ঘায়েল করাতে। এই পদ্ধতিতে অনেকদিন ধরে তিনি রাজনৈতিক সার্কাসের তারের ওপর দাঁড়িয়ে খেলা দেখিয়েছেন। খেলা দেখাতে দেখাতে আত্ম-শক্তির অন্ধ-গর্বে যেদিন একটু ভুল করবেন, সেইদিন হবে অসীম শূন্য থেকে পতন এবং চিরকালের জন্য—

১৯০১ সনের ৬ই জুন পূর্ব যবদ্বীপের সুরাবায়াতে সুকর্ণের জন্ম। সুরাবায়া ছিল সে সময়ে জাতীয় আন্দোলনের উৎসস্থল। তাঁর মা ছিলেন বলীদ্বীপের হিন্দু, বাবা ছিলেন যবদ্বীপের মুসলমান। মা ছিলেন নর্তকী, বাবা শিক্ষকতা করতেন এবং সেই সূত্রে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর বাবা-মা তাঁর সুপ্ত অহমিকা জাগ্রত করে তুলতেন। ফলে তিনি নিজেকে ছেলেবেলা থেকেই সকলের চেয়ে বড় বলে মনে করতেন। তুলুঙ্গাগুঙ্গ-এ ঠাকুর্দা ও ঠাকু'মার কাছেও তিনি মাঝে মাঝে থাকতেন। তাঁরাও অতিরিক্ত আদর দিয়ে তাঁকে নষ্ট করে ফেলেছিলেন।

এই শৈশবের কথা সুকর্ণ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন ঃ

> তখন আমার ভাগ্য ছিল জয়ী হওয়া, বিজিত হওয়া নয়। লাট্টু খেলার সময়ে একদিন আমার এক বন্ধুর লাট্টু আমার লাট্টুর চেয়ে জোরে ঘুরছিল। এই সমস্যার সমাধান আমি খাঁটি সুকর্ণের নিয়ম অনুযায়ী সমাধান করে ফেললাম ঃ আমি তার লাট্টুটাকে ছুঁড়ে নদীর মধ্যে ফেলে দিলাম।

বাবার পরিচয়ে এবং তাঁর বহুদিনের রাজনৈতিক সখা রুসলন আবদুলগণির বাবা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রচেষ্টায় ওলন্দাজ-অধীন ইন্দোনেশিয়ায় তিনি যতদূর সম্ভব ভাল স্কুলে ভর্তি হতে সক্ষম

হয়েছিলেন। স্কুলে তিনি সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ সুবিধার ছিলেন না। তার জন্য তাঁর ভাবনা ছিল না। পরীক্ষার সময়ে নকলে আপত্তি কি? তাঁর নিজের ভাষায়ঃ "আমরা যাকে সহযোগিতা বলি, এটি সেই শিরোনামার আওতায় পড়ে।"

চোদ্দ বছর বয়সে সুকর্ণ সুরাবায়া হাই স্কুলে ভর্তি হলেন। পাঁচ বছর পড়েছিলেন এই স্কুলে এবং এই পাঁচ বছর তিনি ছিলেন সারেকত ইসলাম রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা চোক্রোয়ামিনোতোর বাড়িতে। চোক্রোয়ামিনোতো ছিলেন সুরাবায়ার এক ধনী ব্যবসায়ী এবং জাতীয়তাবাদী নেতা। এঁরই বাড়িতে সে যুগের অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের—আগুস সেলিম, আলিমিন, মুসো, সেমোন—সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। এই পরিবারের সঙ্গে থাকার সময়েই তিনিও জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে সারেকত ইসলাম দলের যুব-সংগঠন 'ইয়ঙ্গ জাভা' দলে যোগদান করেন এবং চোক্রোয়ামিনোতোর 'উটুসান হিন্দিয়া' সংবাদপত্রে নিয়মিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ এবং সম্পাদকীয় লেখেন।

১৯২০ সনে তিনি বান্দুঙ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে সিভিল এঞ্জি-নিয়ারিঙ পড়তে যান; কিন্তু মাত্র দু'মাস পরে চোক্রোয়ামিনোতোর গ্রেফতারের সংবাদ শুনে লেখাপড়া ছেড়ে ওই পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য সরকারী রেলকর্মচারীর কাজ গ্রহণ করেন। আবার কিছুদিন পরে তিনি এঞ্জিনিয়ারিঙ কলেজে পড়তে যান; কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করার জন্য যতটুকু পাঠ্যপুস্তক পড়া দরকার শুধু ততটুকুই পড়ে বাদবাকী সময় পৃথিবীর বীর বিপ্লবীদের জীবনকাহিনী পড়ে কাটাতেন। শহরে শহরে যুব-সংগঠন গঠন করে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। ফলে ওলন্দাজ পুলিশের বিষদৃষ্টিতে তিনি পড়লেন।

১৯২৫ সনে সিভিল এঞ্জিনিয়ারিঙের ডিগ্রি নিয়ে তিনি বান্দুঙেই আর্কিটেক্টের অফিস খুললেন। ইতিপূর্বে তিনি চোক্রোয়ামিনোতোর এক

কন্যাকে ১৯২০ সনে বিবাহ করেছিলেন। তাঁকে ত্যাগ করে এবারে তাঁর চেয়ে প্রায় বারো বছরের বড় বান্দুঙের এক বিশিষ্ট ধনীর কন্যা ইবু ইঙ্গিতকে বিবাহ করলেন।

এ যুগের একরকম বিবাহ-বিশারদ ছিলেন তিনি। ১৯৪৩ সনে তিনি বিবাহ করলেন ফতমাবতীকে, ১৯৫৪ সনে হারতিনি এবং তারপর জাপানী রত্নাসারি দেবী ও সব শেষে হারিয়াতিকে। এক এক স্ত্রী থাকেন এক এক জায়গায় এক এক প্রাসাদে,—যেমন ফতমাবতী থাকেন বোগোর-এ এবং রত্নাসারি দেবী থাকেন জাকর্তায়।

এই সময়ে সুকর্ণ বান্দুঙ স্টাডি ক্লাবের সভাপতি হলেন। এই ক্লাবের সভ্যরা ১৯২৭ সনে প্রতিষ্ঠিত করল পেসারিকাতান নাশিওনাল ইন্দোনেশিয়া (ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদী সঙ্ঘ) এবং ১৯২৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হল এই দল থেকে ইন্দোনেশিয়ান ন্যাশানালিস্ট পার্টি বা পার্তাই নাশিওনাল ইন্দোনেশিয়া (পি. এন. আই)। এই দলের উদ্দেশ্য হল ইন্দোনেশিয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সর্বরকম অসহযোগিতা করার ব্যাপারে দেশবাসীকে তাঁরা আহ্বান জানালেন। সুকর্ণ দেশবাসীকে আত্মনির্ভর হতে ডাক দিয়ে জানালেন যে মস্কো থেকে একটা এরোপ্লেন কিংবা ইস্তানবুলের কোনও খালিফা এ দেশের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে পারবে না। সমস্ত জাতীয়বাদীদলকে তিনি আবার আহ্বান জানালেন একত্রে ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে।

১৯২৮ সনে পি. এন. আই-এর উদ্যোগে ছয়টি জাতীয়তাবাদী দল একত্রিত হয়ে গঠন করল পেমুর্ফাকাতান পেড়িমপুনান পোলিটিক কেবঙ্গমান ইন্দোনেশিয়া বা ন্যাশানাল ইউনিয়ন অব পলিটিক্যাল অ্যাসোসিয়েনস্ এবং এই ফেডারেশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন সুকর্ণ। পি. এন. আই দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল এবং সুকর্ণের বক্তৃতার সম্মোহনী শক্তিতে ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ নিদারুণ শঙ্কিত হয়ে

উঠল। ডিসেম্বর মাসে তারা আরো তিনজন সমেত সুকর্ণকে গ্রেফতার করল। অপরাধ—ওলন্দাজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আটমাস বিনা বিচারে তাঁরা বন্দী হয়ে রইলেন, তারপর তাঁদের বিচার শুরু হল। চার মাস ধরে চলল বিচার। সুকর্ণের হল চার বছর কারাদণ্ড, অন্যদের দু'বছর। আপীলে সুকর্ণের দণ্ড দু'বছর কমিয়ে দেওয়া হল। ওলন্দাজ বিচারালয় সুকর্ণকে কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা দিলেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ ওলন্দাজই যথার্থ বিচার হয়েছে বলে স্বীকার করলেন না। তদানীন্তন সরকারী কর্মচারী এবং ভবিষ্যতে ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজের গভর্ণর জেনারেল ডক্টর এইচ. জে. ভ্যান মুক ওলন্দাজ পত্রিকা "De Shew"তে লিখেছিলেন ঃ

> The top leaders of the P. N. I. were people of such stature that they could have no illusions over the results of violent conflict and must have fully understood that such a conflict would have played completely into the hands of the conservative diehards and could only have had as its results not only the destruction of P. N. I., but also immeasurable injury to the whole Native movement. Inspite of the judicial decisions handed down in two cases, we hereby declare our conviction—firm though without factual support—that Engineer Sukarno and his supporters by no means had force as their 'immediate goal', they were on the contrary very much afraid of acts of violence on the part of their followers.

সুকর্ণের কারাবাসের সময়ে পি. এন. আই-এ দুটি দলে মতবিরোধ দেখা গেল। এক দল চাইছিল শুধু জনগণের সমর্থন। এরা হল পার্তাই ইন্দোনেশিয়া বা পার্টিণ্ডো। এই দলে ছিলেন ভবিষ্যৎ পার্লামেন্টের স্পীকার সরতোনো, ইন্দোনেশিয়ার ভবিষ্যৎ এক প্রধান মন্ত্রী আলি শাস্ত্রমিজোয়ো, মহম্মদ ইয়ামিন (ভবিষ্যৎ তথ্য-মন্ত্রী) এবং

ইস্কাক চোক্রোদিস্থর্য, (পি. এন. আই-এর সেক্রেটারি)। অপর দল হল পেন্দিডিকান নাশিওনাল ইন্দোনেশিয়া (ইণ্ডোনেশিয়ান ন্যাশনাল এডুকেশন ক্লাব) যাঁদের উদ্দেশ্য ছিল দেশের জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়ে প্রথমে রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন করে তুলে পরে গণ-আন্দোলন শুরু করা। এই দলে ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার দুই রাজনৈতিক ইন্টালেকচুয়াল—ডক্টর হাত্তা এবং সুতান শাহরির। ১৯৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে খালাস পেয়ে সুকর্ণ এই দুই দলকে একত্র করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সফল না হয়ে ১৯৩২ সনে তিনি পার্টিন্দোতে যোগদান করলেন। পার্টিন্দো সুকর্ণকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করল এবং সুকর্ণের জনপ্রিয়তার ছায়ায় পার্টিন্দো দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল।

কিন্তু ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষও সতর্ক ছিল। ১৯৩৩ সনের শেষাশেষি সুকর্ণ, ডক্টর হাত্তা এবং শাহরির কারাভ্যন্তরে নিক্ষিপ্ত হলেন এবং ১৯৪২ সনে জাপানী অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা আর মুক্তি লাভ করেন নি।

জাপান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ সুকর্ণকে ফ্লোরেন্স দ্বীপ থেকে দক্ষিণ সুমাত্রায় বেনকুলেনে নিয়ে এল। জাপানীদের অগ্রাভিযানে ভীত ওলন্দাজরা সুকর্ণকে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য মধ্য সুমাত্রার পেদাঙ-এ এনে রাখল। তখন ওলন্দাজ বেসামরিক নরনারীদের ইন্দোনেশিয়া থেকে সরিয়ে ফেলার হিড়িক চলেছে। সুকর্ণ ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষকে এই ব্যাপারে সাহায্য করতে লাগলেন। একদিন এই গণ্ডগোলের সময় তিনি নিরুদ্দেশ হলেন। ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ শত অনুসন্ধানেও তাঁকে আর ধরতে পারল না। জাপানীরা ইন্দোনেশিয়ায় উপস্থিত হলে তিনি বুকিট্টিঙ্গিতে এসে আত্মপ্রকাশ করলেন।

জাপানীরা ডক্টর হাত্তা, শাহরির এবং অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তি দিল। মুক্তি লাভ করেই শাহরির আত্মগোপন করে জাপানী প্রতিরোধ সমিতি গঠন করলেন। তাঁর দলই গেরিলা যুদ্ধে সবচেয়ে তৎপর ছিল, যদিও তাছাড়া অন্যান্য কয়েকটি গুপ্ত সমিতিও গড়ে উঠছিল। এই দলগুলির মধ্যে কমিউনিস্ট দল পরিচালিত শরিফুদ্দীনের নেতৃত্বে একটি দলও ছিল।

সুকর্ণকে জাপানীরা অনুবাদকের কাজ দিল এবং শাহরিরের মতে তাঁর সঙ্গে তাঁরা অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছে। সুকর্ণ জাপানীদের ফ্যাসিস্ট মনে করতেন এবং তাদের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই সংঘর্ষ হত। শাহরির এবং ডক্টর হাত্তা গোপনে মিলিত হয়ে জাপানীদের অধীনে রাজনৈতিক নেতাদের কার্যনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে সুকর্ণ এবং ডক্টর হাত্তা জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে তাদের আস্থাভাজন হবার চেষ্টা করবেন এবং শাহরির আত্মগোপন করে জাপানীদের বিরোধিতা করে যাবেন। শাহরির এবং ডক্টর হাত্তার অনুরোধে সুকর্ণ এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। জাপানীরা সুকর্ণের মত-পরিবর্তনে খুশি হল। আবদুল রহমান ছদ্মনাম নিয়ে সুকর্ণ বাটাভিয়াতে গেলেন জাপানী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে।

সুকর্ণ এবং হাত্তা জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে লাগলেন। জাপানী প্রতিষ্ঠিত বহু সমিতির সুকর্ণ চেয়ারম্যান হলেন, হাত্তা-ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হলেন। কিন্তু এই সুযোগে সুকর্ণ জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে যতদূর সম্ভব জাগ্রত রাখার চেষ্টা করেছিলেন। জাপানীদের সঙ্গে এই সহযোগিতা অনেকে ভাল চোখে দেখে নি, তারা তাঁর কাজের সমালোচনাও করত; কিন্তু সুকর্ণের উত্তর ছিল : By co-operation with the occupation authorities I am able to gain concessions for my

people and get Japanese aid in the coming war with the Dutch. Utilizing what is placed in front of me is a brillint tactic on my part, and that is how I intend to look at it.

কিছুসংখ্যক দেশবাসীই যে সুকর্ণের জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তা-ই নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষও রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে সুকর্ণকে জাপানী সহযোগী নামে অভিযুক্ত করেছিল এই জন্য যে তারা দেখাতে চেয়েছিল, স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্র জাপানীদের দান, স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী জনগণের আহৃত ফসল নয়। ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের এই ভাষ্য স্বাধীনতার প্রথম যুগে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ভাষ্যও ছিল। মুসো সুকর্ণকে বলতেন জাপানীদের দালাল। ১৯৪৮ সনে মাদিউনে কমিউনিস্ট বিদ্রোহের সময় মস্কো রেডিও সুকর্ণকে জাপানী কুইসলিঙ নামে অভিহিত করেছিল। কিন্তু ১৯৬০ সনে আবার সেই কমিউনিস্ট পার্টি ডক্টর হাত্তাকে অভিযুক্ত করেছিল সেই অপরাধে এবং তখন তাদের চোখে সুকর্ণ হয়েছিলেন বিশুদ্ধ এক জাতীয়তাবাদী।

১৯৪৪ সনের শেষ দিক থেকে জাপানীরা পদে পদে মিত্রশক্তির কাছে পরাজিত হতে লাগল। গুপ্ত জাপানীদের মনোবল যতই ভেঙে যেতে লাগল ততই বাড়তে লাগল গুপ্তসমিতির মনোবল। গুপ্ত সমিতিগুলির নাশকতামূলক কাজে আর তারা বাধা দিয়ে উঠতে পারছিল না। শাহরির তখন সকলকে জাপানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে উদ্বুদ্ধ করছিলেন, কিন্তু সুকর্ণ একটু দ্বিধান্বিত ছিলেন। জাপানীরা যদি যুদ্ধের গতি ফিরিয়ে দেয়!

এই সময়ে ১৯৪৫ সনের ১লা জুন সুকর্ণ একটি বক্তৃতায় তাঁর সুপ্রসিদ্ধ

পঞ্চশীল নীতি বিবৃত করেন। এই ভাষণের মধ্য দিয়ে সে-যুগের সুকর্ণের রাজনৈতিক চিন্তাধারা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তাঁর স্বপ্ন, তাঁর ভয়, তাঁর আদর্শ এবং তাঁর আশা এই ভাষণের ভূমিকাতে সুন্দরভাবে সূচিত হয়েছে :

> আমরা ইন্দোনেশীয় জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করব। আমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য হবে : সুমাত্রার প্রান্তসীমা থেকে ইরিয়ান পর্যন্ত সমস্ত ইন্দোনেশীয় ভূভাগ একত্রিত করে একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা! শ্রীবিজয় এবং মজপহিতের যুগে যে ইন্দোনেশীয় রাষ্ট্র ছিল, সেই সমস্ত দেশকে একত্রে নিয়েই আমাদের জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমাদের নতুন রাষ্ট্রের প্রথম ভিত্তি হবে : ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদ, সম্পূর্ণ অর্থে ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদ।
>
> কিন্তু এই জাতীয়তাবাদের আদর্শে নিঃসন্দেহে একটি বিপদ অন্তর্নিহিত থাকে। বিপদ হয়েছে এই যে লোকে এই জাতীয়তাবাদকে চড়িয়ে নিয়ে উৎকট স্বাদেশিকতায় পরিণত করতে পারে এবং ভাবতে পারে "Indonesia uber alles"—সবার ওপরে ইন্দোনেশিয়া। আমরা আমাদের দেশকে ভালবাসি, আমরা আমাদের এক জাতি বলে মনে করি, আমাদের এক ভাষা। কিন্তু আমাদের দেশ ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।
>
> একথা আমরা যেন না বলি যে ইন্দোনেশীয় জাতিই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মহান্, সবচেয়ে ভাল ; কারণ তাতে অন্য জাতিকে ছোট করা হবে। আমাদের অগ্রসর হতে হবে সমগ্র পৃথিবীকে, সমগ্র ভ্রাতৃত্বকে একতাবদ্ধ করতে। আমাদের শুধু মের্ডেকা ইন্দোনেশিয়া প্রতিষ্ঠা করলেই চলবে না, আমাদের সমস্ত জাতিকে নিয়ে একটি পরিবারাবদ্ধ করার চেষ্টা করতেও হবে।

তারপর তিনি তাঁদের কাছে ইন্দোনেশীয় জাতীয় রাষ্ট্রের নীতি বিশ্লেষণ করেন। জানান যে এই নবরাষ্ট্র পাঁচটি আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এই পাঁচটি আদর্শই হল : ঈশ্বরে বিশ্বাস, মানবিকতা, জাতীয়তাবাদ, প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র এবং ন্যায়বিচার।

এই পঞ্চশীল সম্বন্ধে অধ্যাপক জর্জ ম্যাকটার্নান কাহিন তাঁর "ন্যাশা-নালিজ্ম্ অ্যাণ্ড রেভোলিউশন ইন ইন্দোনেশিয়া" বইয়ে বলেছেন :

> Probably in no other exposition of principle can one find a better example of the synthesis of Western democrat, Modernist Islamic, Marxist and indigenous village democratic and communalistic ideas which form the several bases of the social thought of so large a part of the post-war Indonesian political elite.

সুকর্ণের এই অপূর্ব ভাষণে ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেছিল জাপানী কর্তৃপক্ষ, কিন্তু এই বাণীই প্রতিটি ইন্দোনেশীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিকের কাছে জপমন্ত্র হয়ে উঠল।

১৯৪৫ সনের অগাস্ট মাসের প্রথম দিকে জাপান ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীনতা দিতে মনস্থ করল। এই সংবাদ সঠিক জানবার জন্য সুকর্ণ এবং ডক্টর হাত্তা দক্ষিণ ভিয়েৎনামে অবস্থিত জাপানের সামরিক হেড কোয়ার্টার দালাতে গেলেন। স্বাধীনতার আশ্বাস নিয়ে যখন দেশে ফিরে এলেন তখন দেখলেন যে আত্মগোপনকারী জাতীয়তাবাদী দলগুলি শাহরিরের নেতৃত্বে স্বাধীনতার জন্য আর দেরী করতে ইচ্ছুক নয়। জাপানীদের হাত থেকে জোর করে স্বাধীনতা ছাড়িয়ে নিতে তারা বদ্ধপরিকর। দ্বিধান্বিত সুকর্ণকে তাঁরা জোর করে ধরে এনে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বললেন। সুকর্ণ যখন শুনলেন যে তার আগের দিন জাপান আত্মসমর্পণ করেছে তখন সুকর্ণ ১৭ই অগাস্ট ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। জনগণ তাঁকে ইন্দোনেশিয়া গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করল।

কিন্তু শিশু-রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সঙ্গে সঙ্গেই বিঘ্নিত হয়ে উঠল। সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ সৈন্য অবতরণ করল ইন্দোনেশিয়ায় এবং আর কিছুদিন পরে এল ওলন্দাজ সৈন্য। চার বছর ধরে দুই দলে যুদ্ধ-বিগ্রহের পর শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতবর্ষের চাপে

উৎসাহী করে তুলতে লাগল, যাতে দেশ আরো চরম দুর্গতির পথে অগ্রসর হয়, দেশে অরাজকতা সৃষ্টি হয় এবং তখন সময় বুঝে সেই অসন্তুষ্ট এবং দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট জনগণকে হাতিয়ার করে তারা যাতে শাসন-ক্ষমতা সহজেই হস্তগত করতে সক্ষম হয়। এইজন্যই তারা সুকর্ণকে পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলেছিল, এই-জন্যই তারা রুশ-চীন দেশের সঙ্গে শুধু মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হতে বলেছিল, এইজন্যই তারা মালয়সিয়ার বিরুদ্ধে কনফ্রন্টাসি ঘোষণা করেছিল। পাশ্চাত্য শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে শুধু চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হলে মহাপরাক্রমশালী দুই কমিউনিস্ট রাষ্ট্র রাশিয়া ও চীনের জোরে পি. কে. আই সুকর্ণকে নিজেদের মতো করে পরিচালিত করতে পারবে।

সুকর্ণ নির্বোধ ছিলেন না।

কমিউনিস্টদের ভিতরের রূপ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ঠিকই, কিন্তু আত্মাভিমান এবং আত্মবিশ্বাস তাঁকে এত স্পর্ধিত করে তুলেছিল যে তিনি কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাছাড়া, তখন তাঁর কমিউনিস্টদের প্রয়োজনও অত্যন্ত বেশি। সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যতীত শুধুমাত্র সুকর্ণের নবাবীর জন্য আমেরিকা ইন্দো-নেশিয়াকে অর্থ সাহায্য করতেও আর সম্মত ছিল না। অথচ সুকর্ণের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ দিতে অগ্রসর হল রাশিয়া এবং চীন —দুই কমিউনিস্ট দেশ। সেইজন্য স্বদেশেও কমিউনিস্ট-প্রীতির বন্যা তিনি বইয়ে দিলেন।

পাশ্চাত্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সুকর্ণ ১৯৬০ সনে আর এক তথ্য আবিষ্কার করলেন। তার মূল কথা হল—পৃথিবীতে মাত্র দুটি দল আছে : নব-জাগ্রত শক্তি এবং প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত শক্তি।

১৯৫৫ সনে বান্দুং সম্মেলনে জহরলাল নেহেরুর নিরপেক্ষ-নীতির সূত্র ধরে তিনি বলেছিলেন :

> এশিয়া এবং আফ্রিকার অধিবাসীরা শক্তির লড়াইয়ে মাততে পারে না। আমাদের কাছে কূটনীতি শক্তির খেলা নয়। আমরা কী করতে পারি? আমরা অনেক কিছু করতে পারি। বিশ্বের ঘটনাবলীতে আমরা যুক্তির বাণী এনে দিতে পারি।

কিন্তু ১৯৫৫ সনের এই তিন-জগৎ তত্ত্ব ১৯৬০ সনে দুই-জগৎ তত্ত্বে পরিবর্তিত হয়ে গেল। এই নতুন তত্ত্বে বিশ্বের তিন-চতুর্থাংশ আফ্রিকা-এশিয়ার অধিবাসীরা বাকী এক চতুর্থাংশ—প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত শক্তির সঙ্গে মরণ-সংগ্রামে লিপ্ত। তাঁর যুক্তি অনুযায়ী নব-জাগ্রত শক্তিকে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে হবে:

> নব-জাগ্রত শক্তি গঠিত হয়েছে এশীয় জাতিবৃন্দ, আফ্রিকার জাতিবৃন্দ, ল্যাটিন আমেরিকার জাতিবৃন্দ, সাম্যবাদী দেশগুলির জাতিবৃন্দ এবং ক্যাপিট্যালিস্ট দেশগুলির প্রগতিশীল দলগুলিকে নিয়ে।

তবে, যেহেতু ভারতের সঙ্গে চীনের বিরোধ সেইজন্য ভারত নিরপেক্ষ দেশ হয়েও 'নব-জাগ্রত শক্তি' হতে পারবে না; কিন্তু পাকিস্তান আমেরিকা-প্রবর্তিত সামরিক সংস্থা সিয়াটোর সভ্য হওয়া সত্ত্বেও চীনের বন্ধু বলে 'নব-জাগ্রত শক্তি' হতে পারে।

দেশকে চরম অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে সুকর্ণ এতদূর টেনে এনেছিলেন যে জনসাধারণকে তাদের 'সন্দাঙ্গ পাঙ্গান' (নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন) পর্যন্ত তিনি মিটিয়ে উঠতে পারছিলেন না। কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সুকর্ণ তখন ঘোষণা করলেন যে দেশের এই দুরবস্থার জন্য দায়ী হয়েছে ক্যাপিট্যালিস্ট দেশসমূহ, তাদের জীবন-যাত্রার মান তারা এত উন্নীত করেছে শুধু ইন্দোনেশিয়াকে হেয় করতে। ১৯৬৩ সনের ৩০শে জুলাই জাকর্তার পুলিশ অধিকর্তা ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল সুহুদ ঘোষণা করলেন যে দেশে পকেটমার বৃদ্ধি হয়েছে বিদেশী রাষ্ট্রের চক্রান্তে, যাতে নব-জাগ্রত শক্তির সংগ্রামকে দমন এবং হেয় প্রতিপন্ন করা যায়।

১৪

পরাধীন ইন্দোনেশিয়াতে শুধুমাত্র ইন্দোনেশীয়দের নিয়ে কোন সেনাবাহিনী ছিল না। জাপানী অধিকারের বিরুদ্ধে গেরিলা-সংগ্রামী জনগণকে গড়ে পিটে সেনাবাহিনী তৈরি করা হয় এবং সেই সেনা-বাহিনী ওলন্দাজ বাহিনীর বিরুদ্ধে অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করে দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়। এই জন্যই স্বাধীন ইন্দেনেশিয়ায় সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক দলের মতোই বিশিষ্ট আসন গ্রহণ করেছিল।

ইন্দোনেশিয়ায় সামরিক বাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ইন্দোনেশিয়াতেই নয়—এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার রাজ্যে—যেখানেই রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে সেখানেই সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মাথা গলিয়েছে। নতুন স্বাধীনতা-প্রাপ্ত রাজ্যগুলির রাজনৈতিক-শাসকেরা নিজেদের শাসনের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করার জন্য বরাবর সামরিক বাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করেছেন ; ফলে সামরিক বাহিনীই হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অপরিসীম শক্তিশালী।

ভারতবর্ষ, মালয়, সিংহল, ফিলিপাইন প্রভৃতি রাজ্যে রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা স্বাধীনতার পরেও অবিচ্ছিন্ন ছিল, কিন্তু সেই অবস্থা ছিল না পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, চীন কিংবা থাইল্যাণ্ডে। তাই যেখানে ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে নি, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে তারা প্রথম থেকেই হস্তক্ষেপ করতে

সক্ষম হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত বেসামরিক শাসকদের হাত থেকে শাসন-ক্ষমতাও ছাড়িয়ে নিয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ শাসনের আমলে ইন্দোনেশিয়ার কোন সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠতে পারে নি। সামরিক বাহিনীতে ইন্দোনেশীয়দের প্রবেশ করার সুযোগও দেওয়া হত না। কিন্তু বরাত-জোরে কয়েকজন মাত্র সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে পেরেছিলেন। অফিসার হতে পেরেছিলেন মাত্র তিনজন—(জেনারেল) আবদুল হ্যারিস নসুশান, (মেজর জেনারেল) টি. বি. সিমতুপঙ এবং (এয়ার মার্শাল) সূর্যদর্ম।

জাপান ইন্দোনেশিয়া অধিকার করার পরেও প্রথমে ইন্দোনেশীয়রা জাপানীদের কাছ থেকে সমর-শিক্ষা লাভ করে নি। কিন্তু ১৯৪৩ সনের শেষের দিকে মিত্রশক্তির আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ইন্দোনেশীয় যুবকদের নিয়ে "সুকরেলা তেন্তেরা পেম্বেলা তানা এয়ার" বা "পেতা" নামে একটি প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করেছিল। সামরিক শিক্ষার প্রথম সুযোগ লাভ করে ইন্দোনেশীয় যুবকেরা দলে দলে 'পেতা'য় যোগ দিতে লাগল এবং সামরিক শিক্ষালাভ করে প্রথমেই তারা জাপানীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল। এক যবদ্বীপেই প্রায় চল্লিশ হাজার 'পেতা' সৈন্য ছিল। এই 'পেতা'-ই হয়ে দাঁড়াল ভবিষ্যৎ স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার প্রধান সামরিক বাহিনী। স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বাহিনীর প্রথম সর্বাধিনায়ক জেনারেল সুদিরমান এবং মেজর জেনারেল আহমদ ইয়ানিও ছিলেন এই 'পেতা'রই অফিসার।

আর একটি সেনাবাহিনীও এই সময়ে গড়ে উঠেছিল। জাপানী অভিযান প্রতিরোধ করার জন্য স্বাধীনতাকামী যুবকেরা একটি গেরিলা বাহিনী গঠন করেছিল, তার নাম দিয়েছিল তারা লস্কর রাকিয়ত বা

'গণবাহিনী'। কিন্তু এই গণবাহিনীর কর্তৃত্ব ছিল বিভিন্ন দলের এবং ব্যক্তির অধীনে। সেইজন্য স্বাধীনতার পরে তাদের একটি কর্তৃত্বের অধীনে আনা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সনের জুন মাসে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় বাহিনী বা তেন্তেরা নাশিওনাল ইন্দোনেশিয়ার মধ্যেই তাদের নিয়ে আসা হয়।

দেশ যখন স্বাধীনতা অর্জন করল তখন তাই ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন সামরিক সংগঠন একতাবদ্ধ হয়ে একটি কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নি। রাজনৈতিক দল এবং নেতাদের কার্যকলাপে তারা সন্দিগ্ধ ছিল। ওলন্দাজদের সঙ্গে কুটনৈতিক চুক্তি বা 'রেনভিল' চুক্তি স্বাক্ষরের সময় সামরিক পরামর্শ না নেওয়ায় তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। সেই চুক্তির ফলে সামরিক বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটিগুলি ওলন্দাজদের হাতে ছেড়ে দিতে হয়, যার ফলে ভবিষ্যতে ওলন্দাজ আক্রমণে ইন্দোনেশীয় সামরিকবাহিনী পিছু হটে আসতে বাধ্য হয়। একবারই নয়, প্রতিটি চুক্তিতেই রাজনৈতিক নেতাদের সমরনীতির ব্যর্থতা দেখা গিয়েছে। সংগ্রামে পরাজয়ের সমস্ত গ্লানিই বহন করতে হত সামরিকবাহিনীর বলে। তারা দিন দিন রাজনৈতিক নেতাদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিল। সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত ইন্দোনেশিয়ার সামরিক বাহিনীর ইতিহাসে উল্লেখ আছে :

> We had to sacrifice repeatedly our military positions for the sake of diplomatic interest ; however diplomacy had repeatedly experienced failures.

এই অসন্তোষ থেকেই শুরু হল রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ।

স্বাধীনতা ঘোষণার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই তার পরিচয় পাওয়া গেল। কমিউনিস্ট নেতা তান মালাকা ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী

শাহরিরের নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে আন্দোলন শুরু করলেন। সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের অস্তিত্বই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল। শাহরির তান মালাকাকে গ্রেফতার করলেন কিন্তু জেনারেল সুদিরমান তাঁর সৈন্য-বাহিনী পাঠিয়ে তান মালাকাকে মুক্তি দিলেন। তান মালাকা-পন্থী একদল সৈন্য প্রধানমন্ত্রী শাহরিরকেই অপহরণ করে নিয়ে গেল। এই সংবাদ শুনে আর এক সেনাবাহিনী অগ্রসর হয়ে শাহরিরকে মুক্তি দিল এবং শাহরির-বিরোধী প্রতিরক্ষামন্ত্রী আমির শরিফুদ্দীনকে অপহরণ করার চেষ্টা করতে লাগল।

সৈন্যবাহিনীতে বেশ কিছুসংখ্যক কমিউনিস্ট এবং কমিউনিস্ট সমর্থক থাকা সত্ত্বেও যখন কমিউনিস্টরা ১৯৪৮ সনে মাদিউনে বিদ্রোহ ঘোষণা করল, তখন কিন্তু সেনাবাহিনী তাদের সমর্থন করে নি। বরং সামরিক বাহিনী তড়িৎগতিতে সেই বিদ্রোহ দমন করে।

এই বিদ্রোহের পর হাত্তা সামরিকবাহিনীকে নতুনভাবে গঠন করতে চেষ্টা করেন। বৃদ্ধ সামরিক অফিসারদের অবসর গ্রহণ করিয়ে এবং নিয়মিত সরকারী সৈন্যবাহিনী ব্যতীত অন্য বাহিনী বন্ধ করিয়ে সরকারের অধীনে একটি শক্তিশালী সামরিকবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নসুশান গোলটেবিল বৈঠকে হেগ-এ গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এলেন স্থলবাহিনীর অধিকর্তা এবং সমগ্র সামরিক বাহিনীর উপ-অধিকর্তা হয়ে। হাত্তার নীতি রূপায়ণের ভার পড়ল তাঁর ওপরে, ফলে তিনি চারদিক থেকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হন। তখন সাময়িকভাবে এই নীতি পরিত্যক্ত হয়।

১৯৫১ সনের জুন মাসে সামরিকবাহিনীর সঙ্গে সরকারের আবার সংঘর্ষ বাধে। সুকিমান সরকারের দুর্বল নীতিতে সামরিক বাহিনী অধৈর্য হয়ে উঠছিল। বিদ্রোহী দারিউল ইসলাম দলের গেরিলাবাহিনী পশ্চিম যবদ্বীপে করাতোসুবীরোর নেতৃত্বে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল। এদের গ্রেফতারের পরোয়ানা সই করতে বিচারমন্ত্রী রাজি

হচ্ছিলেন না। ফলে সামরিকবাহিনী প্রধানমন্ত্রী সুকিমানকে এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চরমপত্র দিল। সুকিমান প্রধানমন্ত্রীর গদী হারাতে রাজি ছিলেন না, ফলে বিচারমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হল। এখানেই বিরোধের নিষ্পত্তি হল না। এই ব্যাপারে প্রতিরক্ষামন্ত্রী সেওয়ক এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করল। সুকিমান এবং তাঁর মন্ত্রীরা সামরিকবাহিনীর বিরোধী—এই মনে করে সামরিক কর্তৃপক্ষ সুকিমান সরকারের পতনের জন্য চাপ সৃষ্টি করল। সুকিমান সরকারের পতনে সামরিকবাহিনী এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৫২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি সেই স্মরণীয় দিন। এই দিন থেকে ইন্দোনেশিয়ায় সামরিকবাহিনী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে এবং সেই অনুপ্রবেশ আজও অব্যাহত।

সুকিমানের পরে ১৯৫২ সনের ৪ঠা এপ্রিল উইলোপো প্রধানমন্ত্রী হলেন। সেনাবাহিনীর মনোনীত প্রার্থী জোগিয়াকর্তার সুলতান হলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। সামরিকবাহিনীর মনোরঞ্জনের জন্যই উইলোপোকে এই ব্যবস্থা মেনে নিতে হয়। অবশ্য জোগিয়াকর্তার সুলতান সত্যিকারের যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। ওলন্দাজ আক্রমণের সময় তাঁর অসীম দেশপ্রীতি এবং চরম স্বার্থত্যাগ দেশবাসীকে মুগ্ধ করেছিল। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ ছিলেন পদাধিকার বলে সমগ্র সামরিকবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতিটি নির্দেশ তাঁকে সই করতে হত। তখন ইন্দোনেশিয়ায় এক একজন সেনাধ্যক্ষ এক এক দেশে অধীনস্থ সেনাবাহিনী নিয়ে রাজার মতো থাকতেন। এই দুর্নীতি দূর করার জন্য স্থলবাহিনীর অধিকর্তা নসুশান উত্তর সুমাত্রার সেনাধ্যক্ষ কর্ণেল সিম্বোলোনকে পূর্ব যবদ্বীপে বদলী করলেন এবং পূর্ব যবদ্বীপের সেনাধ্যক্ষ কর্ণেল বাম্বাঙ্গ সুগেঙ্গকে উত্তর সুমাত্রায় বদলীর নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশনামায় সই করতে সুকর্ণ অস্বীকার করলেন, কারণ এই দুই সেনাধ্যক্ষ তাঁর অনুগ্রহভাজন।

সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে ব্যক্তিগত আক্রোশ, ঈর্ষা এবং দ্বন্দ্ব এবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সুকর্ণর এক আত্মীয় কর্ণেল বাম্বাঙ্গ সুপেনো নসুশানকে পদচ্যুত করার জন্য সুকর্ণর কাছে আবেদন জানালেন। সারা দেশ ঘুরে ঘুরে সুপেনো নসুশানের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে লাগলেন।

সামরিকবাহিনীর অভ্যন্তরে এই বিভেদ উৎপাটন করার জন্য সামরিক-বাহিনীর অধিকর্তা মেজর জেনারেল সিমতুপাঙ্গ তাঁর বাড়িতে ১১ই জুলাই বড় বড় সেনাধ্যক্ষের একটি সভা আহ্বান করলেন। এই সভায় নসুশান অনুপস্থিত ছিলেন। মেজর জেনারেল সিমতুপাঙ্গ কর্ণেল বাম্বাঙ্গ সুপেনোর কাছে তাঁর কাজের কৈফিয়ৎ দাবী করলেন কিন্তু কোন কৈফিয়ৎ দিতে অস্বীকার করে সুপেনো সভা ত্যাগ করলেন।

পরদিন কর্ণেল সুপেনো রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ এবং প্রধানমন্ত্রী উইলোপোর কাছে চিঠি লিখে জানালেন যে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের ওপর তাঁর আস্থা নেই। কয়েকদিন পরে সামরিকবাহিনীর উপ-অধিকর্তা নসুশান কর্ণেল সুপেনোকে সাসপেণ্ড করলেন। কর্ণেল সুপেনো নসুশানের নির্দেশ মানতে অস্বীকার করলেন। এই বিরোধের মীমাংসার জন্য প্রতিরক্ষামন্ত্রী জোগিয়াকর্তার সুলতান, মেজর জেনারেল সিমতুপাঙ্গ এবং কর্ণেল নসুশান রাষ্ট্রপতি সুকর্ণের সঙ্গে দেখা করলেন। আলাপ-আলোচনা গরম গরম তর্কে পরিণত হল। সুকর্ণ এবং সিমতুপাঙ্গের মধ্যে কড়া কথা বিনিময়ও হল। সুকর্ণ সুপেনোর পক্ষ অবলম্বন করলেন।

জোগিয়াকর্তার সুলতান প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে কর্ণেল সুপেনোকে পদচ্যুত করলেন।

সামরিকবাহিনীর অভ্যন্তরে এই গণ্ডগোলে উল্লসিত হয়ে উঠলেন রাজনীতিকরা। ১৬ই অক্টোবর পর্যন্ত তাঁরা পার্লামেণ্টে সামরিকবাহিনী সম্বন্ধে কড়া সমালোচনা করতে লাগলেন। সামরিকবাহিনীর অধিকর্তা

উপস্থিত হলেন স্থলবাহিনীর সতের জন সর্বোচ্চ পদস্থ কর্মচারী। এই দলে ছিলেন সিমতুপাঙ্গ, নসুশান, সিম্বোলোন, অ্যালেক্স কাওইলারাঙ্গ, জালিকুসুমো, সুবন্দো, কোসাসিশ এবং সুত্রতো। একসঙ্গে এতজন সামরিক কর্মচারীর সঙ্গে সুকর্ণ একা কথা বলতে সম্মত হলেন না। তাঁকে সাহায্য করার জন্য ডেকে পাঠালেন ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ডক্টর হাত্তা, প্রধানমন্ত্রী উইলোপো এবং পার্লামেণ্টের স্পীকার প্রিঙ্গোদিগদোকে। এবারে সংগ্রাম আর প্রেসিডেণ্ট এবং স্থলবাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। এবারকার ঘটনা হয়ে দাঁড়াল অসামরিক এবং সামরিক শক্তির মধ্যে ক্ষমতার লড়াই।

প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে তর্কাতর্কি চলল। কোন পক্ষই এক চুল সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করল না। সামরিক কর্তৃপক্ষ দাবী জানাল—পার্লামেণ্ট ভেঙে ফেলে নতুন নির্বাচন করতে হবে। সুকর্ণ এ কথা মেনে নিতে সম্মত হলেন না।

সুকর্ণের প্রাসাদের সামনে একের পর এক সৈন্যবাহিনী এসে দাঁড়াতে লাগল। এই তর্কের মধ্যে সামরিকবাহিনী প্রাসাদের টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফের তার কেটে দিল। সামরিকবাহিনী জাকর্তায় সভাসমিতি নিষিদ্ধ করে ফরমান জারি করল। রাত আটটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত 'কারফিউ' বসল।

সুকর্ণ তবু সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে নতিস্বীকার করলেন না। সামরিক শক্তিই ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল।

রাজনৈতিক নেতারা সামরিকবাহিনীর এই ভীতি-প্রদর্শন ভুললেন না। তাঁরাও সামরিকবাহিনীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য তৈরি হলেন। সামরিকবাহিনীকে শায়েস্তা করার জন্য সুকর্ণের সঙ্গে হাত মেলালো পি. কে. আই। বড়দের গায়ে হাত দিতে সাহস হল না কারুরই, খড়্গ পড়ল ছোটদের ওপর।

জাকর্তা থেকে লেঃ কর্ণেল ডক্টর সুবন্দো পূর্ব যবদ্বীপে ফেরামাত্র তাঁকে গ্রেফতার করা হল। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন একজন নিম্নতম কর্মচারী লেঃ কর্ণেল সুদিরমান। দক্ষিণ সুমাত্রার সেনাধ্যক্ষ লেঃ কর্ণেল কোমাসিশ পালেমবাঙে ফেরামাত্র তাঁর অধীনস্থ লেঃ কর্ণেল ক্রেতার্তো তাঁকে পদচ্যুত করে সেনাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করলেন। পূর্ব ইন্দোনেশিয়ার সেনাধ্যক্ষ কর্ণেল সুব্রতোকে ১৯৫২ সনের ১২ই নভেম্বর মাকাসার থেকে তাড়িয়ে লেঃ কর্ণেল জুপ ওয়ারু সেনাধ্যক্ষ হলেন। ১৮ই ডিসেম্বর সুকর্ণ নসুশানকে পদচ্যুত করে কর্ণেল বাম্বাঙ সুগেঙ্গকে নসুশানের স্থলাভিষিক্ত করলেন। সুগেঙ্গ ছিলেন নসুশান এবং জোগিয়াকর্তার সুলতানের বিরুদ্ধবাদী।

এই সব ব্যাপারে সুলতান প্রতিবাদ করে আসছিলেন, কিন্তু নসুশানের ব্যাপারে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করলেন।

একদিকে মাসউমি-সোস্যালিস্ট দল এবং অপর দিকে পি. এন. আই—পি. কে. আই গোষ্ঠী। পি. এন. আই—পি. কে. আই-এর সমবেত চেষ্টায় মাসউমি দল ভেঙে গেল। নতুন দল গঠিত হল নাহদাতুল উলামা। উইলোপোর মন্ত্রীসভা এই ফাঁড়া কাটিয়ে উঠতে পারল না। ১৯৫৩ সনের ২রা জুন তিনি পদত্যাগ করলেন।

নির্বাচনের পর পি. এন. আই নেতা ডক্টর আলি শাস্ত্রমিজোয়ো হলেন প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চালে ভুল করার জন্য তাঁকেও সরে যেতে হল।

এই ঘটনার নায়ক হলেন কর্ণেল জুলফিকর লুবিস।

লুবিস হয়েছেন নসুশানের মাসতুতো ভাই। নসুশানের অধীনে তিনি সহকারী চীফ অব স্টাফ ছিলেন। ১৭ই অক্টোবরের ব্যাপারে তিনি সামরিক কর্তৃপক্ষের বিপক্ষে সুকর্ণকে সাহায্য করেন। লুবিসের আদেশেই সেনাধ্যক্ষদের পদচ্যুত করা হয়। সুতরাং লুবিস আশা করেছিলেন যে সুকর্ণের কাছ থেকে তিনি পুরস্কার লাভ করবেন।

কিন্তু কাজ হাসিল হওয়ার পর সুকর্ণ তাঁকে ভুলে গেলেন। নসুশানের পদচ্যুতির পর তাঁর জায়গায় চীফ অফ স্টাফ করা হল কর্ণেল বাম্বাঙ সুগেঙ্গকে। লুবিসের কথা কেউ একবার মনেও করলেন না। লুবিস্ সুগেঙ্গকে ছাড়লেন না, দিনের পর দিন তাঁকে এমন জ্বালাতন করতে লাগলেন যে মরিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি ১৯৫৫ সনের ১৬ই জানুয়ারি পদত্যাগ করলেন ; কিন্তু সুকর্ণ তাঁর পদত্যাগ গ্রহণ করলেন না।
সামরিক কর্তৃপক্ষও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। ১৭ই অক্টোবরের ব্যাপারে তাঁদের পরাজয় এবং সুকর্ণের জয়ে রাজনৈতিক নেতারা সামরিক বাহিনীকে নিয়ে ছেলেখেলা করে দিয়েছেন। এই খেলা বন্ধ করতেই হবে। সুতরাং ১৭ই অক্টোবরের ব্যাপারের পক্ষের এবং বিপক্ষের সামরিক নেতারা জোগিয়াকর্তায় ১৭ই ফেব্রুয়ারি একটি সভায় মিলিত হলেন। আটদিন সভার পর একটা একতার সর্ত স্বাক্ষরিত হল। একটা প্রস্তাবে পদচ্যুত সেনাধ্যক্ষদের পূর্বপদে বহাল করার জন্য সুকর্ণকে অনুরোধ জানানো হল। তারপর সকলে সদলবলে জেনারেল সুদিরমানের সমাধিতে ফুল দিয়ে বললেন : "স্বাধীন, সুপ্রতিষ্ঠিত, ঐশ্বর্যময় এবং শান্ত ইন্দোনেশিয়ার ধূপ দিয়ে আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারলাম না বলে দুঃখিত।"
সুকর্ণ পদচ্যুত সামরিক কর্মচারীদের পুনর্বহালে রাজি হলেন না। একতাবদ্ধ সামরিক কর্তৃপক্ষ এবার নিজেদের দাবী আদায় করতে বদ্ধপরিকর হলেন। স্থলবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ হিসেবে সুগেঙ্গ ১৬ই মে পদত্যাগ করলেন। সহকারী সর্বাধ্যক্ষ লুবিস অস্থায়ী সর্বাধ্যক্ষ হলেন ; কিন্তু ডক্টর আলি সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী কুসুমোসুমন্ত্রী জুন মাসে স্থির করলেন যে ১৭ই অক্টোবর-বিরোধী কর্ণেল পাম্বাঙ উতোয়োকে সর্বাধ্যক্ষ করবেন। ২৭শে জুন তাঁকে পদাভিষিক্ত করা হবে। ২৫শে জুন লুবিস সুকর্ণকে স্পষ্টই জানালেন যে সামরিকবাহিনী কর্ণেল উতোয়োকে সর্বাধ্যক্ষ বলে স্বীকার করবে না।

২৭শে জুন কর্ণেল উতোয়োকে সর্বাধ্যক্ষ পদে অভিষিক্ত করার সময় দেখা গেল যে একজনও সামরিক কর্মচারী উপস্থিত নেই। এমন কি সামরিক ব্যাণ্ডও সেখানে আসে নি। ফায়ার ব্রিগেডের ব্যাণ্ড বাজিয়ে উতোয়োকে তখন অভিষিক্ত করা হল।

স্থকর্ণের আদেশমতো প্রতিরক্ষামন্ত্রী লুবিসকে পদচ্যুত করলেন। সামরিক কর্তৃপক্ষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে লুবিসের পিছনে এসে দাঁড়ালেন। লুবিস প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে জানালেন যে তিনি তাঁর আদেশ মানতে রাজি নন। তিনি তাঁর পদে থাকবেন, তবে কর্ণেল উতোয়োকে পদত্যাগ করতে হবে।

আবার বেসামরিক এবং সামরিক শক্তির মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দিল। ডক্টর আলি তাঁর মন্ত্রিসভা জিইয়ে রাখার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইলেন। সামরিক কর্তৃপক্ষ তাঁদের মুখপাত্র হিসেবে পদচ্যুত লুবিসকে মনোনীত করলেন। ডক্টর আলি এই বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য প্রতিরক্ষামন্ত্রী কুস্থমোস্থমন্ত্রী এবং সর্বাধ্যক্ষ উতোয়োকে পদচ্যুত করে লুবিসকে সর্বাধ্যক্ষ করতে সম্মত হলেন; কিন্তু লুবিস কোনও রকম আপোস-মীমাংসায় সম্মত হলেন না।

ডক্টর আলি শাস্ত্রমিজোয়া পদত্যাগ করলেন।

এই পরাজয় ডক্টর আলির, কুস্থমোস্থমন্ত্রী বা উতোয়োর নয়, এ পরাজয় স্থকর্ণের। স্থকর্ণের নির্দেশেই তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন। রাগে, ক্ষোভে স্থকর্ণ মক্কায় তীর্থ করতে গেলেন এবং ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ডক্টর হাত্তাকে বলে গেলেন নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যবস্থা করতে।

১২ই অগাস্ট মাসউমি নেতা হরাহাপ মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। মাসউমি, নাহদাতুল উলামা, সোস্যালিস্ট এবং সামরিক সমর্থনে তাঁর মন্ত্রিসভা টিঁকে রইল। ২৭শে অক্টোবর, ১৯৫৫ সনে তিনি নস্থশানকে মেজর জেনারেলে সম্মানিত করে স্থলবাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদে পুনর্বহাল করলেন। লুবিস হলেন তাঁর সহকারী।

সারাদেশে নানারকম অসৎ কার্যকলাপ চলছিল। দারুল ইসলামের

গেরিলা বাহিনীদের সঙ্গে লড়াইয়ে সেনাবাহিনী অস্ত্রশস্ত্রের জন্য সরকার থেকে কোনরকম অর্থসাহায্য লাভ করছিল না এবং এমন কি সৈন্যদের মাইনে বা খেতে দেওয়ার জন্য অর্থও তাদের হাতে ছিল না। অথচ রাজনৈতিকদলের হাতে প্রচুর অর্থ।

সামরিকবাহিনী এই ব্যাপারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিল। সুমাত্রা এবং সুলাওয়েসির সেনাধ্যক্ষরা সেই দেশের পণ্য চা, তামাক, রবার, লঙ্কা, কফি প্রভৃতি বিক্রী করে অর্থ সংগ্রহ করে সামরিকবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ করতেন। অ্যাটর্নি জেনারেল সুপার্তো সেনাধ্যক্ষদের এই কাজকে বে-আইনী ঘোষণা করলেন, কিন্তু সেনাধ্যক্ষরা তাঁদের কাজ আইনসঙ্গত বলে জানালেন।

আবার সামরিক ও বেসামরিক দলে বিরোধ দেখা দিল।

সুকর্ণ সেনাধ্যক্ষদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার জন্য এক চাল চাললেন।

পূর্ব ইন্দোনেশিয়ার সেনাপতি কর্ণেল জুপ ওয়ারুকে তিনি পেকিঙের দূতাবাসে মিলিটারী অ্যাটাসে নিযুক্ত করলেন। পশ্চিম যবদ্বীপের সেনাধ্যক্ষ কর্ণেল অ্যালেক্স কাওইলারাঙ্গকে ওয়াশিংটনে দূতাবাসের মিলিটারী অ্যাটাসে করলেন। কাওইলারাঙ্গের ১৫ই অগাস্ট যাত্রার দিন ছিল। ১৩ই অগাস্ট সুয়েজখাল বিরোধের মীমাংসার জন্য পররাষ্ট্র-মন্ত্রী রুসলান আবদুলগণি লণ্ডন যাত্রা করবেন। সহকারী সর্বাধ্যক্ষ লুবিসের আদেশে কাওইলারাঙ্গ আবদুলগণিকে বিমানবন্দরে গ্রেফতার করলেন। এই সংবাদ পেয়ে প্রধানমন্ত্রী হরাহাপ এবং সর্বাধ্যক্ষ নসুশান সঙ্গে সঙ্গে বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়ে আবদুলগণির মুক্তির ব্যবস্থা করে তাঁকে বিশেষ প্রহরায় লণ্ডনে পাঠিয়ে দিলেন।

নসুশান লুবিসকে পদচ্যুত করে কর্ণেল সুব্রতোকে সহকারী সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। ১৬ই নভেম্বর নসুশান লুবিসকে কৈফিয়ৎ দেবার জন্য ডেকে পাঠালেন ; কিন্তু লুবিস এলেন না, গা ঢাকা দিলেন।

আভ্যন্তরীন এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে ডক্টর হাত্তা ঘোষণা করলেন যে তিনি আর ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদ অলঙ্কৃত করে থাকবেন না। সুকর্ণের সঙ্গে মানিয়ে থাকতে পারেন নি সুতান শাহরির, পারলেন না ডক্টর হাত্তা।

ডক্টর আলির দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় আবার সুমাত্রার সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে সরকারের বিরোধ বাধল। ১৯৫৬ সনের ১৬ই ডিসেম্বর সুমাত্রার ৪৮ জন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী মিলিত হয়ে একটি ইস্তাহারে সামরিকবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষের প্রতিকার দাবী করলেন। জাকর্তায় মন্ত্রিসভা কোন উচ্চবাচ্য করল না। ২০শে ডিসেম্বর কর্ণেল আহমেদ হুসেন জানালেন যে তিনি মধ্য সুমাত্রার শাসনভার গ্রহণ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কর্ণেল সিম্বোলোন জানালেন যে উত্তর সুমাত্রার শাসনভার তিনি গ্রহণ করলেন। ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াতে পারে সুমাত্রার সামরিক কর্মচারীরা বুঝে উঠতে পারেন নি। সেই আটচল্লিশজন সামরিক কর্মচারীর মধ্যে সাতাশজন এই বিদ্রোহে যোগদান করতে অস্বীকার করলেন। সামরিকবাহিনী এই ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। সুকর্ণ সিম্বোলোনকে পদচ্যুত করলেন, কিন্তু সিম্বোলোন জানালেন যে তিনি সেই পদেই বহাল থাকবেন এবং প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ থেকে ডক্টর আলিকে সরিয়ে ডক্টর হাত্তাকে আনতে হবে।

সরকার এই ঔদ্ধত্যের জবাবে লেঃ কর্ণেল ইয়ামিন গিন্টিঙ্গকে সিম্বোলোনের স্থলাভিষিক্ত করে পাঠালেন। সমস্ত দেশ অন্তর্যুদ্ধের আশঙ্কায় রুদ্ধশ্বাস, কিন্তু সিম্বোলোন জানালেন যে তিনি অযথা রক্তপাত চান না। তিনি সুমাত্রার জঙ্গলে আত্মগোপন করলেন। কিন্তু সুমাত্রার সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধ মিটল না।

১৯৫৭ সনের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে স্থলবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল নসুশান এই বিরোধ মীমাংসার জন্য পালেমবাঙে সুমাত্রার সমস্ত সেনাধ্যক্ষদের এক অধিবেশন আহবান করলেন। এই অধিবেশনে বিদ্রোহী কর্ণেল আহমেদ হুসেন এবং কর্ণেল সিম্বোলোনও যোগ দিয়েছিলেন।

কিন্তু কোন সুষ্ঠু মীমাংসার পথ খুঁজে পাওয়া গেল না। সুমাত্রার সেনাধ্যক্ষগণ একযোগে ডক্টর আলি শাস্ত্রোমিজোয়োর পদত্যাগ দাবী করলেন এবং ডক্টর হাত্তাকে প্রধানমন্ত্রী করতে সুকর্ণকে অনুরোধ জানালেন। সুকর্ণ সেনাধ্যক্ষদের দাবীতে কর্ণপাত করলেন না; কিন্তু ডক্টর আলি এই গোলমালে বেশিদিন শাসনভার হাতে রাখতে পারলেন না। ১৪ই মার্চ তিনি পদত্যাগ করলেন।

সুকর্ণ কিন্তু ডক্টর হাত্তাকে প্রধানমন্ত্রী করতে সম্মত হলেন না। যে কেউ প্রধানমন্ত্রী হন না কেন, সুকর্ণই ছিলেন মুখ্য শাসক। কিন্তু ডক্টর হাত্তা নিজে শাসন না করে সুকর্ণের হাতে শাসনভার তুলে দেবেন না। ডক্টর হাত্তার ব্যক্তিত্বকে সুকর্ণ ভয় পেতেন। ডক্টর হাত্তাকে প্রধান-মন্ত্রিত্বের পদে আহ্বান না জানিয়ে তিনি ডক্টর জুয়ান্দাকে ৯ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী করলেন।

এই ব্যবস্থায় বিদ্রোহী সেনাধ্যক্ষরা খুশি হলেন না। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল।

১৯৫৭ সনের ৩০শে নভেম্বর জাকর্তার চিকিনি গ্রামার স্কুলে (এই স্কুলে সুকর্ণের ছেলে গুণ্টুর এবং মেয়ে মেঘাবতী পড়ত) একটি উৎসবে যোগদান করার জন্য সুকর্ণ সন্ধ্যাবেলায় এসেছিলেন। উৎসবের শেষে রাত প্রায় ন'টার সময় স্কুলবাড়ি থেকে বেরিয়ে সামনের মাঠে প্রতীক্ষারত লোকজনদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি রাস্তার ধারে তাঁর গাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছেন। প্রায় অর্ধেক পথ চলে আসার পর হঠাৎ একটা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়

একটা হাত-বোমা তাঁর আট ন' হাত দূরে ফাটল। তিনি এবং তাঁর দুই দেহরক্ষী সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে শুয়ে পড়লেন। পর মুহূর্তেই তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর এ-ডি-সি মেজর সুদার্তো তাঁকে পিছন দিক থেকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন এবং দু'জন দেহরক্ষী তাঁর দু'হাত ধরে টানতে টানতে ছুটে চলল। গাড়ির কাছাকাছি আসামাত্র তৃতীয় হাত-বোমা ফাটল। বোমার আঘাতে মোটর গাড়ির কাঁচ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। বোমার একটুকরো আঘাতে মেজর সুদার্তো আহত হলেন। চতুর্থ বোমায় একজন দেহরক্ষীর পা উড়ে গেল। সুকর্ণ প্রাণে বেঁচে গেলেন, কিন্তু হতাহত হল প্রায় একশ ষাট জন ছেলেমেয়ে ও লোকজন।*

সকলে এই ঘটনার জন্য দায়ী করল লুবিসকে, কিন্তু এই অভিযোগ লুবিস অস্বীকার করলেন।

কিন্তু কমিউনিস্টরা সামরিক বাহিনীকে হেয় করার এই সুযোগ হারাল না। সুকর্ণের স্নেহচ্ছায়ায় পি. কে. আই সুকর্ণের নিজের দল পি. এন. আই-এর চেয়েও বেশি ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল, তাদের ভয় ছিল শুধু সামরিকবাহিনীকে। এদের বিষদাঁত ভেঙে দিয়ে ক্ষমতা সঙ্কুচিত করতে পারলেই পি. কে. আই ইন্দোনেশিয়ায় সর্বেসর্বা হয়ে উঠবে। সুকর্ণকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে সমগ্র সামরিকবাহিনীকে যুক্ত করে তারা ইন্দোনেশিয়াময় আন্দোলন শুরু করল, আর সেই সঙ্গে চলল তাদের সুকর্ণকে খোসামোদ করা। রাজনৈতিক দল হিসেবে তাদের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ মাসউমি দলও তাদের অত্যাচার এবং ব্ল্যাক-মেইলের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারল না। সুকর্ণকে হত্যা করার

---

* সুকর্ণকে হত্যা করার আরও চারবার চেষ্টা হয়েছিল। ১৯৫৮ সনে ম্যাকাসারে মর্টার আক্রমণ, ১৯৬০ সনে প্রেসিডেণ্টের দুটি প্রাসাদে একসঙ্গে প্লেন থেকে সশস্ত্র আক্রমণ, ১৯৬২ সনের জানুয়ারি মাসে ম্যাকাসারে হাত-বোমা নিক্ষেপ এবং মে মাসে জাকর্তায় গুলি-বিনিময়ে তিনি আশ্চর্যভাবে রক্ষা পান।

ষড়যন্ত্রে তারা মাসউমিকেও দায়ী করল। পি. কে. আই-এর অত্যাচার সুকর্ণ চোখ বুজে দেখে গেলেন। মাসউমি দল-নেতা নাৎসির এবং ব্যাঙ্ক অব ইন্দোনেশিয়ার গভর্ণর শরিফুদ্দীন প্রবীরানেগারা পি. কে. আই কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে প্রাণভয়ে সুমাত্রায় পালিয়ে বিদ্রোহী দলে যোগ দিলেন। বিদ্রোহী দলের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন শরিফুদ্দীন। মাসউমি দলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হরাহাপও সুমাত্রায় পালিয়ে গিয়ে বিদ্রোহী দলে যোগ দিলেন। পেকিঙ ও ওয়াশিংটনের দূতাবাস থেকে কর্ণেল ওয়ারু এবং কর্ণেল কাওইলারাঙ্গ পদত্যাগ করে বিদ্রোহী দলে এসে মিশলেন।

কিন্তু তাঁরা যুদ্ধ ঘোষণা করলেন না। মারামারিও করলেন না তাঁরা, বৃথা রক্তপাতে ছিল তাঁদের অনীহা। তাঁরা আশা করেছিলেন যে জাকর্তায় কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের অভিযোগগুলি বিবেচনা করে একটি মীমংসার পথে আসবেন।

এই বিদ্রোহে মেজর জেনারেল নসুশান সামরিকবাহিনীর সংহতি রক্ষা করলেন আশ্চর্যভাবে। এই বিদ্রোহের ফলে সামরিক বাহিনীর অফিসারদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল। নসুশানের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী কেন্দ্রীয় সরকারের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে বিদ্রোহ দমনে মন দিল। বিদ্রোহের জন্য দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হল।

এই জরুরী অবস্থার আইন হাতে নিয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষ কমিউ-নিস্টদের অত্যাচার এবং অপপ্রচারের বিরুদ্ধে অভিযান চালাল। দেশে হরতাল নিষিদ্ধ হল, পথেঘাটে মিছিল রহিত হল, সংবাদ-পত্রকে আয়ত্তাধীনে আনা হল। এর পর ১৯৬০ সনের মাঝামাঝি পি. কে. আই-এর বিরুদ্ধে সরাসরি তারা রুখে দাঁড়াল। দলের মুখপত্র হারিয়ান রাকিয়াৎ-এর প্রকাশ বন্ধ করে দিল সামরিক কর্তৃপক্ষ, পি. কে. আই-এর নেতাদের কার্যকলাপের ওপর কড়া নজর রাখল এবং তাঁদের

ধরে দিনের পর দিন জিজ্ঞাসাবাদ করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। সামরিক কর্তৃপক্ষ পি. কে. আই দলের ষষ্ঠ কংগ্রেস নিষিদ্ধ করে দেওয়ায় আইদিত সদম্ভে ঘোষণা করলেন, কংগ্রেস বসবেই। সামরিক কর্তৃপক্ষ ও পি. কে. আই-এর মধ্যে সম্মুখ সংঘর্ষ দেখা দিল। মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন সুকর্ণ। তিনি জানালেন যে কংগ্রেস নিষিদ্ধ হবে না, পিছিয়ে দেওয়া হবে।

সুকর্ণের একমাত্র ভয় নসুশানকে। তাঁর বিনম্র স্বভাব, অটুট গাম্ভীর্য এবং আন্তরিক আনুগত্যে সুকর্ণ অস্বস্তি বোধ করতেন। স্বার্থপর সুবন্দ্রিয়ো নিজের আসন বজায় রাখার জন্য নসুশানের বিরুদ্ধে সুকর্ণকে উস্কানি দিতে শুরু করলেন। নসুশান সম্বন্ধে সুকর্ণের সন্দেহ হল, কিন্তু নসুশানকে বিশ্বাস করা ছাড়া তাঁর উপায়ও ছিল না। রাজনৈতিক কোন নেতাকেই তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন না। তাই ১৯৬১ সনে বিদেশ সফরে যাওয়ার সময় তিনি নসুশানের হাতেই দেশের শাসনভার ছেড়ে দিয়ে গেলেন। নসুশান আর যাই হোন, বিশ্বাসঘাতক ন'ন। ফিরে এসে সুকর্ণ বলেছিলেন : Nasution had no sense of opportunity and he can be relied upon to remain true.

সুকর্ণের অনুপস্থিতিতে নসুশান প্রথমেই বিদ্রোহী সেনানীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের আবার দলে ফিরিয়ে আনলেন। তাদের বিদ্রোহী বলে অভিযুক্ত করা হল না, তাদের ত্রুটি মার্জনা করা হল। সুকর্ণের যাবতীয় বক্তৃতা তাদের পড়িয়ে তাদের চিত্তশুদ্ধির ব্যবস্থা করা হল। সুকর্ণও খুশি হলেন, বিদ্রোহীরাও খুশি হল।

সামরিক কর্তৃপক্ষের এত ক্ষমতায় বিচলিত হয়ে উঠল পি. কে. আই। সুবন্দ্রিয়ো ও পি. কে. আই সুকর্ণকে জানালেন যে ডিসেম্বর মাসে সামরিকবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে ক্ষমতা দখল করবে। সুবন্দ্রিয়ো তখন পি. কে. আই-এর আনুকুল্যে সুকর্ণের চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা।

সুবন্দ্রিয়ো ছাড়া সুকর্ণ এক পা হাঁটতে পারেন না। রাত্রে ঘুম না হলে তিনি তাঁর "বন্দ্রিয়ো"কে ডেকে পাঠান। সারও পরে সুবন্দ্রিয়ো এসে হাজির হন এবং সুকর্ণের শয্যাপার্শ্বে বসে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুবন্দ্রিয়োর একমাত্র প্রতিপক্ষ তখন মেজর জেনারেল নসুশান। তাঁকে সরাতেই হবে। সেইজন্যই সামরিক বিদ্রোহের গুজব। সামরিকবাহিনীর দৃষ্টি অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুবন্দ্রিয়ো সুকর্ণকে ইরিয়ান বরাট দখলের মতলব দিলেন। পি. কে. আই নিল দেশ-জোড়া আন্দোলনের ভার। সারা দেশ ইরিয়ান বরাট আন্দোলনে মেতে উঠল।

ইরিয়ান বরাট অভিযান সফল করার অজুহাতে এবং নসুশানের ক্ষমতা হ্রাস করার জন্য সুবন্দ্রিয়োর পরামর্শে সুকর্ণ এক মোক্ষম চাল চাললেন। সেনাবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষের পদ থেকে সরিয়ে নসুশানকে তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। সামরিকবাহিনী থেকে মন্ত্রী নিয়োগ সুকর্ণের আমলে এই প্রথম।

প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাবু করার জন্য নসুশানকে লাথি মেরে ওপরতলায় নিয়ে যাওয়া হল।

ইন্দোনেশিয়ার হ্যামলেট হলেন নসুশান।

১৯১৮ সনের ৩রা ডিসেম্বর উত্তর সুমাত্রার তাপানুলি অঞ্চলের কোতোনোপাঙ্গে আবদুল হ্যারিস নসুশানের জন্ম। তাঁর পিতামাতা ছিলেন বাতক, শিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের। প্রথমে তিনি সুমাত্রায় একটি ওলন্দাজ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন এবং পরে জোগিয়াকর্তা উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়েন। বছর খানেক তিনি শিক্ষকতা করে ১৯৪০ সনে বান্দুং-এর রয়েল নেদারল্যাণ্ডস্ মিলিটারী

অ্যাকাডেমিতে যোগদান করেন। পরের বছর তিনি ওলন্দাজ বাহিনীতে সাব-লেফটেনাণ্ট হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৪২ সনে জাপানী অভিযানে তিনি জাপানীদের হাতে বন্দী এবং কারারুদ্ধ হন। কয়েক মাস পরে খালাস পেয়ে জাপানী প্রতিষ্ঠিত সামরিকবাহিনীর বারিসান পেলোপোর-এর নেতৃত্ব করেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের নব-লব্ধ স্বাধীনতা রক্ষার গুরুদায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। ১৯৪৫ সনে তিনি বান্দুং-এ প্রতিরক্ষাবাহিনী গড়ে তুলে প্রথমে মেজর এবং পরে লেঃ কর্ণেল হিসেবে সেই বাহিনীর অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৪৬ সনে তাঁকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করে সিলিওয়াঙ্গি বাহিনীর অধ্যক্ষ করা হয় এবং ওলন্দাজ বাহিনীকে ওই অঞ্চলে প্রতিহত করে রাখেন। ১৯৪৮ সনে ডক্টর হাত্তা যখন সামরিক-বাহিনীকে সুসংহত করেন তখন তাঁর পদমর্যাদা কমিয়ে তাঁকে লেঃ কর্ণেল করা হয়। অসুস্থ প্রধান সেনাপতি জেনারেল সুদিরমানের তিনি সহকারী হিসেবে তখন কাজ করেন।

ঠিক এই সময়েই এল মাদিউনে কমিউনিস্ট বিদ্রোহ। তিনি তখন জোগিয়াকর্তায়। কমিউনিস্ট-সমর্থক সেনাপতি বাহিনী মাদিউন অধিকার করার খবর জোগিয়াকর্তায় পৌঁছোনোমাত্র নসুশান সিলিওয়াঙ্গি বাহিনী নিয়ে মাদিউন আক্রমণ করে মাত্র বারো দিনের মধ্যে মাদিউন দখল করে কমিউনিস্ট বিদ্রোহ দমন করেন। ঠিক এই সময়ে ওলন্দাজরা আবার অভিযান শুরু করে। জেনারেল সুদিরমান তখন এত অসুস্থ যে তাঁকে ইনভ্যালিড চেয়ারে বসিয়ে সৈন্যবাহিনীর সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি নসুশানকে যবদ্বীপের সমগ্র সামরিক-বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ নিয়োগ করেন। এই যুদ্ধে নসুশান অপূর্ব রণ-কৌশল প্রদর্শন করেন এবং পূর্ব যবদ্বীপ থেকে পশ্চিম যবদ্বীপ পর্যন্ত তাঁর 'লঙ মার্চ' স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নসুশান হলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং জেনারেল ইয়ানি নিযুক্ত হলেন তাঁর স্থলে স্থলবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ।

সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি অত্যন্ত মনমরা হয়ে পড়লেন। স্বভাবতই নীরব, তিনি চেনাশোনা সকলকেই এড়িয়ে চলতে লাগলেন। ক্রমে প্রেসিডেন্ট এবং সেনা-বাহিনী—তুই দল থেকেই তিনি অনেকখানি সরে গেলেন। জেনারেল ইয়ানির সঙ্গেও তাঁর কথাবার্তা কমে গেল। যদিও জেনারেল ইয়ানি এবং অ্যাডমিরাল মারতাদিনাতা তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, কিন্তু তাঁরা নসুশানের এই স্বেচ্ছা-নির্বাসনে কিছু করতে পারলেন না। নসুশান মন্ত্রীসভাতেও বিশেষ যোগ দিতেন না। ফলে সুবন্দ্রিয়ো সুকর্ণের সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠলেন। সুবন্দ্রিয়ো পি. কে. আই-এর সাহায্যে নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং স্বেচ্ছাসেবকদলের মধ্যে নিজের প্রাধান্য জাহির করলেন এবং রেডিও ও সংবাদপত্র নিজের কুক্ষিগত করে নিলেন। তখন তিনি একাই যেন প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তথ্যমন্ত্রী।

সামরিকবাহিনীর ক্ষমতা দেশের অভ্যন্তরে কমতে শুরু করল এবং ধীরে ধীরে ক্ষমতার জাল বাড়াতে লাগল সুকর্ণের বিরুদ্ধবাদী আর একটি দল—পি. কে. আই। সুকর্ণের সুহৃদ বেশে তাদের অনুপ্রবেশ, সুকর্ণের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তাদের আত্মপ্রকাশ।

দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বৃহৎ রাজনৈতিক দল—পি. কে. আই।

১৫

পি. কে. আই বা ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি।

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের দুই হাত, দুই ভরসার—পি. কে. আই ও সামরিক বাহিনী—অন্যতম। মুখে এ কথা স্বীকার করেন সুকর্ণ, অন্তরে নয় এবং দুই দলই মুখে সুকর্ণকে সর্বাধ্যক্ষ এবং ইন্দোনেশিয়ার একমাত্র নেতা বলে স্বীকার করে, কিন্তু অন্তরে নয়। সুকর্ণ জানেন এই দুই দলের সংগঠনী শক্তি, জানেন এই দুই দলের নিয়মানুবর্তিতা, জানেন এই দুই দলের প্রকৃত উদ্দেশ্য ; কিন্তু সব জেনে শুনেও সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস রাখেন সুকর্ণ নিজের জনপ্রিয়তা, নিজের কূটনীতি এবং এই দুই দলের ক্রমবর্ধমান বৈরীভাবের ওপর। একটি দলকে অপর দলের বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে খেলিয়ে তাঁর দুই সাধারণ শত্রুকে হীনবল করে তাদের ওপর প্রভুত্ব করার স্বপ্ন তিনি দেখে আসছিলেন।

সামরিকবাহিনীও নির্বোধ নয়, পি. কে. আই তো নয়ই। দু'দলই শুধু নিজেদের সুযোগের প্রত্যাশায় দিন গুনে যাচ্ছে। 'জাপানী কুইসলিং', 'ইম্পিরিয়্যালিস্ট' বলে যে সুকর্ণকে একদিন পি. কে. আই অভিহিত করত, সেই সুকর্ণের শুধু যে তারা উগ্র সমর্থক হয়ে দাঁড়াল তা নয়, তাঁর মন্ত্রীসভাতে যোগ দিয়ে তাঁর আদেশমতো সমস্ত কাজ ও অকাজ নির্বিচারে করে সুকর্ণের মনোরঞ্জন করে যেত।

সুকর্ণ বলতেন, কমিউনিস্টদের শাসনে রাখতে হলে তাদের নেতৃত্ব করা চাই ; কিন্তু কে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন—সুকর্ণ, না আইদিত—ইতিহাস তার সাক্ষী দেবে।

চীনের পরই এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এই পি. কে. আই—

ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি। অতি বিচিত্র তার ইতিহাস। গণতান্ত্রিক পথে নয়, জোর করে ক্ষমতা হস্তগত করার বারবার দুশ্চেষ্টা তাদের ব্যর্থ হলেও তাদের শিক্ষা হয় নি এবং শেষ শিক্ষালাভ যা করল তাতে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তার জন্য দায়ী তারাই, তাদের অবিবেচক নেতৃবৃন্দ।

ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত বলা চলে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ থেকে। এই বছরে আমস্টারডামে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিশ আর্বেইডার্সপার্টি (এ. এস. ডি. পি) বা সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক ওয়ার্কার্স পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। হল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত এই দলের লক্ষ্য ছিল বিশেষভাবে ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ কার্যকলাপের ওপর। ইন্দোনেশিয়ার যে যে অঞ্চল পূর্বে ওলন্দাজ সরকারের অধীনে আসে নি, সেইসব অঞ্চলে সামরিক শক্তির সাহায্যে ওলন্দাজ অধিকারের বিরুদ্ধে ছিল তাদের আন্দোলন। ১৯০১ সনে তারা একটি প্রস্তাবে জানায় যে ইন্দোনেশীয় জনগণকে অবিলম্বে এমনভাবে শিক্ষিত এবং পরিচালিত করতে হবে যাতে তারা শীঘ্রই স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য হয়ে ওঠে। ওলন্দাজ সংবাদপত্র এবং এস. ডি. এ. পি.র সভ্য ইন্দোনেশিয়ায় কর্মরত কয়েকজন ওলন্দাজের কাছ থেকে এই দলের কার্যকলাপ সম্বন্ধে প্রথমে ইন্দোনেশীয়রা অবহিত হয়।

ইন্দোনেশিয়ায় স্বাধীনতা-আন্দোলন শুরু হয়েছিল ভারতবর্ষে কংগ্রেসের স্বাধীনতা-আন্দোলনের পথ ধরে। ন্যাশানাল ইণ্ডিশ পার্টি ছিল এই স্বাধীনতা-আন্দোলনের পুরোধা। এই আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে ওলন্দাজরা জনপ্রিয় ইন্দোনেশীয় নেতা ডক্টর চিপ্তো মাঙ্গুনকুসুমা এবং সুওয়ার্দি সূর্যনিঙ্গরাতকে (কী হাজার দেওয়নতরো নামেই বিখ্যাত) কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু পরে এঁদের দুজনকেই দেশ ছেড়ে হল্যাণ্ডে

গিয়ে বসবাস করার অনুমতি তারা দেয়। ইন্দোনেশীয়দের মধ্যে এই দুই নেতাই প্রথম এস. ডি. এ. পি-র সভ্য হন।

সমাজবাদের সঙ্গে ইন্দোনেশীয় রাজনীতি পূর্বে পরিচিত হলেও ইন্দোনেশীয় সমাজবাদ প্রথম শিকড় গাড়তে সক্ষম হয় ১৯১৪ সনে। এস. ডি. এ. পি দলে ভাঙন দেখা দেয় এবং তরুণ দল সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিশ পার্টি (এস. ডি. পি) প্রতিষ্ঠা করে। এই দলের অন্যতম নেতা ছিলেন এইচ. জে. এফ. এম স্নীভিয়েল্ট। তিনি কয়েকজন সমাজবাদী কর্মী নিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় ইণ্ডিশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিশ ভেরিনিগিঙ্গ বা ইণ্ডিজ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। হল্যাণ্ডে এই এস. ডি. পি-ই ছিল কমিউনিস্টদলের পূর্বসূরী। কয়েক বছর পরেই এস. ডি. পি. কমিউনিস্ট পার্টি অব হল্যাণ্ড নাম গ্রহণ করে এবং ১৯৩০ সনে নাম পরিবর্তন করে রাখে কমিউনিস্ট পার্টি অব দি নেদারল্যাণ্ডস্।

স্নীভিয়েল্টের নব-প্রতিষ্ঠিত দলে পূর্ব-নিষিদ্ধ ন্যাশানাল ইণ্ডিশ্ পার্টির কয়েকজন সভ্য যোগ দেন। এই দলই কিছুদিন পরে নাম গ্রহণ করে পেরসেরিকাতান কমুনিস ডি ইণ্ডিয়া বা ইন্দোনেশিয়ান কমিউনিস্ট ইউনিয়ন। বছর চারেক পরে ১৯২০ সনের মে মাসে এই দলের নাম পরিবর্তিত করে রাখা হয় পার্তাই কোমুনিস ইন্দোনেশিয়া বা পি. কে. আই। এই নতুন দল সংগঠনে ছিলেন তান মালাকা, শুক্রো, আলিমিন, দর্শনো, মুসো, সরজোনো এবং সেমোন। রাশিয়ার কমিউনিস্ট বিপ্লবের তখন শৈশব মাত্র, সুতরাং রাশিয়া তখন এই দলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারে নি।

ইন্দোনেশিয়ায় তখন সারেকৎ ইসলামেরই একমাত্র প্রবল জনপ্রিয়তা। কমিউনিস্ট ইউনিয়ন বা পি. কে. আই জনসাধারণের কাছ থেকে বিশেষ সমর্থন লাভ করতে পারে নি। সুতরাং জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য তারা সারেকৎ ইসলাম দলে যোগ দিল। এই দল থেকে সভ্য ভাঙিয়ে

তারা ১৯২৩ সনে তাদের সভ্যসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজারে দাঁ'ড় করিয়েছিল এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অনেকাংশই তারা দখলে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এমন কি শ্রমিক সংখ্যা বাড়িয়ে জোর করে তারা সারেকৎ ইসলামের কয়েকটি জেলা কমিটির ক্ষমতা অধিকার করে নিয়েছিল। কিন্তু এই অধিকার ছিল নিরর্থক, কারণ চাষী-সম্প্রদায় সঙ্গে সঙ্গে এই দল ত্যাগ করে অন্য দলে যোগ দিতে শুরু করেছিল।

তাছাড়া ইন্দোনেশিয়ায় পি. কে. আই-এর জনপ্রিয়তা হারানোর আর একটা বড় কারণও ছিল। সাধারণত ইন্দোনেশীয়রা পরের ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না, কিন্তু নিজেরা ধার্মিক। তারা পি. কে. আই-এর ধর্ম-সম্বন্ধে নীতি সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দিহান হয়ে উঠেছিল। চোক্রোয়ামিনোতো ও আগুস সেলিম পরিচালিত সারেকৎ ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পি. কে. আই-এর মতো বিদেশী শাসন এবং ক্যাপিট্যালিজ্‌মকেই দেশের সবচেয়ে বড় শত্রু বলে মনে করত, কিন্তু এই তুই দলের মধ্যে রেষারেষি ছিল বরাবর। পি. কে. আই-কে অপদস্থ করার জন্য সারেকৎ ইসলাম তাদের নাস্তিক বলে প্রচার করত। সাধারণ ধর্মভীরু নাগরিক নাস্তিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে লাগল। সারেকৎ ইসলামে অনুপ্রবেশ করেও তাই পি. কে. আই-এর বিশেষ লাভ হল না। তাদের ধর্ম-নীতি তাদের কোনদিন জনসাধারণের হৃদয় অধিকার করতে দেয় নি।

এই সমস্যাটাকে সমাধানের জন্য তাদের নেতৃত্ব বিভিন্ন পথ গ্রহণ করত :

প্রথমত, তারা জোর গলায় ধর্মকে অস্বীকার করত।

দ্বিতীয়ত, যখন ধর্ম নিয়ে হৈ-চৈ করে সারেকৎ ইসলাম তাদের বিতাড়িত করার উপক্রম করল, তখন তারা ধর্ম সম্বন্ধে নির্দলীয় হওয়ার চেষ্টা করল।

তৃতীয়ত, দলীয় স্বার্থের জন্য তারা ধর্মকে প্রয়োগ করত।

১৯২২ সনে চতুর্থ কমিণ্টার্নের সময়েই রাশিয়া প্রথম ইন্দোনেশিয়ার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশ পায়। চতুর্থ কমিণ্টার্ন তান মালাকাকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় কমিণ্টার্নের এজেন্ট নিযুক্ত করে। এই কমিণ্টার্ন কংগ্রেসে তান মালাকা তাঁর ভাষণে বলেন ঃ

> The people believe in our propaganda. They are with us "with their stomachs" but with their hearts they remain with Sarekat Islam—with their heaven which we cannot give them. Therfore they boycotted our meetings and we could not carry on propaganda any longer.

পি. কে. আই-এর নাস্তিকতা ইন্দোনেশিয়ার অনেক অঞ্চলে জনসাধারণকে তাদের প্রতি ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। পি. কে. আইকে শায়েস্তা করার জন্য ধর্মনেতারা সারেকৎ রাকিয়াৎ বা সবুজ সঙ্ঘ নামে একটি নতুন দল গঠন করে। এই দল কমিউনিস্টদের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তাড়া করে বেড়াত এবং অনেক ক্ষেত্রে সশস্ত্র সংঘর্ষেও লিপ্ত হত।

জনসাধারণের সমর্থন লাভে অসমর্থ হয়ে পি. কে. আই এবার 'লাল' সারেকৎ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করল। ১৯২১ সনে এই 'লাল' সারেকৎ ইসলাম-এর শাখাগুলিকে একত্র করে গঠিত হল সারেকৎ রাকিয়াৎ নামে একটি নতুন দল। এই দলে কাজ করার পরই সভ্যরা পি. কে. আই-এর সভ্যপদে উন্নীত হতে পারত। কিন্তু ১৯২৪ সনে পি. কে. আই এই দলকে বন্ধ করে দেয়। ফলে চাষী-সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তারা দূরে সরে গিয়ে তাদের ক্ষেত্র শুধু শ্রমিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখল।

সেই বছর ষষ্ঠ কমিণ্টার্ন কংগ্রেসে সেমোন জানিয়েছিলেন যে পি. কে.

আই-এর সভ্য-সংখ্যা নয় হাজার যেখানে সারেকৎ ইসলামের সভ্য-সংখ্যা এক লাখেরও ওপর।

দেশের চাষী-সম্প্রদায়ের সক্রিয় সহযোগিতা হারিয়েও শ্রমিক সংগঠনের কিছুটা অংশে প্রবেশ করে নিজেদের শক্তি বাঁচিয়ে রাখতে পি. কে. আই পেরেছিল। ১৯১৯ সনে সারেকৎ ইসলাম ইন্দোনেশিয়ার বাইশটি ট্রেড ইউনিয়নকে একত্র করতে সক্ষম হয়। এই ইউনিয়নগুলির সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় সাতাত্তর হাজার। পি. কে. আই সারেকৎ ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এই ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে হস্তগত করার চেষ্টা করল। ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠন করে সেমোন নিজে তার চেয়ারম্যান হয়ে এই ট্রেড ইউনিয়নগুলির ওপর দাবী জানালেন। সারেকৎ ইসলাম পি. কে. আই-এর এই চাল বানচাল করে দিল। পি. কে. আই তখন এর মধ্য থেকে ছোটখাটো চোদ্দটি ইউনিয়ন নিয়ে আর এক ফেডারেশন গঠন করলেন।

ইতিমধ্যে শ্রমিকদের ভেতরে অসন্তোষ সৃষ্টি করার অপরাধে ওলন্দাজ সরকার তান মালাকা এবং সেমোনকে ইন্দোনেশিয়া থেকে নির্বাসিত করেছিল। শক্তিশালী নেতৃত্বের অভাবে পি. কে. আই-এর কার্যকলাপ দলের পক্ষেই ক্ষতিকর হয়ে উঠতে লাগল। ইন্দোনেশিয়াতে তারা সোভিয়েত রাশিয়ার মতো এক সোভিয়েত সরকার প্রবর্তনের জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠল।

এই ব্যাপারে ১৯২৫ সনের অগাস্ট মাসে স্ট্যালিন বলেছিলেন :

> The Communists in Java, who recently erroneously put forward the slogan of Soviet Government in the country, suffer, it seems, from a deviation, which threatens to isolate the Communist Party from the masses and transform into a sect.

কিন্তু পি. কে. আই কারুর উপদেশ শোনবার পাত্র নয়। চোদ্দটা

ইউনিয়নের কর্তৃত্ব লাভ করে নিজেদের ক্ষমতায় তারা এত বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল যে তারা সারা ইন্দোনেশিয়ায় সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করল। জনসাধারণ তো এই ধর্মঘট উপেক্ষা করলই, সাধারণ শ্রমিকরাও এই ধর্মঘটের বিরুদ্ধাচরণ করল। ফলে ধর্মঘট একেবারে ব্যর্থ হল। ইউনিয়নগুলির ফেডারেশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান দর্শনোকে ওলন্দাজ সরকার এই চক্রান্তে অভিযুক্ত করে গ্রেফতার করে নির্বাসিত করল। আলিমিন, মুসো এবং সরজনো গ্রেফতারের ভয়ে সিঙ্গাপুরে পালিয়ে গেলেন।

মাসখানেক আত্মগোপন করার পরে আবার গোপনে তাঁরা যবদ্বীপে ফিরে এলেন। ১৯২৫ সনের অক্টোবর মাসে প্রাম্বানানে পি. কে. আই-এর কার্যকরী সমিতির সভায় পরবৎসর জুন মাসে দেশে বিদ্রোহ ঘোষণার প্রস্তাব তারা গ্রহণ করল। নির্বাসিত অবস্থায় ম্যানিলাতে থাকার সময় তান মালাকা এই সংবাদ জানতে পেরে এই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে তাঁর অভিমত লিখে জানালেন। তিনি জানালেন যে দলের প্রতি জনসাধারণের সমর্থন না থাকাতে এই বিদ্রোহ শুধু যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে তা নয়, দলের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। আর তাছাড়া যে অভিযানে সাফল্যের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত, সেই অভিযানে রাশিয়া কোনরকম সাহায্য করতে অগ্রসর হবে না।

কিন্তু শুক্রা, আলিমিন এবং মুসোর ধারণা ছিল যে বিদ্রোহ সফল হবেই; তান মালাকার আপত্তির কারণ এই যে এই বিদ্রোহ তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে না। সুতরাং তাঁরা কার্যকরী সমিতির কাছ থেকে তান মালাকার চিঠি এবং অভিমত গোপন রেখে প্রস্তাবটি পাশ করালেন।

তাঁর অভিমত সকলের কাছে গোপন রেখে এই প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে—এই খবর পেয়ে তান মালাকা ম্যানিলা থেকে পি. কে. আই-এর প্রতিটি শাখা কার্যালয়ে তাঁর নিজের অভিমত লিখে জানালেন।

তান মালাকার মতো বিশিষ্ট ও অভিজ্ঞ নেতার আপত্তিতে দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলতা দেখা গেল। যবদ্বীপ এবং সুমাত্রার অনেকগুলি পি. কে. আই শাখা এই বিদ্রোহে যোগদান করতে অস্বীকৃত হল। বিদ্রোহের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে আলিমিন সিঙ্গাপুরে ফিরে গেলেন। সেখানে ব্রিটিশদের কাছে আলিমিন ধরা পড়লেন। তাঁকে চীনে নির্বাসিত করা হল। শুক্রা এবং মুসো তবুও ক্ষান্ত হলেন না। তাঁরা এই বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

১৯২৬ সনের ১৩ই নভেম্বরে পি. কে. আই-পরিকল্পিত ইন্দোনেশিয়ায় প্রথম বিদ্রোহ ঘোষিত হল। রাত দুপুরে দু'শ জন সশস্ত্র লোক বাতাভিয়ার টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ অফিস দখল করল। যবদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে বান্টামের এবং মধ্য যবদ্বীপেরও কয়েকটি সরকারী অফিস বিদ্রোহীরা অধিকার করে নিল এবং কয়েকক্ষেত্রে সংঘর্ষে দু' পক্ষেরই কিছু লোক হতাহত হল।

কিন্তু এই বিদ্রোহ সফল হতে পারে না এবং সফল হলও না। জনসাধারণ এই বিদ্রোহে শুধু যে যোগ দেয় নি তা নয়, তারা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইও করেছে। পি. কে. আই-এর ওপর জনসাধারণের এতটুকু শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি তখন ছিল না। ফলে এক সপ্তাহের মধ্যেই এই বিদ্রোহ নির্মম হাতে ওলন্দাজ সরকার দমন করতে সক্ষম হয়েছিল। নয়জন নেতা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন, হাজার লোককে অন্তরীণ করা হল, আটশ' তেইশজনকে নিউগিনির বোভেন দিগুল-এ নির্বাসিত করা হল।

বিদ্রোহ ব্যর্থ হতেই শুক্রা এবং মুসো দেশ ছেড়ে পালালেন। বিদ্রোহের অসাফল্যের জন্য সমস্ত দোষ তাঁরা তান মালাকার ঘাড়ে চাপিয়ে দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু পি. কে. আই তখনও আশা ছাড়ে নি। ১৯২৭ সনের জানুয়ারি মাসে সুমাত্রাতে আবার তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করল, কিন্তু সে বিদ্রোহ খুব অল্পদিনেই শেষ হয়।
সঙ্গে সঙ্গে ওলন্দাজ সরকার পি. কে. আইকে বে-আইনী ঘোষণা করে।

আট বছর পরে ১৯৩৫ সনে মুসো ইন্দোনেশিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন। সকলেরই ধারণা ছিল যে ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে গ্রেফতার করবে, কিন্তু কিছুই হল না। জাপান তখন অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে শক্তি সঞ্চয় করছিল এবং প্রশান্ত মহাসাগরে একচ্ছত্র কর্তৃত্বের জন্য সর্বরকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। জাপানের এই সামরিক শক্তির অভ্যুত্থানে ওলন্দাজরা অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। জাপান যদি ইন্দোনেশিয়ার দিকে তার আগ্রাসী থাবা বাড়ায় তবে তাকে প্রতিহত করার জন্য ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করতে বসল, কিন্তু জাতীয়তাবাদী কোন দলই ওলন্দাজদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সম্মত হল না। মুসো ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষকে একটি প্রস্তাব দিলেন। ওলন্দাজ সরকার যদি পি. কে. আই-এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় তো পি. কে. আই ওলন্দাজদের সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।
ওলন্দাজ সরকারের আনুকুল্যে পি. কে. আই নবজন্ম গ্রহণ করল।
নেদারল্যাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টি এই সময়ে ঘোষণা করল যে ইন্দোনেশিয়াকে বর্তমানে স্বাধীনতা দেওয়া তারা নীতিগতভাবে সমর্থন করে না। যে পি. কে. আই জোর করে শাসন-ক্ষমতা অধিকারের জন্য বিদ্রোহ করেছিল, সেই পি. কে. আই সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ ঘোষণা করল। কমিউনিস্টদের ডিগবাজিতে স্বাধীনতাকামী জনসাধারণ

একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং তাদের মতলব সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দিহান হয়ে উঠল। কিন্তু পি. কে. আই এখন চায় প্রতিষ্ঠা, একবার ভাল করে দাঁড়াবার সুযোগ। তাই ওলন্দাজ সরকারকে তাদের ধ্রুবতারা বলে মেনে নিতে বাধে নি। ওলন্দাজ সরকারের সাহায্যেই পি. কে. আই গেরাকান রাকিয়াত ইন্দোনেশিয়া বা ইন্দোনেশীয় গণ-আন্দোলনে অনুপ্রবেশ করল এবং আমির শরিফুদ্দীন, সরজোনো এবং মহম্মদ ইয়ামিন তার কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান নামামাত্র ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক চিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হল। কমিউনিস্ট দল ঘোষণা করল—জাপানীকে রুখতে হবে, অ-কমিউনিস্ট দল বলল—ওলন্দাজ, জাপানী যে কোন বিদেশী শাসন তাড়াতে হবে।

ইন্দোনেশিয়ায় জাপানী আক্রমণের সময় পি. কে. আই-এর সদস্যরা আত্মগোপন করে ওলন্দাজদের প্রদত্ত অর্থে জাপানীদের সঙ্গে গেরিলা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। অ-কমিউনিস্ট গেরিলারা শাহরিরের নেতৃত্ব গ্রহণ করল। তারা জাপানীদের সঙ্গে সঙ্গে ওলন্দাজদেরও অতিষ্ঠ করে তুলতে লাগল। ওলন্দাজরা বোভেন দিগুল থেকে সরজোনো সমেত প্রায় পাঁচশ' কমিউনিস্টকে মুক্তি দিয়ে জাপানীদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরের কাজে নিযুক্ত করল। এত সব সত্ত্বেও জাপানী অভিযান ব্যাহত করা গেল না। তারা দিন দিন অগ্রসর হয়ে আসতে লাগল।

জাপানের এরকম দ্রুত অগ্রগতিতে শঙ্কিত হয়ে কমিউনিস্টরা তখন ওলন্দাজ এবং জাপানী—কাউকেই চটাতে সাহস করল না। চাকা কখন কোন্ দিকে ঘোরে, কে বলতে পারে? তান মালাকা পি. কে. আই-এর এক অংশ নিয়ে জাপানীদের সঙ্গে হাত মেলালেন। জাতীয়তাবাদী দলগুলিকে একত্রিত করে জাপানের সঙ্গে সহযোগিতার

ব্যবস্থা করাই ছিল তাঁর কাজ। ইয়ামিনের নেতৃত্বে অপর দল জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে লাগল।

১৯৪৫ সনে জাপানের পরাজয়ের পরে সুকর্ণ-হাত্তা-শাহরিরি ইন্দো-নেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন এবং তাঁরাই দেশের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করলেন। পি. কে. আই ক্ষমতা হস্তগত করতে না পেরে এই সন্ত-স্বাধীনতা-লব্ধ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করতে প্রবৃত্ত হল। ইন্দো-নেশিয়ার স্বাধীন সরকারকে তারা 'বুর্জোয়া' সরকার বলে অভিহিত করল এবং জাপানী-দালাল সুকর্ণ-হাত্তা-শাহরিরের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার সঙ্কল্প গ্রহণ করল।

এই সময় তান মালাকা এক নতুন চাল চাললেন। সুকর্ণ এবং হাত্তার জাল-করা সই সমেত একটি চুক্তি-পত্র নিয়ে তিনি শাহরিরের কাছে উপস্থিত হলেন। শাহরির তখনও নব-প্রতিষ্ঠিত সরকারে যোগদান করেন নি। সেই চুক্তিপত্রে লেখা ছিল যে সুকর্ণ এবং হাত্তার মৃত্যু যদি হয় তবে সরকার গঠনের দায়িত্ব তাঁরা দুজনে তান মালাকাকে দিচ্ছেন। সেই সঙ্গে তান মালাকা হাত্তা এবং সুকর্ণকে ব্রিটিশেরা হত্যা করেছে বলে গুজবও ছড়িয়ে বেড়াতে লাগলেন।

শাহরিরের সন্দেহ হল। সুকর্ণ এবং হাত্তা তান মালাকার সঙ্গে কোন চুক্তি করতে পারেন বলে তাঁর বিশ্বাস হল না। চিন্তা করে দেখার জন্য সময় নিয়ে তিনি সুকর্ণ এবং হাত্তার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তাঁরা দুজনেই এই চুক্তি অস্বীকার করলেন। তান মালাকা সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-গোপন করে রইলেন।

এই সময় বিদেশ থেকে ইউসুফ দেশে ফিরে এসে পি. কে. আই পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন ; কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অন্তর্ঘাতী কাজে এবং ব্যাপক সন্ত্রাসে নতুন রাষ্ট্রকে বিপর্যস্ত করে শাসনক্ষমতা অধিকার করা। কয়েকদিনের মধ্যেই সুকর্ণ তাঁকে গ্রেফতার করে কারারুদ্ধের আদেশ দিলেন।

এবারে অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন সরজোনো। তিনি আবার নতুন করে পি. কে. আই গঠনে মন দিলেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন মস্কো-ফেরৎ আলিমিন। এই দুইজনের উৎসাহে এবং অক্লান্ত চেষ্টায় পি. কে. আই আবার দেশের শক্ত মাটিতে আশ্রয় লাভ করল।

কিন্তু কমিউনিস্ট এবং নতুন গণতান্ত্রিক সরকারের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল না কোনদিন। নতুন সরকারকে প্রতিনিয়ত বিপদ্‌গ্রস্ত করার ছিল তাদের প্রচেষ্টা। ফলে দেশকে যে স্বাধীনতা হারাতে হতে পারে—একথা তারা জানত; কিন্তু স্বার্থান্ধ ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দল নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না—কোনও দিন না।

১৯৪৫ সনের ২৩শে নভেম্বর ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী বেভিন ওলন্দাজ এবং ইন্দোনেশীয়দের আলোচনায় বসে ইন্দোনেশিয়ার ভবিষ্যৎ শান্তিপূর্ণ উপায়ে নির্ধারণ করতে অনুরোধ জানালেন। ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে কোনরকম আলোচনায় বসতে ওলন্দাজদের ছিল ঘোরতর অনিচ্ছা। অনেক ইন্দোনেশীয় নেতাও ওলন্দাজের সঙ্গে কোনরকম আলোচনা করতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

এই পরিস্থিতিতে তান মালাকা শাসন-ক্ষমতা অধিকারের আর এক মতলব করেন। শাহরির তখন প্রধানমন্ত্রী। শাহরির-বিরোধী সমস্ত দল নিয়ে তিনি পের্সাতুয়ান পের্জুয়াঙ্গান বা ন্যাশানাল ফ্রন্ট নামে একটা প্রকাণ্ড দল গঠন করলেন। এই ফ্রন্টের লক্ষ্য হল : সমস্ত রাজনৈতিক দলের বিলোপ সাধন, বিদেশী সম্পত্তি ও ব্যবসায় বিনা ক্ষতিপূরণে অধিকার এবং ওলন্দাজদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় অস্বীকৃতি। এই ফ্রন্টের অন্যতম সমর্থক ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার সামরিকবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল সুদিরমান। কিন্তু এই ফ্রন্টের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শাহরিরকে প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে অপসারণ।

সুকর্ণ-হাত্তা-শাহরিরের বিরুদ্ধে এই ফ্রন্টের আন্দোলন ক্রমেই তীব্র

আকার ধারণ করতে লাগল। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের কাছে শাহরিরকে প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে অপসারিত করার জন্য ফ্রন্ট আবেদন জানাল।

কূটবুদ্ধিতে সুকর্ণের কাছে তান মালাকা অত্যন্ত শিশু। এই যুক্তফ্রন্ট প্রকৃতপক্ষে যুক্ত নয়, তা তিনি ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলেন। শাহরিরকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে তাড়ানোর ব্যাপারে সমস্ত দলই একত্র হবে, কিন্তু পরমুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীর পদের জন্য নিজেদের মধ্যে তারা মারামারি করে মরবে। তান মালাকার উদ্দেশ্য প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করা, কিন্তু সামরিকবাহিনী বিবেকহীন তান মালাকাকে সুকর্ণের পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট পদে দেখতে সম্মত ছিল না। মার্ক্সবাদ-বিরুদ্ধ মুসলমান সম্প্রদায় মার্ক্সবাদী তান মালাকাকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করত। রাজনৈতিক দলগুলি দেখল যে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। ক্ষমতালোভী রাজনীতিকরা বুঝতে পারলেন যে তান মালাকা একবার ক্ষমতা হস্তগত করতে পারলে তাঁদের নিশ্চিহ্ন করে দেবেন।

অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে সুকর্ণ ফ্রন্টের সঙ্গে মোকাবিলা করলেন। ফ্রন্টের দাবী মেনে নিয়ে তিনি শাহরিরের মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলেন এবং ফ্রন্টকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে অনুরোধ করলেন। এবারে ফ্রন্ট বিপদে পড়ল। প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীর পদ নিয়ে প্রতিটি দলের মধ্যে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা, দলাদলি এবং মারামারি হতে লাগল। তান মালাকাকে কেউ প্রধানমন্ত্রী করতে স্বীকৃত হল না। ফ্রন্ট সর্বস্বীকৃত মন্ত্রিসভার তালিকা দিতে পারল না। তখন সুকর্ণ আবার শাহরিরকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে অনুরোধ করলেন।

ফ্রন্ট নিজে মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারল না, কিন্তু শাহরিরের মন্ত্রিসভা গঠনেও খুশি হতে পারল না। শাহরিরের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কার্যক্রম স্থির করার জন্য মাদিউনে তারা একটি সভা আহ্বান করল। সভার কর্মসূচীর অন্যতম হল এই সরকারকে সশস্ত্র বিপ্লবে অপসারিত করা।

এই সংবাদ পাওয়ামাত্র ১৯৪৬ সনের* ১৭ই মার্চ সরকারী বাহিনী তান মালাকা, চইরুল স্নালে, সুকর্ণী এবং মহম্মদ ইয়ামিনকে কারারুদ্ধ করল।

কিন্তু ফ্রন্ট শাহরিরকে অপসারিত করার প্রচেষ্টায় বিরত হল না। শাহরিরকে পদচ্যুত করে তান মালাকাকে স্থলাভিষিক্ত করার জন্য আর এক ষড়যন্ত্র হল। এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক হলেন জেনারেল সুদিরমান—ফ্রন্টের অন্যতম সমর্থক। তিনি জানতেন যে ২৭শে জুন জোগিয়াকর্তায় যাবার পথে রাত্রে শাহরির সুরাকর্তায় আসেন। সেই দিন তিনি মেজর জেনারেল সুদর্শনোকে আদেশ দিলেন যে সৈন্যসামন্ত নিয়ে সুরাকর্তার কারাগার থেকে জোর করে তান মালাকা এবং তাঁর অন্যান্য সঙ্গীদের মুক্তি দিতে।

শাহরির এই ঘটনা জানতেন না। তিনি রাত্রে সুরাকর্তায় আসামাত্র মেজর ইউসুফ তাঁকে বন্দী করে জানালেন যে শাহরিরকে হত্যা করার আদেশ তাঁকে দেওয়া হয়েছে ; কিন্তু শাহরির তাঁর ভূতপূর্ব শিক্ষক বলে তাঁকে হত্যা না করে তিনি তাঁকে সুরাকর্তার রাজপ্রাসাদে বন্দী করে রাখবেন। সুরাকর্তা ফ্রন্ট-পন্থী সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বাধীনে এল। মেজর জেনারেল সুদর্শনো জোগিয়াকর্তা শহর অধিকার করলেন।

শাহরিরের অপহরণের সংবাদ পেয়ে সুকর্ণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। বেতার এবং সংবাদপত্র মারফৎ তিনি জনসাধারণের কাছে আবেদন জানালেন যে তারা যেন শাহরিরের খোঁজ পেলেই তাঁকে জানান। সুরাকর্তার রাজপ্রাসাদে শাহরিরের অবস্থানের কথা জানাজানি হওয়ামাত্র গণতন্ত্র সরকারানুগত এক সৈন্যবাহিনী সুরাবায়া থেকে মার্চ করে সুরাকর্তাতে এসে উপস্থিত হল এবং বিদ্রোহী সৈন্যদের পরাভূত করে শাহরিরকে উদ্ধার করল। এদিকে নসুশান তাঁর সিলিওয়াঙ্গি সেনাবাহিনী নিয়ে জোগিয়াকর্তা অধিকার করলেন।

দেশের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল।

২রা জুলাই মেজর জেনারেল সুদর্শনো এবং মহম্মদ ইয়ামিন সুকর্ণের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁদের তিনটি দাবী জানালেন: শাহরিরকে অপসারিত করতে হবে, তান মালাকাকে প্রধানমন্ত্রী করতে হবে এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে সুকর্ণের সমগ্র সামরিকবাহিনীর সর্বপ্রধানের যে পদ, তা জেনারেল সুদিরমানকে প্রত্যর্পণ করতে হবে।

ঠিক সেই সময়ে নাটকীয়ভাবে শাহরির সুকর্ণের ঘরে প্রবেশ করলেন। বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন সুকর্ণ। শাহরির যে মুক্তিলাভ করেছেন, একথা তিনি জানতেন না। তাঁর ধারণা ছিল সমগ্র সামরিক বাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে, সেইজন্যই তিনি সুদর্শনো এবং ইয়ামিনের দাবী সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন।

সুকর্ণ চীৎকার করে প্রশ্ন করলেন,—আপনি কি করে এলেন?

সেনাবাহিনীরা আমাকে মুক্তি দিয়েছে,—উত্তর দিলেন শাহরির।—সামরিকবাহিনী আমাদের দলে আছে।

এই সময়ে সামরিকবাহিনীর কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এসে সুকর্ণকে অভিবাদন জানালেন। সুকর্ণ তাঁদের সুদর্শনো এবং ইয়ামিনকে গ্রেফতার করতে আদেশ করলেন। সুদর্শনো এবং ইয়ামিন কারারুদ্ধ হলেন। এখন সব কিছু নির্ভর করছিল জেনারেল সুদিরমানের ওপর। তিনি দেখলেন যে জনসাধারণ ফ্রন্ট-বিরোধী এবং সেনাবাহিনীও তান মালাকা-বিরোধী, সুতরাং তিনি ফ্রন্ট থেকে সরে দাঁড়ালেন। সুকর্ণের আদেশে তিনি তান মালাকা, সুবারিয়ো এবং সুকর্ণীকে আটক করে রাখলেন।

কিন্তু শাহরিরের মন্ত্রিসভা খুব বেশিদিন চলতে পারে না, পারলও না। ওলন্দাজদের সঙ্গে লড়াই বেধে গেল এবং যুদ্ধ-শান্তির জন্য দুই দলে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তির জন্য দায়ী ছিলেন সুকর্ণ এবং হাত্তা; শাহরির চেয়েছিলেন ওলন্দাজদের কাছ থেকে আরও কিছু সুবিধা আদায় করে নিতে। ফলে পি. কে. আই এবং শাহরির-বিরোধী

অন্যান্য দল এই চুক্তি স্বাক্ষরের বিরোধিতা করে শাহরিরের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন শুরু করলেন। বিরক্ত হয়ে শাহরির পদত্যাগ করলেন, এবং তাঁর পরিবর্তে কমিউনিস্ট প্রার্থী শরিফুদ্দীন অন্যান্য বামপন্থী দলের (এমন কি শাহরিরের পি. এস. আই-এর) সহায়তায় প্রধানমন্ত্রী হলেন। অথচ কিছুদিন পরে যখন রাশিয়া জানাল যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ওলন্দাজদের সঙ্গে এ ধরনের চুক্তি করা যুক্তি-সঙ্গত হয়েছে, তখন পি. কে. আই আবার সেই চুক্তির জয়গান করে বেড়িয়েছিল।

সশস্ত্র বিদ্রোহে কমিউনিস্টদের ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন এবং ইন্দোনেশিয়ায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বহুদিন ধরে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্টরা হয় কারাগারে নয় আত্মগোপন করে কাল কাটিয়েছে। পাশ্চাত্য শক্তির উপনিবেশগুলিতে সশস্ত্র বিদ্রোহে মস্কো এতদিন উৎসাহ প্রকাশ করে নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব-পরিস্থিতি এমনভাবে পরিবর্তিত হতে শুরু করল যে মার্ক্সবাদী দর্শন দিয়ে তার বিচার সম্ভব নয়। মার্ক্সবাদ অনুযায়ী এবং বিশেষ করে স্ট্যালিনের মতানুযায়ী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যে তাদের উপনিবেশ ত্যাগ করবে তা অচিন্ত্যনীয়; কিন্তু আমেরিকা ফিলিপাইনকে দিয়েছে স্বাধীনতা, ব্রিটিশ স্বাধীনতা দিয়েছে ব্রহ্মদেশ, সিংহল, ভারত, পাকিস্তান এবং মালয়কে।

মার্ক্সবাদী দর্শন এই সমস্যার সমাধান করল এইভাবে—এইসব নবলব্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রে প্রকৃত স্বাধীনতা আসে নি। এইসব রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা এখন 'বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী'র হাতে; সুতরাং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তখনও অসম্পূর্ণ এবং এই 'বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদে'র পতন ঘটিয়ে তা সম্পূর্ণ করতে হবে।

কিন্তু কমিণ্টার্নের আর তখন অস্তিত্ব নেই। ১৯৪৭ সনে কমিনফর্ম প্রতিষ্ঠিত হল। ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে পোল্যাণ্ডে কমিনফর্মের অধিবেশন বসল। এখানে ঝান্দোভ জানালেন যে পৃথিবী এখন দুটি পরস্পর-বিরোধী দলে বিভক্ত হয়েছে এবং ঔপনিবেশিক দেশসমূহে অত্যাচারী শাসকসম্প্রদায়কে ক্ষমতাচ্যুত করার এখন সময় এসেছে। 'স্থায়ী শান্তি এবং জনসাধারণের গণতন্ত্রের জন্যই' এই ব্যবস্থা অবলম্বন সকলের কর্তব্য।

প্রস্তাবটি সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হল, কিন্তু এ সম্বন্ধে আরো আলোচনা প্রয়োজন এবং সঠিক নির্দেশ দরকার। ১৯৪৮ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত "এশীয় যুব-সম্মেলনে" এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদেশ, মালয়, ফিলিপাইন এবং ভারতবর্ষে (তেলেঙ্গানা) কমিউনিস্ট বিদ্রোহ দেখা দিল। ইন্দোনেশিয়াও পিছিয়ে রইল না।

১৯৪৮ সনের জানুয়ারি মাসে শরিফুদ্দিন ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আমেরিকার মধ্যস্থতায় ওলন্দাজদের সঙ্গে তিনি 'রেনভিল' যুদ্ধজাহাজে এক চুক্তি সম্পাদন করেন। এই রেনভিল চুক্তির জন্য দেশবাসী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে এবং আন্দোলনের ধাক্কা সামলাতে না পেরে তিনি পদত্যাগ করেন, কিন্তু দেশে দেশে সভাসমিতি করে 'রেনভিল চুক্তি'র পক্ষে বক্তৃতা করতে লাগলেন। মার্চ মাসে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট দল এশীয় যুব-সম্মেলনে যোগদান করে কলকাতা থেকে ফিরল। তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর শরিফুদ্দীন ডিগবাজী খেলেন, নিজেই রেনভিল চুক্তির নিন্দা করে বেড়াতে লাগলেন।

কলকাতার এশীয় যুব-সম্মেলনের পরই ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এশীয় যুব-সম্মেলনের প্রদর্শিত নীতি-অনুযায়ী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের তারা ব্যবস্থা করতে লাগল।

এদিকে শরিফুদ্দীনের পর ডক্টর হাত্তা হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর একেবারেই কমিউনিস্ট-প্রীতি ছিল না। তার ওপর সমগ্র সামরিক-বাহিনীকে একত্র করে নিয়মিত সরকারী বাহিনী ব্যতীত অপর সমস্ত দলীয়-সেনাবাহিনীকে তিনি রহিত করার ব্যবস্থা করেন। ফলে যারা অস্ত্র-ক্ষমতায় দেশের লোকদের ভয় দেখিয়ে নবাবী চালে বাস করছিল তারা মুস্কিলে পড়ল। গুপ্ত কমিউনিস্ট-সমিতির গেরিলা বাহিনীও এই ব্যবস্থার প্রবল প্রতিবাদ জানাল।

রাশিয়া হঠাৎ ঘোষণা করল যে তারা ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপনে অত্যন্ত আগ্রহশীল। ডক্টর হাত্তা এই প্রস্তাবের কোনও উত্তর দিলেন না। কিছুদিন পরে সংবাদ পাওয়া গেল যে শরিফুদ্দীনের প্রধান মন্ত্রিত্বের সময়ে মনোনীত চেকোস্লোভাকিয়ায় ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত সুপ্রিনো মস্কোয় গিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপনের চুক্তি স্বাক্ষর করে এসেছেন।

১২ই অগাস্ট হঠাৎ সুপ্রিনো কাউকে কোন সংবাদ না দিয়েই সুমাত্রার বুকিট্টিঙ্গিতে সুপাত্রো নামে তাঁর এক 'একান্ত সচিব'কে সঙ্গে করে এসে উপস্থিত হলেন। দেখা গেল যে এই 'একান্ত সচিব' 'সুপাত্রো' আর কেউ ন'ন—স্বয়ং মুসো—বারো বছর অজ্ঞাতবাসের পর ইন্দোনেশিয়ায় এসে হাজির হয়েছেন। মস্কো থেকে মুসোই দূত হয়ে ইন্দোনেশিয়ায় এলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পি. কে. আই-এর সর্বক্ষমতা তিনি হস্তগত করলেন। সশস্ত্র বাহিনীদের তিনি হাত্তার আদেশ অমান্য করতে নির্দেশ দিলেন এবং শাখা সমিতিগুলিকে সর্বত্র কমিউনিস্ট ক্ষমতা জোরদার করার আদেশ দিলেন।

৫ই সেপ্টেম্বর তিনি বামপন্থী ছাত্র-সমাবেশে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন :

> সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামে রত ইন্দোনেশিয়ার মতো একটা জাতি কখনো একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষাবলম্বন করতে পারে না।

> আমাদের তাই পক্ষাবলম্বন করতে হবে এমন একটি শক্তির সঙ্গে যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত এবং সেই শক্তি হল রাশিয়া। ঠিক এই সময়ে সুকর্ণ এবং হাত্তা ইন্দোনেশিয়া এবং তার জনগণকে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার কাছে বিক্রয় করতে বসেছেন।

ঠিক এই সুরে সুর মিলিয়ে কমিউনিস্ট পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা SOBSI পরের দিনই ঘোষণা করল :

> সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী ফ্রণ্টের নেতা। আমরা নিরপেক্ষ থাকতে পারি না। পৃথিবীর দুইটি শক্তির মধ্যে একটিকে আমাদের বেছে নিতে হবে। 'তৃতীয় শক্তি'র গঠনের কথা ধাপ্পাবাজি। তৃতীয় শক্তি গঠন-প্রয়াসী নেহরু সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে চলেছেন। পূর্ব ইউরোপে নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে থেকে আমাদের বন্ধু বেছে নিতে হবে। আমাদের শুধু যে রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হতে হবে তা-ই নয়, তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে হবে।

১৯৪৮ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বরে ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট দল দ্বিতীয়-বার সশস্ত্র বিদ্রোহে ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা করল। রাত তিনটের সময় কমিউনিস্ট সৈন্যদল অতর্কিত আক্রমণে মাদিউন অধিকার করে নেয়। সেখান থেকে তারা অভিযান চালাল সোলোর (সুরাকর্তা) দিকে। মাদিউন বেতার কেন্দ্র থেকে মুসো সুকর্ণ এবং হাত্তার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে লাগলেন। তিনি ঘোষণা করলেন : আমেরিকা ও জাপানের দালাল সুকর্ণ এবং হাত্তাকে দেশদ্রোহের অপরাধে হত্যা করা হবে।

রেডিও মস্কো এই বিদ্রোহকে সানন্দে স্বাগত জানিয়ে ঘোষণা করল : ফ্যাসীবাদী জাপানী কুইসলিং সুকর্ণ এবং হাত্তার সরকারের বিরুদ্ধে দেশের জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান করে মাদিউনে একটি জনগণের সরকার গঠন করেছে।

১৯শে সেপ্টেম্বর সুকর্ণ জাকর্তা থেকে জনগণের উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ দিলেন :

> Yesterday morning the Communist Party of Musso staged a coup in Madiun and formed a Soviet Government under the leaderhip of Musso. Brothers, consider carefully the meaning of this : Musso's Communist Party is attempting to seize our beloved Republic of Indonesia. I call on you to choose between Musso and his Communist Party, who will obstruct the attainment of an independent Indonesia and Sukarna-Hatta, who, with the Almighty's help, will lead our Republic of Indonesia to become an independent Indonesia, which is not subject to any country whatsoever.

কমিউনিস্টদের এই বিদ্রোহকে দেশের জনসাধারণ চরম বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করল। ইন্দোনেশিয়ায় তখন ওলন্দাজরা তাদের সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের শাসন বলবৎ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, জাহাজ দিয়ে চারদিক আটক করে বাইরে থেকে খাদ্য বা অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে রেখেছে। এই সময়ে বিদেশী-শত্রু ওলন্দাজদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত না হয়ে ওলন্দাজদের সুবিধার জন্য স্বদেশী সরকারের বিদ্রোহ ঘোষণায় জনগণ কমিউনিস্টদের ক্ষমা করতে পারল না। তারা কমিউনিস্টদের সঙ্গে সহযোগিতা তো করলই না, বরং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হল।

সরকারী সেনাবাহিনী তড়িৎগতিতে বিদ্রোহীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মেজর জেনারেল নসুশানের নেতৃত্বে সিলিওয়াঙ্গি ডিভিশন আক্রমণ করল মাদিউন। সাতদিনের মধ্যে কমিউনিস্ট বিদ্রোহ ধ্বংস

হয়ে গেল, কিন্তু ছোটখাটো লড়াই লেগে রইল ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত। এই দিন গ্রামাঞ্চলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে লড়াইয়ে মুসো নিহত হন। কমিউনিস্ট পার্টির নেতা বলতে আর কেউ রইলেন না। শরিফুদ্দীনকে ফাঁসি দেওয়া হল; সরজোনো এবং সুপ্রিনোকে কারারুদ্ধ করা হল। কারাভ্যন্তরে বসে সুপ্রিনো তাঁর স্মৃতিকথায় এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে লিখেছিলেন: The lesson we learned—a very precious one, although very hard,—was that people did not support us.

ডিসেম্বর মাসে ওলন্দাজদের গাঞ্জুক শহর আক্রমণ এবং অধিকারের পর সংগ্রামের জন্য তারা তান মালাকাকে মুক্তি দিল। তান মালাকা তখন পালিয়ে আত্মগোপন করলেন এবং কিছু লোকজন সংগ্রহ করে সুকর্ণ-হাত্তা সরকারের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করলেন। কিন্তু ১৯৪৯ সনের ১৬ই এপ্রিল তাঁকে বন্দী করে ফাঁসি দেওয়া হয়। তিন দশক ব্যাপ্ত তান মালাকার শাসন-ক্ষমতালাভের বিচিত্র অভিযান শেষ হল এইভাবে।

কিন্তু তাঁর একজন অনুচর চইরুল সালে তখনও গুপ্ত সমিতি গড়ে দূর গ্রামে গ্রামান্তরে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৯৫০ সনে সালে ধরা পড়লেন এবং উইলোপো সরকার তাঁকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করল। সালে কিছুদিন হল্যাণ্ডে ছিলেন, কিন্তু ওলন্দাজ সরকার তাঁকে সেখান থেকে বহিষ্কার করল। তারপর তিনি বার্লিন এবং বন-এ লেখাপড়া শেষ করে ১৯৫৬ সনে আবার ইন্দোনেশিয়ায় ফেরৎ আসেন।

ক্ষমতা দখলে দ্বিতীয়বারের বিপর্যয়ের পর পি. কে. আই প্রথমে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। নেতৃত্ববিহীন পি. কে. আই মাঝে কিছুদিন

সন্ত্রাস প্রচারের পরে একেবারে নীরব হয়ে গেল। দল বলতে আর কিছুই রইল না।

১৯৫২ সনে আবার পি. কে. আইকে পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করলেন আলিমিন। সঙ্গে যোগ দিলেন দীপা নুসনতারা আইদিত। এবার পি. কে. আই-এর আগের মতো চড়া সুর নয়। সকলের সঙ্গে সহযোগিতা তারা কামনা করল। এমন কি মার্ক্স-লেলিনবাদেরও তারা ভিন্ন অর্থ করতে লাগল। দেশী পুঁজিবাদ ভাল কারণ বিদেশী পুঁজিবাদের আক্রমণে তা বিপর্যস্ত। শক্তি-নিরপেক্ষতা ভাল কারণ তা আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার। ঈশ্বরে বিশ্বাস ভাল যদি সকলে ঈশ্বরে অবিশ্বাসকেও মেনে নেয়।

১৯৫২ সনের পি. কে. আই-এর দ্বাত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশনের শুরুতে পি. কে. আই-এর তদানীন্তন সেক্রেটারি-জেনারেল আলিমিন অধিবেশনের প্রারম্ভে 'হিদুপ সুকর্ণ', 'হিদুপ পি. কে. আই' ধ্বনি দিয়ে উপস্থিত সকলকেই স্তম্ভিত করে দেন। তখনই স্পষ্ট বোঝা গেল যে পি. কে. আই এবার সুকর্ণের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ না হয়ে সুকর্ণের অনুগত একটি দল হয়ে কাজ করতে আগ্রহী। এই অধিবেশনে পি. কে. আই একটি জাতীয় ফ্রন্ট গঠনের জন্য আহ্বান জানায় এবং ঘোষণা করে যে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে শত্রুতা না করে তারা সহযোগিতা করতেই চায়।

কিন্তু পি. কে. আই-এর অতীত দিনের শঠতা কোন রাজনৈতিক দল ভুলতে পারে নি। যুক্তফ্রন্ট গঠন করে ক্ষমতা হস্তগত করার পর তারা অপর দলের টুঁটি টিপে তাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। সেইজন্য কেউ পি. কে. আই-এর আমন্ত্রণে সাড়া দিল না। পি. কে. আই-এর পক্ষেও মন থেকে বর্তমান সরকারকে মেনে নেওয়া কঠিন হচ্ছিল, কারণ তাদের পূর্বতন শত্রু মাসউমি এবং পি. এস. আই উইলোপো সরকারকে গঠন করেছে। সুতরাং পি. কে. আই সুকর্ণের

কাছে আত্মসমর্পণ করল। সুকর্ণের আশীর্বাদে পূত হয়ে তারা সুকর্ণের দল, পি. এন. আই-এর অনুচর হিসেবে কিছুদিন কাজ করে যেতে লাগল। এখন তাদের স্ট্র্যাটেজি দলকে শক্তিশালী করা—যে কোন উপায়েই হোক—এবং সর্বক্ষেত্রে ক্ষমতা হস্তগত করে দেশের শাসন-ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করা। দেশের জনসাধারণের বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণের একমাত্র উপায় তখন সুকর্ণের অনুগ্রহ লাভ করা।

১৯৫৩ সনে উইলোপো সরকারের পতনের পর আলি শাস্ত্রোমিজোয়োর পি. এন. আই সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে তারা অগ্রসর হল। সুকর্ণ তাদের এই সহযোগিতা ভুললেন না। ১৯৫৫ সনের নির্বাচনে সুকর্ণের দোহাই দিয়ে পি. কে. আই বেশ ভাল ফল লাভ করল। ততদিনে আইদিত আলিমিনের কাছ থেকে পার্টির সেক্রেটারি জেনারেলের পদ অধিকার করে নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন সুপিত, লুকমান এবং নিয়োতো।

১৯৫৬ সনের পি. কে. আই-এর কাছে ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্টে আইদিত বলেন :

> চাষী সম্প্রদায়ের অধিকাংশই আজও আমাদের দেশে ভূমিহীন এবং জমিদার কর্তৃক উৎপীড়িত। জমিদার অধিকৃত এই জমি দখল এবং ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে তা বণ্টন পি. কে. আই চায় না। জমি সম্পর্কে পি. কে. আই-এর নীতি হল খাজনা হ্রাস। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টরা জাতীয়তাবাদী পুঁজিবাদকে বিপজ্জনক বলে মনে করে না। আমরা যে শুধু তাদের কোনরকম বিরুদ্ধাচরণ করতে চাই না তা নয়, আমরা তাদের সঙ্গে একত্র হয়ে দাবী জানাই যেন সরকার তাদের অর্থনৈতিক সুবিধাগুলিকে সংরক্ষণ করেন।

১৯৫৭ সনে মাসউমি এবং পি. এস. আই-এর বিদ্রোহে সবচেয়ে লাভবান হল পি. কে. আই। পি. কে. আই-ই শুধু বিদ্রোহী এ

দোষারোপ এখন আর কেউ করতে পারবে না। এই দুই দলের বিদ্রোহের পর পি. কে. আই সুকর্ণের অনুগ্রহ লাভের জন্য অন্যান্য দলের সঙ্গে জোর প্রতিযোগিতা করতে লাগল। কিন্তু সুকর্ণের অনুগ্রহ লাভ করতে গেলে তাঁর সমস্ত কাজ অনুমোদন করে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। পি. কে. আই সুকর্ণের কোন নীতিই অন্তরের সঙ্গে মানত না, কিন্তু দায়ে পড়ে তাদের সব কিছু মানতে হচ্ছিল।

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ যখন গাইডেড ডেমোক্রেসি ঘোষণা করলেন, তখন পি. কে. আই একটু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল কিন্তু যখন দেখল যে গাইডেড ডেমোক্রেসির খড়্গে অন্যান্য দলের ক্ষতি বেশি হবে, তখন তারা তাকে স্বাগত জানাল এবং সুকর্ণের নাসাকোম সরকারে তারা যোগদানও করল। সুকর্ণের অনুগ্রহে মন্ত্রীসভার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী বিভাগগুলি এল তাদের হাতে।

নাসাকোম সরকারের অন্যতম হয়ে তারা দেশের সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে পারে না। এখন তাদের আক্রমণের একমাত্র লক্ষ্য হল আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ। তারপর ইরিয়ান বরাট এবং সবশেষে মালয়সিয়া। কিন্তু দেশের শত্রুদের দিকেও তাদের নজর ছিল। এক নম্বর শত্রু ধর্মীয় দলগুলি এবং দু নম্বর শত্রু সামরিকবাহিনী।

জনসাধারণের কাছ থেকে সুকর্ণ কোনরকম প্রতিবাদ আশা করেন নি। তিনি জানতেন, তাঁর ক্ষমতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য দুটি দল তৈরি হচ্ছে—পি. কে. আই এবং সামরিকবাহিনী। সামরিক-বাহিনীর শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নাসাকোম সরকার তিনি পি. কে. আই দলের সভ্যদের দিয়ে অধিকাংশ পূর্ণ করলেন। তাদের হাতেই দিলেন সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা।

পি. কে. আই মেনে নিয়েছিল সুকর্ণের পঞ্চশীল নীতি। তার অর্থ কমিউনিস্টরা ঈশ্বরে বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। আইদিত মাঝে মাঝেই মসজিদে নমাজ পড়তে যেতেন এবং ইউসুফ অজিতোরোপকে

জাকর্তার প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জায় প্রায়ই দেখা যেত। পি. কে. আই-এর ওপর জনসাধারণের বিশ্বাস এইজন্য ক্রমে ক্রমে ফিরে এল। যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তারা খারাপ হবে কেন? যাদের বাপক সুকর্ণ মন্ত্রী করেছেন, তাদের বাপক কি ভাল করে না চিনেই রেখেছেন? সুকর্ণ কি তাদের চিনতে পেরেছিলেন? একদা তিনি বলেছিলেন:

> The only way to win the Communists over is to lead them. I have brought them nearer to me so that I can lead them in the way I wish to move.

সুকর্ণ চেয়েছিলেন কমিউনিস্টদের নিজের মতানুযায়ী চালিত করতে; কিন্তু কমিউনিস্টরাও প্রথম থেকেই জানত কোন্ পথে তারা চলবে। সুকর্ণ তাদের চালাবেন, না তারা সুকর্ণকে চালাবে—এই হল কথা। এই কাহিনীই হল ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান ইতিহাসের সবচেয়ে করুণ এবং মর্মান্তিক।

১৬

মালিকের কথাই সত্য হল।

আর আমার পালাবার পথ নেই। মালিকের কথা শুনে তখনই আমার ইন্দোনেশিয়া ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কি দুর্বুদ্ধি যে আমার হয়েছিল তা আমি বলতে পারি না। কিম আর সিণ্টার কথায় ভরসা করে এখানে থেকে যাওয়াই আমার কাল হল।

দশ বছর পরে বান্দুঙ সম্মেলনের পর আলজিয়ার্সে আবার আফ্রো-এশীয় সম্মেলনের অধিবেশন বসা নিয়েই নতুন করে ভারত ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সংঘর্ষ শুরু হয়। পি কে. আই এবং সুকর্ণের স্নেহপাত্র পররাষ্ট্র মন্ত্রী সুবন্দ্রিয়ো সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন যে নেকোলিম রাষ্ট্রসমূহের জোট রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ করে সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল ভারতবর্ষ আর মালয়সিয়া ব্যতীত আফ্রিকা এবং এশিয়ার আর সমস্ত রাষ্ট্র সুকর্ণ-প্রতিষ্ঠিত কোনোফোতে যোগদান করবে। কিন্তু আলজিয়ার্সে প্রেসিডেণ্ট বেন বেল্লার পতন এবং কর্নেল বুমেদিয়েনের শাসন-ক্ষমতা অধিকারে সুবন্দ্রিয়োর এই স্বপ্ন সাময়িকভাবে ভেঙে যায়।

এই সেপ্টেম্বর মাসে আবার সেই সম্মেলনের অধিবেশন বসার সম্ভাবনা দেখা দিল। কিন্তু চীনের শত্রু রাশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার পরম শত্রু মালয়সিয়াকে এই সম্মেলনে আহ্বান না জানানোর জন্য ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানের সমস্ত প্রচেষ্টা ভারত ব্যর্থ করে দেওয়াতে সুবন্দ্রিয়োর সমস্ত রাগ পড়ল গিয়ে ভারতের ওপর।

ঠিক এই সময়ে পাকিস্তানের সামরিক ডিক্টেটর আয়ুব খাঁ অতর্কিতে কাশ্মীর আক্রমণ করে বসলেন। চীন পাকিস্তানকে মদৎ জোগালো। সুতরাং পি. কে. আই এবং সুবন্দ্রিয়ো পিছিয়ে থাকবেন কেন?

হাজার হাজার লোক 'হিতুপ নাসাকোম', 'হিতুপ পি. কে. আই,' "বুর্বাকোন নেকোলিম' 'গাণ্টুঙ ইণ্ডিয়া' ধ্বনি দিয়ে জাকর্তার এয়ার-ইণ্ডিয়া অফিস আক্রমণ করল। সব কিছু তছনছ করে অফিসে আগুন লাগিয়ে তারা সদর্পে ফিরে গেল। ইন্দোনেশিয়ার পুলিশ দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য উপভোগ করল।

হোটেলে বসে আমি ভয়ে ঘামতে লাগলাম।

ঠিক এই সময়ে কিম আর সিণ্টা এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। 'এয়ার-ইণ্ডিয়া'র খবর দুজনেই রেডিওতে শুনেছেন। দুজনকেই সবিশেষ উদ্বিগ্ন দেখলাম।

সিণ্টা বলল—আর তো দেরী করা যায় না বাপক। দেশের লোকেরা যেভাবে ক্ষেপে উঠেছে তাতে ওনার কোন ক্ষতি হওয়া সম্ভব। আমি বলি কি সেন রাতুকে আমি আমার বাড়িতে নিয়ে যাই।

কিম বললেন—আমি ভেবেছিলাম যে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব।

সিণ্টা উত্তর দিল—এখন উনি আমার বাড়িতে চলুন। আমার ওখানে ওঁর থাকার কোন অসুবিধা হবে না। তাছাড়া সুমাত্রো এসে গেছে। ওর সঙ্গে আলাপ হবে এবং দুজনে গল্প করে দিন কাটাতে পারবে। সিণ্টার গাড়িতে করে গিয়ে উঠলাম তার বাড়িতে। হোটেলে নিঃসঙ্গ থাকার চেয়ে এই ব্যবস্থাই ভাল হল। আমার উপস্থিতি একটু গোপন রাখতে হবে।

সুমাত্রোর সঙ্গে আলাপ হলো। আমার চেয়ে কিছুটা ছোট হবে। সরকারী চাকরি করে। দেখে মনে হলো না যে এ সেই সুমাত্রো যে একদিন জাপানীদের জাহাজে বোমা মারার জন্য সিঙ্গাপুর পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। অবশ্য সিণ্টাকে দেখেও সে রকম মনে হয় না। সুমাত্রো কথাবার্তায় বেশ নম্র এবং ভদ্র। মাঝে মাঝে বেশ রসিকতাও করে। হরাতোনোর সম্বন্ধে এখন তার ধারণা খুব খারাপ। বলে—হরাতোনো কিছু করল না। নিজেরও না, পরেরও না। কোন পার্টিতে

গেল না, কাজের কিছুই করল না। নিজের দল করে লোককে ভয় দেখায় আর লুটপাট করে। যখন যেদিকে সুবিধা দেখে তখন সেই দিকেই ও ছুটে যাবে। সকলেই জানে, পুলিশেও জানে—কিন্তু কিছু বলবার উপায় নেই।

পরদিন সকালে খবরের কাগজ খুলে আমার চক্ষুস্থির।

এখানকার সমস্ত সংবাদপত্রই এখন সরকারের অনুগ্রহে চলে। সুবন্দ্রিয়োর অধীনস্থ সরকারী সংবাদ সংস্থা 'আন্তারা'র প্রদত্ত সংবাদ ব্যতীত অন্য কোন সংবাদ প্রকাশ করা যাবে না। পি. কে. আই-এর কর্মীদের পরিচালনাধীনে এই আন্তারা নিউজ এজেন্সি।

এই সংবাদ-পত্রে প্রথম হেডলাইন হল নেকোলিম ইণ্ডিয়ার বিরুদ্ধে কোনেফোর জেহাদ। কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তান লড়াইয়ে পাকিস্তান-রঞ্জিত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে ফলাও করে। তার পরেই বড় বড় হরফে আর একটি সংবাদ :

> সহস্র সহস্র ইন্দোনেশীয় যুবক গতকাল দুপুরবেলায় মেদানে অবস্থিত ভারতীয় কন্সালেট অফিসবাড়ি অধিকার করে নেয়। তাদের এই সাহসিক কাজ কাশ্মীরী ও পাকিস্তানীদের প্রতি ইন্দোনেশিয়ার জন-সাধারণের গভীর প্রীতি এবং একাত্মবোধের বলিষ্ঠ প্রমাণ। ভারতের পতাকা নামিয়ে নিয়ে এই সাহসী যুব-যোদ্ধারা ওই অফিসে আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে।

তার পরের সংবাদগুলিও ভয়ঙ্কর। জাকর্তায় ভারতের রাষ্ট্রদূতের বাড়ির সামনে সহস্র সহস্র লোক নানারকম ব্যানার, ফেষ্টুন এবং প্ল্যাকার্ড নিয়ে গোলমাল করে এবং ভারত-বিরোধী স্লোগান দেয়। ভারতের মালয়সিয়াকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিরুদ্ধেই বেশি স্লোগান। সেইদিনই সুকর্ণের উপস্থিতিতে নাসাকোম সরকার ভারতীয়দের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করে নিল এবং বিধিবদ্ধভাবে

মারমুখী জনতা পথে পথে মিছিল বের করে ভারতের আদ্যশ্রাদ্ধ করে বেড়াতে লাগল।

আমাকে গম্ভীর হয়ে বসে থাকতে দেখে সিণ্টা বলল—আপনি কোনরকম ভয় পাবেন না। আপনি যে এখানে আছেন কেউ জানে না। তাই কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।

বললাম—হরাতোনো ?

সিণ্টা বলল—সুমাত্রো ফিরে এসেছে, তাই হরাতোনো আর এদিকে সহজে আসবে না। সুমাত্রোকে বড় ভয় করে। আর তা ছাড়া আমি তো আছিই।

বললাম—সরকার যেখানে সমস্ত দেশকে ক্ষেপিয়ে তুলছে সেখানে তোমার বাধা দেবার শক্তি আর কতটুকু সিণ্টা ?

সিণ্টা উত্তর দিল—তা বলতে পারি না ; কিন্তু একথাও সত্যি—আমি বেঁচে থাকতে আপনার কোন ক্ষতি হতে দেব না।

ভাল লাগল সিণ্টার কথাগুলো শুনতে, কিন্তু মিষ্টি কথায় কিংবা একজনের আন্তরিক সদিচ্ছায় জ্ঞান-পাপীদের দুষ্কার্যের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যে সম্ভব নয়—একথা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু তখন আর উপায়ই বা কি ? আত্মরক্ষার সময়, সুবিধা এবং সুযোগ আমি নিজে থেকেই হারিয়েছি। এখন আর কাউকে দোষ দিয়ে হাহুতাশ করার কোন অর্থ হয় না। এই পরিস্থিতিকেই স্বাভাবিক মনে করে নিয়ে তাই নিয়েই মানিয়ে থাকার চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ।

সেদিন কেটে গেল ভালভাবেই। কিম দু'বার এসে খোঁজ নিয়ে গেছেন, আশ্বাস দিয়ে গেছেন। অফিস থেকে ফিরে সুমাত্রো যতদূর সম্ভব আমাকে নিয়ে হাসিগল্প করে কাটাতে চেষ্টা করেছে। এদের ভরসায় মনে অনেকখানি সাহস ফিরে এসেছিল।

কিন্তু সুবন্দ্রিয়ো এই দুর্যোগ-ক্লিষ্ট দেশকে শান্তিতে থাকতে দিতে পারেন না যতদিন না সুকর্ণ কিংবা পি. কে. আই তাঁকে সে আদেশ

দিচ্ছেন। দেশের চরম অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য দায়ী যে সুকর্ণ এবং নাসাকোম সরকার, তাদের স্বার্থের জন্যই দেশের লোককে কোন-না কোন অজুহাতে সব সময়ে ক্ষেপিয়ে রাখতে হবে যাতে না দেশের সত্যকার সমস্যা তাদের চোখে ধরা পড়ে এবং এই সমস্যা সৃষ্টিকারী লোকদের কাছ থেকে তারা জবাব চাইতে না পারে।

সুবন্দ্রিয়ো এবং পি. কে. আই এবার নাসাকোম সরকারের কাছে পাকিস্তানকে সাহায্যের আবেদন জানালেন। সুকর্ণ ঘোষণা করলেন যে তিনি ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সাহায্যে যুদ্ধজাহাজ পাঠাবেন। সুকর্ণকে খুশি রাখার জন্য নাহদাতুল উলামার কার্যকরী সমিতি তার বিভিন্ন শাখাদলকে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করতে নির্দেশ দিল। এই স্বেচ্ছাসেবকদলকে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পাকিস্তানে পাঠানো হবে।

জাকর্তা রেডিও বড় গলায় ঘোষণা করল নাহদাতুল উলামার প্রস্তাব এবং জানাল :

> This is in the framework of implementing the command of the Champion of Islam and Great Leader of the Revolution, Bung Karno, in extending support to Muslim Pakistan.

রেডিওর ঘোষণা শুনে সুমাত্রো বলল—আমাদের এই দেশ চিরকাল ধর্মকে রাজনীতির থেকে দূরে রেখে এসেছে, কিন্তু আজ এই নাসাকোম সরকার ধর্মের মধ্যে রাজনীতি এবং রাজনীতির মধ্যে ধর্ম ঢোকাতে চাইছেন। পাকিস্তানকে কোনরকম সাহায্য করতে ইচ্ছা করলে স্পষ্ট বলা উচিত যে আমরা আমাদের বন্ধু-রাষ্ট্র পাকিস্তানকে সাহায্য করব। তা না, আমাদের সাহায্য করতে হবে 'মুসলিম পাকিস্তান'কে। এর ফল কি ভাল হবে ?

আমি চুপ করে রইলাম।

সিণ্টা বলল—মুখের কথায় শুধু চিড়ে ভেজে না। স্বেচ্ছাসেবক পাঠাবে পাকিস্তানে! যত সব বাজে কথা। পি. কে. আই স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে মারামারির জন্য তৈরি হচ্ছে বলে নাহদাতুল উলামাও স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করতে চায়। পাকিস্তানকে সাহায্য করব না বললে তো আর বুঙ্গ রাজি হবেন না।

সুমাত্রো বলল—অথচ এই বন্দ্রিয়ো মুসলিম দলগুলির ওপর বরাবর খড়্গ-হস্ত। বরাবর এইসব দলকে তিনি 'রিআক্সি' বলে এসেছেন। আজ এইসব দলকে নিজের কাজে লাগানোর জন্য ভারত-পাকিস্তানের লড়াইয়ে ইন্দোনেশিয়াকে নিয়ে গিয়ে ফেলেছেন। এখনই যদি ভারতবর্ষ ঘোষণা করে যে তারা মালয়সিয়াকে স্বীকার করবে না, সঙ্গে সঙ্গে বন্দ্রিয়োর সুর বদলে যাবে দেখবেন। আলজিয়ার্সের আফ্রো-এশীয় সম্মেলন সুবন্দ্রিয়োর মাথা খারাপ করে দিয়েছে। আজকের 'ইন্দোনেশিয়ান হেরাল্ড' পত্রিকাতে এই বিষয়ে খুব মজার একটা প্রবন্ধ আছে।

এই বলে সুমাত্রো সেদিনকার 'ইন্দোনেশিয়ান হেরাল্ড' পত্রিকাটি খুলে পড়তে লাগল :

> সংবাদে প্রকাশ যে কতগুলি মুসলিম রাষ্ট্র আলজিয়ার্সে আসন্ন আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে ভারতের অন্তর্ভুক্তি রদ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।…বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে এখানেও জাকর্তার প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণের নিকট অনুরূপ প্রস্তাব আসিয়াছে। এখনও সঠিক জানা যায় নাই যে রাষ্ট্রপতি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুবন্দ্রিয়ো যখন বিদেশাগত কয়েকটি পত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, তখনই এই নূতন পরিকল্পনা স্থিরীকৃত হইয়াছিল কিনা।

এইটুকু পড়েই সুমাত্রো হেসে উঠে বলল—দেখলেন তো? সুবন্দ্রিয়ো সুযোগ পেলে নিজের নামটা জাহির না করে থাকতে পারেন না। এই প্রবন্ধটা স্পষ্ট ওঁর লেখা।

বললাম—এইটুকু লেখাতে আর কি করে নিঃসংশয় হওয়া যায় ?

সুমাত্রো উত্তর দিল—যারা সুবন্দ্রিয়োকে জানে, যারা তাঁর লেখা পড়ে, তারা স্পষ্ট বুঝতে পারে। আলজিয়ার্স আর রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিয়ে এদেশে আর কারুর মাথাব্যথা নেই। সমস্ত সংবাদ কিংবা প্রবন্ধে এই দুটির ছড়াছড়ি কেউ করতে চাইবে না—এক সুবন্দ্রিয়ো ছাড়া। পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কিংবা আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে তাঁরই সভা আলো করে বসার কথা, তাঁরই বক্তৃতা দেওয়ার কথা। অথচ রাষ্ট্রসঙ্ঘ হাত-ছাড়া হয়ে গেছে, আর ভারতবর্ষ মালয়সিয়াকে মদৎ দিচ্ছে বলে আফ্রো-এশীয় সম্মেলনও সুবন্দ্রিয়োর হাত থেকে ছুটে যেতে পারে। সুবন্দ্রিয়ো বক্তৃতা দিয়ে আর হাততালি কোথা থেকে পাবেন ?

সিণ্টা আমার কথার ধুয়ো তুলে বলল—তবু, ওইটুকু লেখা পড়ে তা সুবন্দ্রিয়োর লেখা বলে ধরে নেওয়া যায় না। তুমি সুবন্দ্রিয়োকে দেখতে পার না, তাই—

আচ্ছা,—হাত নেড়ে বলে উঠল সুমাত্রো,—তবে শোন আর একটু। প্রবন্ধ তো ওখানেই শেষ হয় নি।

এই বলে সুমাত্রো কাগজটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে একজায়গা থেকে আবার পড়তে লাগল :

> রাজধানীর রাজনৈতিক সমালোচকবৃন্দ লক্ষ্য করিয়াছেন যে বর্তমানে ভারতবর্ষ বাস্তবিক অদ্ভুত ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত। আসন্ন আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে রাষ্ট্রসমূহকে একতাবদ্ধ করার অপেক্ষা শাস্ত্রী সরকার এই সম্মেলন ভণ্ডুল করার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। গত জুন মাসে নেকোলিম শ্যামদেশীয় যমজের মতো ভারতবর্ষ আর 'মালয়সিয়া' যে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে একত্রে কারচুপি করিয়া একটি আবেদন মারফৎ আলজিয়ার্স সম্মেলনের অধিবেশন মুলতুবি রাখার ব্যবস্থা করেন, রাজনৈতিক সমালোচকবৃন্দ এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করেন।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে হেসে সুমাত্রো বলল—বিশ্বাস হচ্ছে ? থোড়া থোড়া,—না ? আচ্ছা তবে আর একটু শোন ঃ

> আফ্রো-এশীয় জগতের এবং বিশেষ করিয়া মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের চোখে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মর্যাদা একেবারে শূন্যের কোঠায় নামিয়া গিয়াছে। তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে নেকোলিম শক্তিসমূহের সঙ্গে মৈত্রী এবং সখ্যতায় আবদ্ধ একটি রাষ্ট্রের কার্যকলাপে যখন তাহাদের ধর্ম এবং প্রতিরক্ষা বিঘ্নিত হইয়া ওঠে, তখন তাহারা এই বিশ্ব সংস্থার উপর বিশ্বাস রাখিতে পারে না। এই বিশ্ব সংস্থা যে নির্লজ্জের মতো ভারতবর্ষের পক্ষাবলম্বন করিয়াছে এবং পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর নিকট চূড়ান্ত পরাজয়ের হাত হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছে, এই ঘটনাগুলি রাষ্ট্রসঙ্ঘের উপর নেকোলিম শক্তির প্রভাবের নিষ্ঠুর সত্যতা প্রকাশ করে।

হা হা করে হেসে উঠে সুমাত্রো বলল—এবার বিশ্বাস হল কি ? এইটুকু লেখার মধ্যে কতবার নেকোলিম, আলজিয়ার্স আর রাষ্ট্রসঙ্ঘ আছে গুণে দেখ, তারপর ভেবে দেখ যে সুবন্দ্রিয়োর মস্তিষ্ক ছাড়া আর কোথা থেকে এই লেখা বের হতে পারে ?

আমি বললাম—তা না হয় বুঝলাম। ভারত-পাকিস্তানের লড়াইয়ের খবর কি ? খবরের কাগজে যা পড়ি কিংবা রেডিওতে যা শুনি—

সুমাত্রো উত্তর দিল—যা শোনেন তা সম্পূর্ণ ভুলে যেতে পারেন। সিঙ্গাপুর টাইমস্ পড়লে আবার বিপরীত খবর পাবেন। কোন্‌টা সত্যি বলা কঠিন। সিঙ্গাপুর টাইমস্ লিখছে যে ভারতবর্ষের সৈন্যরা লাহোরের সামনে এসে পাঁয়তাড়া কষছে আর পাকিস্তান ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা আর রাশিয়ায় কাছে ধর্না দিচ্ছে তাদের রক্ষা করতে। পাকিস্তানের চালে একটু ভুল হয়েছিল। আয়ুব খাঁ ভেবেছিলেন যে কাশ্মীরের মুসলমানরা পাকিস্তানী আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহ

করবে। কিন্তু তা হল না। আয়ুব খাঁ ভেবেছিলেন যে নেহরুকে চীন যদি কাবু করতে পেরে থাকে তো পাকিস্তান শাস্ত্রীকেও কাবু করতে পারবে। সেখানেও চালে ভুল। আয়ুব খাঁ ভেবেছিলেন যে আমেরিকার জঙ্গী বিমান ট্যাঙ্ক নিয়ে ভারতবর্ষকে ঠাণ্ডা করবেন কিন্তু ভারতবর্ষের প্লেনে আর ট্যাঙ্কে নিজেই ঠাণ্ডা হয়ে গেছেন।

সুমাত্রোর কথাগুলো সারারাত ধরে ভেবেছি।

আস্তারার ওপর সুবন্দ্রিয়োর প্রভাব জানতাম। আরো ভাল করে জানলাম সুবন্দ্রিয়োর মন জুগিয়ে তাদের সংবাদ পরিবেশনের কীর্তি। পরদিনের সংবাদ-পত্রে ছুটি সংবাদ পড়ে সুমাত্রোর কথার সত্যতা প্রমাণিত হল :

> Thousands of angry youths recently held demonstrations in Karachi, Dacca and Lahore in protest of U.N. decisions and also American and British support of Indian aggression against Pakistan.
>
> Pakistani official circles and press last Monday strongly resented 'Malaysia's' pro-India stand in the Security Council and for the first time openly denounced neo-Colonialist project as a Colonialist project.

এই হল চব্বিশে সেপ্টেম্বরের সংবাদ।

পঁচিশে সেপ্টেম্বর জাকর্তা পরিবর্তিত হল এক রহস্য নগরীতে।

ভারত, পাকিস্তান, মালয়সিয়া, রাষ্ট্রসঙ্ঘ—কোথাও আর এই সবের উল্লেখ নেই। সবচেয়ে বড় সংবাদ পাঁচুই অক্টোবর সামরিকবাহিনীর

বিংশতম প্রতিষ্ঠা দিবসে সামরিকবাহিনীর কুচকাওয়াজ। এই একটি সংবাদ নিয়ে চতুর্দিকে চাপা গুঞ্জন, হাজার গুজবের ছড়াছড়ি।

পাঁচুই অক্টোবর তবে!—হ্যাঁ, সামরিকবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে সুকর্ণের নাসাকোম সরকারের হাত থেকে শাসন-ক্ষমতা ছাড়িয়ে নেবে।

পি. কে. আই অফিস থেকে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সারা নগরীতে, তারপর সারা দেশে—

জাকর্তার স্বাভাবিক উচ্ছল জীবন এক মুহূর্তে ঋজু হয়ে গেল।

১৭

৫ই অক্টোবরেরও একটা ইতিহাস আছে।

সামরিকবাহিনীর প্রতিষ্ঠা-দিবসে সামরিক কুচকাওয়াজ কোন্ দেশে না হয়? ইন্দোনেশিয়াতেও এই ঘটনা অঘটন বলে ধরা হবে কেন? প্রতি বছরই ইন্দোনেশিয়াতে এই ধরনের কুচকাওয়াজ হয়ে এসেছে। প্রতি বছর স্থকর্ণ সামরিকবাহিনীর 'গার্ড অব অনার' গ্রহণ করেছেন। তবু এ বছর যেন তার একটু বিশেষত্ব আছে। এবার স্থলবাহিনী আর নৌবাহিনী একত্রে ঘোষণা করেছে যে এবারকার কুচকাওয়াজের কাহিনী হবে ওলন্দাজদের অধিকার থেকে জাকর্তা উদ্ধার। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিমানবাহিনী এই ঘোষণার মধ্যে নেই।

ঘোষণাটি অত্যন্ত সরল, কিন্তু যার মনে যা চোরের মনে বোঁচকা। পি. কে. আই এই ঘোষণায় অস্থির হয়ে উঠল। রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে উঠল তারা। বেশ বুঝতে পারল যে এই ঘোষণাটি তাদের প্রতি সামরিকবাহিনীর চ্যালেঞ্জ। সামরিকবাহিনী তাদের শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এবারে এই অভিনব এবং বিচিত্র কুচকাওয়াজের আশ্রয় নিয়েছে।

পি. কে. আই-এর ভীতি অমূলক নয়।

নাসাকোম সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই কমিউনিস্ট এবং সামরিকবাহিনীর মধ্যে একটি অঘোষিত সংগ্রাম চলে আসছে। দু-দলই পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছে এবং সুযোগ পেলে পরস্পরকে খতম করতেও পিছ-পা নয়।

তার জন্য দায়ী স্থকর্ণ স্বয়ং। কমিউনিস্টদের দুইবার বিদ্রোহ তিনি দেখেছেন। তাদের সংগঠন-শক্তি, তাদের জন-সাধারণকে ক্ষেপিয়ে

তোলার কায়দায়ও তিনি চমৎকৃত। আবার সামরিক বাহিনীর ঔদ্ধত্যও তিনি দেখেছেন। ১৯৬২ সনের ১৭ই অক্টোবরের ঘটনাও তিনি ভোলেন নি। সুতরাং যেদিন দেশের সংবিধান নাকচ করে সর্বশক্তিমান ডিক্টেটরের ক্ষমতা তিনি গ্রহণ করলেন, সেদিন অন্যান্য রাজনৈতিক-দলের বিরোধিতাকে খর্ব করার জন্য জাতিচ্যুত পি. কে. আই-কে শুধু যে সাদরে কোল দিলেন তা-ই নয়, তাঁর সরকারে তাদের সবচেয়ে শক্তিমান করে রাখলেন। কিন্তু কমিউনিস্টদের তিনি একেবারেই বিশ্বাস করতেন না। তিনি জানতেন যে তাঁর অধিকারে প্রথম যদি কেউ হস্তক্ষেপ করতে ওঠে তো তা কমিউনিস্টরাই করবে। তাই তাদের শাসনে রাখার জন্য তিনি সাহায্য নিলেন সামরিকবাহিনীর। এই দুই শক্তিশালী দলকে তিনি সব সময়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে রাখলেন।

জনসাধারণের চোখের সামনে এসে দাঁড়ানোর জন্য পি. কে. আই সুকর্ণের ইরিয়ান বরাট অভিযানের জন্য প্রবল আন্দোলন শুরু করে দিল। এই সামরিক অভিযানে সাহায্য করার জন্য পি. কে. আই একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করল। তারা দাবী করল এই দলকে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হোক, কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষ এতে বাদ সাধল। তারা চাইল না যে বেসরকারী একটা দলীয় বাহিনী গঠিত হয়। ফলে সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পি. কে. আই-এর চরম বিরোধ বাধল। পি. কে. আই সামরিক রসদ সরবরাহ বন্ধ করার মুখ্য উদ্দেশ্যে কল-কারখানা এবং যান-বাহনে ধর্মঘট করাতে লাগল। জরুরী অবস্থার আইনের সাহায্যে সামরিক কর্তৃপক্ষও সেই ধর্মঘট ভেঙে ধর্মঘটী এবং তাদের নেতাদের ধরপাকড় করতে লাগল। সামরিক-বাহিনীকে তীব্র আক্রমণ করে পি. কে. আই তাদের সংবাদপত্র

'ইরিয়ান রাকিয়াতে' নানা সংবাদ প্রকাশ করতে লাগল। সামরিক কর্তৃপক্ষও প্রত্যুত্তরে জরুরী আইনে 'ইরিয়ান রাকিয়াত' প্রকাশ বন্ধ করে তাদের ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করল।

নসুশান রাশিয়াতে গিয়ে যখন প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দেশে ফিরলেন, তখন পি. কে. আই মৌখিক উল্লাস প্রকাশ করল এইজন্য যে ইন্দোনেশিয়া ক্রমে ক্রমে কমিউনিস্ট ব্লকের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে; কিন্তু অন্তরে তারা রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে উঠল। ইরিয়ান বরাট অভিযান শেষ হয়ে গেলে পর এত অস্ত্রশস্ত্র কার বিরুদ্ধে সামরিকবাহিনী প্রয়োগ করবে? সামরিক বাহিনী অতিরিক্ত শক্তিশালী হয়ে উঠলে পি. কে. আই কোনদিন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তাই পি. কে. আই. 'ক্যাপিট্যালিস্ট-বুরোক্র্যাট' সামরিকবাহিনীর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলল।

পি. কে. আই-এর সেক্রেটারী জেনারেল আইদিত ইন্দোনেশিয়াকে সামরিক কর্তৃত্বাধীন জরুরী অবস্থার থেকে মুক্তিদানের জন্য সুকর্ণের কাছে দরবার করলেন। জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার হলে সামরিক-কর্তৃপক্ষ দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এবং পি. কে. আই প্রভাবিত নাসাকোম সরকার তখন সামরিক কর্তৃপক্ষের ওপর খবরদারী করতে পারবে। ইরিয়ান বরাট অধিকারের জন্য আর সামরিকবাহিনীর প্রয়োজন কি? দেশের জনগণই ইরিয়ান বরাট অধিকার করবে।

আইদিত হেঁয়ালী কমিউনিস্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন:

> The masses will not only complete the struggle to liberate West Irian and re-establish security, but w ll rush on to crush all obstacles in the way of the people's revolutionary movement, such as the War Emergency Status, the capitalist-bureaucrats, com-

pradores and landlords, in short, everything against the Manipól and national gotong royong on the basis of Nasakom.

সামরিকবাহিনী হল পি. কে. আই-এর কাছে কাবির (ক্যাপিটালিস্ট বিরোক্র্যাট), এবং দালাল (কম্প্রাডোর)—জনগণের বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রবল বাধা, সুতরাং তাদের ধ্বংস করতে হবে। কিন্তু যে-সুকর্ণ জণগণের সমস্ত অধিকার হরণ করে ডিক্টেটর হয়ে বসে দেশকে অর্থনৈতিক চরম দুর্দশার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছেন, যাঁর অনুগ্রহে পি. কে. আই আজ নাসাকোম সরকারে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসন লাভ করেছে—সেই সুকর্ণ সম্বন্ধে পি. কে. আই-এর ধারণা কি ?

তার উত্তরও আইদিত দিয়েছেন :

It is quite obvious that Bung Karna's ideas show no similarity at all to the ideas of Hitler and Mussolini and their disciples in Indonesia···

আর সব শেষে : দেশে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকুক, কিন্তু which one of them will become the leading party is for the people to decide.

এবং এই people অর্থে পি. কে. আই। সুতরাং পি. কে. আই-এর সংঘর্ষ বাধল নাহদাতুল ইসলামের সঙ্গে এবং সাধারণ লোকের সঙ্গে যারা রাজনীতির ধার ধারতো না।

শঙ্কিত এবং সন্দিগ্ধ চিত্তে সামরিক কর্তৃপক্ষ কমিউনিস্টদের দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা অধিকারের প্রচেষ্টা দেখতে লাগল। কিন্তু আরো কয়েকটি ব্যাপারে তাদের চিত্ত-চাঞ্চল্য বেড়ে গেল। বিমানবাহিনী এবং মেরিন কোর কে-কে-ও সুবন্দ্রিয়োর হাতের মুঠোয় ধীরে ধীরে চলে

আসছে। পি. কে. আই দল থেকে বেছে বেছে লোকদের এই দুই বাহিনীতে নিয়োগ করা হচ্ছে এবং বিমানবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ জেনারেল ওমর দানি এই কাজে তাদের সহায়। অল্প সময়ের মধ্যেই এই তরুণ অফিসার দল বয়স্কদের ডিঙিয়ে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হল। মূল স্থল ও নৌবাহিনীতে কমিউনিস্ট-সমর্থক বিশেষ ছিল না; কিন্তু সুবন্দ্রিয়ো সুকর্ণের প্রাসাদ-রক্ষীদলকে কুক্ষিগত করে নিয়েছিলেন। তাছাড়া ছিল পি. কে. আই-এর স্বেচ্ছাসেবক। চীন সফর শেষ করে চীনা অস্ত্রশস্ত্রে সুবন্দ্রিয়ো তাদের সজ্জিত করেন।

এই স্বেচ্ছাসেবকদল নিয়ে স্থলবাহিনীর সঙ্গে প্রথম গোলমাল বাধল। মালয়সিয়া এবং ইরিয়ান বরাটের সময়ে শত্রুদের কাছে স্থলবাহিনী যত না বিব্রত হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি বিব্রত হয়েছিল এই স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে। সমরনীতির তারা ধার ধারতো না, হৈ হল্লা করে সামবিকবাহিনীর গোপন ঘাঁটির অস্তিত্ব শত্রুদের জানিয়ে দিত। নিয়মিত সৈন্যদলের চেয়ে তারা ভাল খাবার এবং বাসস্থান পেত। এই স্বেচ্ছাসেবকদল একটা গুলিও না ছুঁড়ে বীরত্বের বড়াই করে বেড়াত। এই সব নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর খিটিমিটি ও গোল-মাল বেধে যেত।

সুকর্ণের কাছে সুবন্দ্রিয়োর যতই প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়তে লাগল, সুকর্ণের কাছ থেকে সেনাধ্যক্ষগণ ততো দূরে সরে যেতে লাগলেন। পি. কে. আই প্রভাবিত নাসাকোম সরকার সামরিকবাহিনীর সঙ্গে কোনরূপ পরামর্শ না করেই দেশী ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারিত করত যদিও জেনারেল নসুশান একজন সরকারী মন্ত্রী। সামরিকবাহিনী সম্পর্কিত সমস্ত সংবাদ ছেঁটে ফেলে সরকারী সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'আন্তারা' বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করায় তারা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। আন্তারার পরিচালকদের মধ্যে তিনজন অ-কমিউনিস্টকে পদচ্যুত করায় তারা প্রতিবাদ জানাল। পি. কে. আই সুকর্ণকে দিয়ে একশটি

অ-কমিউনিস্ট সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ করিয়ে দিতে পেরেছিল। ইন্দো-নেশীয় সাংবাদিক সংস্থা পি. ডব্লু. আই থেকে ষাট জন অ-কমিউনিস্ট সাংবাদিককে পি. কে. আই বিতাড়িত করেছিল। ফলে তারা চির-জীবনের জন্য বেকার হল, কারণ ইন্দোনেশিয়াতে পি. কে. আই প্রভাবিত এই সাংবাদিক সংস্থার সভ্য ব্যতীত কেউ সাংবাদিকতা করতে পারবে না।

সামরিক সংবাদপত্র "আঙ্গাতান বেরসেনজাতা" একদিন সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখল ঃ

> সংবাদপত্র যখন রাষ্ট্রপতি সুকর্ণের পঞ্চশীল মতবাদ প্রচারের প্রধানতম হাতিয়ার, তখন ইহা প্রকৃত পঞ্চশীলবাদীদের হাতেই থাকা উচিত।

এই নিবন্ধ পি. কে. আই-এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা। পি. কে. আই মুখে পঞ্চশীল স্বীকার করে বটে, কিন্তু প্রকৃত পঞ্চশীলবাদী তারা নয়। পঞ্চশীলের প্রথম কথা ঈশ্বরে বিশ্বাস। কিন্তু পি. কে. আই-এর সভ্যেরা প্রকৃত কমিউনিস্ট হলে ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারে না।

সুবন্দ্রিয়ো তার জবাবে বললেন ঃ The time has now come to exterminate the capitalist-bureaucrats ইত্যাদি।

সুবন্দ্রিয়ো এবং পি. কে. আই-এর প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে সামরিকবাহিনী একদিকে রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্রচ্যুত হতে লাগল এবং অপরদিকে সমবেত বিরূপ সমালোচনায় সুকর্ণের কাছেও তারা সহানুভূতি হারাতে লাগল। জেনারেল নসুশানকে সামরিকবাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদ থেকে সরিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিযুক্ত করায় তিনি এত মর্মাহত হয়েছিলেন যে সামরিকবাহিনী এবং কেন্দ্রীয় সরকার দুই দিক থেকেই তিনি দূরে সরে গিয়েছিলেন। সামরিক কর্তৃপক্ষ নসুশানের কাছ থেকেও বিশেষ সাহায্য লাভ করছিল না। সেইজন্য সামরিক বাহিনী দেশের জনগণের সমর্থন লাভের চেষ্টা করতে লাগল। সে সুযোগও তাদের এসে গেল।

নাসাকোম সরকারের অন্যতম শরিক ধর্মীয় দল নাহদাতুল ইসলাম রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পি. কে. আই-এর সর্বাপেক্ষা শত্রু হয়ে দাঁড়াল। তার কারণ, কমিউনিস্টরা ধর্মে বিশ্বাসী নয় এবং এই দল ধর্মে বিশ্বাসী। পি. কে. আই এবং তার দলবল যেখানে সেখানে নাহদাতুল ইসলামের ওপর চড়াও হতে লাগল। পি. কে. আই-এর অভিসন্ধি বুঝতে পেরে এই দল পি. কে. আই-এর সবচেয়ে বড় শত্রু সেনাবাহিনীর দিকে ঝুঁকে পড়ল। সামরিকবাহিনীও তাদের সাহায্যে প্রতিশ্রুত হল।

সরকারের সমস্ত দায়িত্বশীল মন্ত্রীর পদ পি. কে. আই অধিকার করে, সরকারী বড় বড় পদে এবং বিশেষ করে পুলিশ দফতরে তারা তাদের দলীয় লোকদের বহাল করতে লাগল। এদের সহায়তায় তারপর পি. কে. আই গ্রামাঞ্চলে এক বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করল। গ্রামে গ্রামে গণ-আদালত বসিয়ে তারা জোর করে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই বেশি-কম ধন-সম্পদ লুট করে জায়গা-জমি দখল করে নিজেদের দলের লোকদের মধ্যে বিলি করতে লাগল। পুলিশের সাহায্য চেয়ে কোন ফল হত না, কারণ পুলিশের সম্মুখেই এই লুটপাট হত। পুলিশ ছিল নীরব দর্শক। জেলার শাসনকর্তারাও এই লুণ্ঠনকারীদের কিছু বলতেন না, কারণ এদের দলপতিরাই দেশের শাসনের কর্ণধার এবং দলপতিদের হাতেই তাঁদের চাকরি।

যার সামান্য একটু জমি, একটা ছোট বাড়ি আছে—পি. কে. আই-এর দলে না এলে সে-ই 'কাবির' (ক্যাপিট্যালিস্ট-বিরোক্রাট) বলে গণ্য হত। তাদেরই বলা হত মুনাফাখোর, রক্তচোষা! দেশের জনগণকে বঞ্চিত করে তারা জমি-বাড়ি করেছে! সুবন্দ্রিয়ো পরিচালিত দৈনিক সংবাদপত্র 'ইণ্ডোনেশিয়ান হেরাল্ড'-এর মতে লুণ্ঠনকারীদের এই কাজ হয়েছে "দেশাত্মবোধক কাজ" এবং সেইজন্য সরকার তাদের "উৎসাহ" দিচ্ছেন "to help the government to identify persons who had become rich at the expense of society." এই

সঙ্গে সরকার এই আশ্বাস দিলেন যে এই "কাবিরদের" আইনতঃ সবচেয়ে বড় দণ্ড অর্থাৎ মৃত্যু-দণ্ড দেওয়া হবে। কিন্তু যখন প্রশ্ন উঠল যে যদি এই ছোটখাটো চাষী—স্থকর্ণের ভাষায় যারা 'মহায়েন'—সত্যিকারের 'কাবির' হয় এবং লোককে ঠকিয়ে জমি আর বাড়ি করেছে, তবে তাদের দেশের বিচারালয়ে নিয়ে গিয়ে বিচার করা হয় না কেন? তার উত্তর হল: "Common people can do the job more efficiently." এই "common people" হল পি. কে. আই-এর সমর্থকেরা, আর কেউ নয়।

পি. কে. আই-এর সমর্থকদের এই অমানুষিক অত্যাচারে শঙ্কিত জনসাধারণ পুলিশী সাহায্যে বঞ্চিত হয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্য ভিক্ষা করল। সামরিক কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সেনাবাহিনীকে অত্যাচারীদের হাত থেকে অত্যাচারিতদের রক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। সেনাবাহিনীর তৎপরতায় পি. কে. আই সমর্থকদের অবাধ লুণ্ঠন অনেকাংশে ব্যাহত হতে লাগল। সামরিকবাহিনীর এই হস্তক্ষেপ পি. কে আইকে ক্রুদ্ধ করে তুলল এবং সর্বদিক দিয়ে এই দুই দলের মধ্যে বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাও বৃদ্ধি পেল।

কমিউনিস্ট এবং সামরিক বাহিনীর মধ্যে শক্তি-প্রয়োগের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটা গূঢ় কারণ ছিল।

প্রেসিডেন্ট স্থকর্ণের স্বাস্থ্য দিন দিন ভেঙে যাচ্ছিল। কিডনির অসুখ তাঁর বহুদিনের, কিন্তু ১৯৬৪ সনের প্রথম দিক থেকেই তাঁর এই অসুখ তাঁকে রীতিমতো কাবু করে ফেলে। তাঁর আত্মজীবনীতে এই সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন:

> চক্রবীরাওয়া (রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষীদল) শুধু যা রক্ষা করতে পারবে না, তা হয়েছে আমার স্বাস্থ্য। আমার একটা কিডনি হয়েছে পাথরের কল

এবং অপরটির ওপর আমার চিকিৎসকেরা এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দৃষ্টি রেখেছেন যেন তা অনুবীক্ষণের পরীক্ষায় রাখা হয়েছে।

এই সময় হঠাৎ একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে স্থকর্ণের মৃত্যু আসন্ন। তাঁকে ঘিরে সব সময়ে ডক্টর উ চিয়ে পিঙ-এর নেতৃত্বে একদল চীনা ডাক্তার। এত বড় বিদেশী ডাক্তারের দল দেখে দেশের লোকদের মধ্যে নানাকথা কানাকানি হতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত সকলে নিঃসন্দেহ হল যে বুঙ্গ কর্ণের দিন ঘনিয়ে এসেছে।

স্থকর্ণ কিন্তু বহাল তবিয়তে বেঁচে রইলেন। এই গুজবগুলোতে তিনি একেবারেই কান দিতেন না। কিন্তু তবু দিন দিন শরীর তাঁর ভেঙে পড়ছিল। সরকারী কোন সংবাদে তাঁর অসুস্থতার কথা ঘোষণা করা হত না, কারণ অসুস্থতার কথা স্বীকার করে যাবজ্জীবন প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরে দাঁড়াতে স্থকর্ণ একেবারেই ইচ্ছুক ছিলেন না।

১৯৬৪ সনের ১৩ই ডিসেম্বর জাকর্তার রেডিও হঠাৎ ঘোষণা করল যে প্রেসিডেন্ট স্থকর্ণ সত্যিকারের অসুস্থ।

এই সরকারী সংবাদে দেশের বিভিন্ন দলে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। এতদিন পরে তাঁর অসুস্থতার গুজবের সমর্থন তারা পেল। জনসাধারণ তাদের 'বাপক'-এর নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা করতে লাগল এবং রাজনৈতিক দলগুলি ও সামরিকবাহিনী নিজেদের মধ্যে জল্পনা কল্পনা করতে লাগল যে স্থকর্ণের মৃত্যুর পর কে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট হবেন এবং কোন্ রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন হবে। এই স্থযোগ ত্যাগ করতে কোন দলই চাইল না। পি. কে. আই একদিকে এই ক্ষমতা অধিকারের জন্য যেমন তৈরি হতে লাগল, ঠিক সেইরকমই সামরিকবাহিনীও তাদের এই কাজে বাধা দেবার জন্য ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হতে লাগল।

কিন্তু এই দুই দলের লড়াইয়ের মাঝখানে হঠাৎ আর এক দাবীদার এসে দেখা দিলেন। তিনি হলেন চইরুল সালে, নাসাকোম সরকারের

তৃতীয় উপ-প্রধান মন্ত্রী। এই সুযোগ হস্তচ্যুত হলে জীবনে আর কখনও তিনি দাঁড়াতে পারবেন না। সেইজন্য প্রথম উপ-প্রধান মন্ত্রী সুবন্দ্রিয়ো কিংবা আইদিতকে তিনি কিছুতেই প্রেসিডেণ্ট হতে দেবেন না। রাষ্ট্রদ্রোহে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ইউরোপে ঘুরে বেড়ানোর সময় তাঁকে এক জার্মান গণৎকার বলেছিলেন যে তিনি দেশে ফিরে গিয়ে আবার হৃত-গৌরব ফিরে পাবেন এবং উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হবেন। আর অন্তত একদিনের জন্যও তিনি দেশের সবচেয়ে গৌরবের পদে অধিষ্ঠিত হবেন।

এই ভবিষ্যদ্‌বাণীতে উল্লসিত হয়ে চইরুল সালে সুকর্ণের বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ করে ইউরোপে তাঁর গুণকীর্তন করে বেড়াতে লাগলেন। তার-পর সুকর্ণের ক্ষমা ভিক্ষা করে দেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন তিনি। সুকর্ণ তোষামোদে গলে গেলেন, চইরুলকে দেশে ফিরে আসার অনুমতি দিলেন এবং অনুতপ্ত চইরুলকে তাঁর স্নেহপক্ষ-পুটে আশ্রয় দিলেন। এখানেই কাহিনীর শেষ নয়। ১৯৫৭ সনে সুকর্ণ চইরুলকে মন্ত্রীপদেও উন্নীত করলেন এবং শেষ পর্যন্ত আইন-সভার চেয়ারম্যান নিযুক্ত করলেন। ১৯৪৫ সনের সংবিধানমতে এই পদটি দেশের সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক। জার্মান গণৎকারের প্রতিটি ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হল।* নাসাকোম সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে চইরুল সালে হলেন অন্যতম উপ-প্রধানমন্ত্রী—প্রধানমন্ত্রী কেউ ছিল না। মন্ত্রীদের মধ্যে পদ-মর্যাদায় তৃতীয়—প্রথম সুবন্দ্রিয়ো, দ্বিতীয় লেইমিনা, তৃতীয় তিনি।

সুকর্ণের এই আকস্মিক চইরুল-প্রীতির মধ্যেও কুটনীতি খেলা করছিল। চইরুল ছিলেন ট্রটস্কী-পন্থী কমিউনিস্ট। রুশপন্থী কমিউনিস্ট আইদিত পরিচালিত পি. কে. আই-এর গাত্রদাহের জন্যই চইরুলকে তাঁর এত খাতির করা।

* সেই জার্মান গণৎকার আর একটি ভবিষ্যদ্‌বাণীও করেছিলেন। বহু রক্তপাতের পর চইরুলের বন্দী অবস্থায় মৃত্যু হবে। এটিও মিথ্যা হয় নি।

সুকর্ণের অসুস্থতার সংবাদ সরকারীভাবে প্রকাশিত হওয়ামাত্র চইরুল তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। সুকর্ণ জীবিত থাকতে থাকতেই তাঁর আশীর্বাদ লাভ করে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পথ সুগম করতে হবে। সুবন্দ্রিয়ো এবং পি. কে. আই-এর আইদিত তাঁর প্রধান প্রতি-দ্বন্দ্বী। এই দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করার জন্য তাঁর চাই একটি রাজনৈতিক দল, যে রাজনৈতিক দল সুকর্ণের সহজেই আশীর্বাদ লাভ করবে এবং সুকর্ণের নাম ভাঁড়িয়ে জনসাধারণকেও বেশ সহজেই তার আওতায় নিয়ে আসা যাবে। সুতরাং চইরুল সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন। এই দলের নাম হল 'দি বডি ফর দি প্রোমোশন অব সুকর্ণ-ইজ্‌ম্' বা বি. পি. এস। তাঁর এই নতুন দলের উদ্দেশ্য হলঃ বুঙ্গ কর্ণের চিন্তাধারা এবং তাঁর নীতি প্রচার করা এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবের হৃদয়ে এমনভাবে অঙ্কিত করা যাতে সুকর্ণের মৃত্যুর পরও তা উজ্জ্বল হয়ে থাকে। তিনি আরও ঘোষণা করলেন যে তাঁর দলের নীতি সম্পূর্ণ কমিউনিস্ট-বিরোধী হবে।

সুকর্ণ সানন্দে এই নতুন দলকে তাঁর আশীর্বাদ জানালেন।

কিন্তু পি. কে. আই এই দলের প্রতিষ্ঠায় ঘোরতর আপত্তি জানাল। চইরুল সালের এই হঠাৎ সুকর্ণ-প্রীতি তাদের কাছে অত্যন্ত সন্দেহজনক মনে হল। চইরুল সালেকে কোনমতেই বাড়তে দেওয়া যায় না।

মন্ত্রীসভার অধিবেশনে ১৯৬৫ সনের জানুয়ারি মাসে আইদিত দাবী জানালেন যে এই প্রতি-বিপ্লবী বি. পি. এস-কে নিষিদ্ধ করতে হবে, কারণ এই দলটির লক্ষ্য কমিউনিস্ট-বিরোধী।

সুকর্ণ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—যদি বি. পি. এস-কে নিষিদ্ধ করতে হয়, তবে আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলকেই নিষিদ্ধ করে দেব। আমি কারুর দাবীর জুলুম সহ্য করতে পারি না।

আইদিত সুকর্ণের কাছে তাঁর উথাপিত প্রস্তাবের জন্য ক্ষমা চাইলেন এবং এ প্রসঙ্গ সেদিন ধামা চাপা পড়ে গেল। কিন্তু সকলেই জানত

যে আইদিত এত সহজে ক্ষমা প্রার্থনা করেন না এবং এত সহজে নিজের দাবী ত্যাগ করেন না।

কিন্তু পরদিন ভোরবেলায় কোন বড় শহরের দেয়াল আর ফাঁকা রইল না। প্রতিটি বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে কালো কালি দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা :

গঞ্জাঙ বি. পি. এস.
গাণ্টুঙ বি. পি. এস.
বি. পি. এস. কোণ্ট্রা-রেভোলুসি।

তারপরের দিন প্রতিটি বড় বড় রাস্তার কালো পিচের ওপর সাদা রঙে আবার ওই কথাগুলি লেখা। তারপর দিন পোস্টার আর ব্যানারে দেশ ভরে গেল। প্রতিটিতে লেখা :

হিদুপ পি. কে. আই.
বুরবাকন বি. পি. এস.
গাণ্টুঙ বি. পি. এস.
হিদুপ সুকর্ণ
গঞ্জাঙ বি. পি. এস.

এর পর থেকে প্রতি শহরে শহরে মিছিল ঘুরে বেড়াতে লাগল। শহরে শহরে সভা বসল। কল-কারখানায় ধর্মঘট। সকলের দাবী—বি. পি. এস-কে নিষিদ্ধ করতে হবে। বি. পি. এস কোণ্ট্রা-রেভোলুসি।

প্রতিদিন এই বিক্ষোভ সুকর্ণ আর সহ্য করতে পারলেন না। বাধ্য হয়ে বি. পি. এস-কে নিষিদ্ধ করলেন। পি. কে. আই-এর জয় হল।

সুকর্ণের অসুস্থতার সংবাদে তাই প্রতিটি রাজনৈতিক দলই শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। সুকর্ণের মৃত্যুর পর সুবন্দ্রিয়ো প্রেসিডেন্ট হতে পারেন—এই তাদের সকলের আশঙ্কা। এ-ও হয়তো হতে পারে যে বেঁচে

থাকতে থাকতেই সুকর্ণ তাঁর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন সুবন্দ্রিয়োকে প্রেসিডেণ্ট করে দেবেন। রাজনৈতিক দলগুলির সুবন্দ্রিয়োকে যতটা না ভয়, তার চেয়েও বেশি ভয় পি. কে. আই-কে। পি. কে. আই-এর হাতের পুতুল সুবন্দ্রিয়ো নিজের ক্ষমতা রাখার জন্য পি. কে. আই-এর সমস্ত নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য হবেন এবং পি. কে. আই-এর প্রথম কাজ হবে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে খতম করা। কোনও কমিউনিস্ট দেশেই সরকারী কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নেই। সুতরাং পি. কে. আই ক্ষমতাসীন হলে আর কোন রাজনৈতিক দল বা অন্য কোন দলের রাজনীতিক আর ইন্দোনেশিয়ায় থাকবে না।

এদিকে ইন্দোনেশিয়া চরম অর্থনৈতিক দুর্দিনে পড়েছে। চারদিকে খাদ্যাভাব অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে, প্রতিটি জিনিসের দাম দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ঘরে ঘরে হাহাকার, ঘরে ঘরে উপবাস। চাষীরা গ্রাম ছেড়ে দলে দলে শহরে এসে দাবী জানাল মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে, চাইল এই চরম দুর্দিনে সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য। টাকার মতো "mundane" জিনিস নিয়ে সুকর্ণের মাথা ঘামানোর সময় কোথায়? মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার ক্ষমতা তাঁর কোথায়? তবুও সুকর্ণ দীর্ঘ বক্তৃতায় তাদের আশ্বাস দিয়ে জানালেন:

> দ্রব্যমূল্য হ্রাস করার ব্যাপারে উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্যতালিকার পরিবর্তন, ঠক-জোচ্চোরদের ধ্বংস এবং নেকোলিম প্রভৃতি যুক্ত। মহান্ বিপ্লবের প্রধানস্তম্ভ হিসেবে চাষীরা সব সময়েই বিপ্লবের প্রথম সারিতে থাকবে।

চাষীরা যা চেয়েছিল তা পেল না, শুনল বড় বড় কথা। আইদিত অবশ্য তাদের সমস্যার কিছুটা সমাধান করতে পেরেছিলেন। ক্ষেত-খামারে ইঁদুরের উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় চাষীরা সরকারী সাহায্য চাইলে আইদিত উত্তর দেন:

চাষীরা যদি আগ্রহের সঙ্গে ইঁদুর ধরে খেতে শুরু করে তবে শুধু যে দেশ থেকে ইঁদুরের দৌরাত্ম্যই কমে যাবে তা নয়, দেশে ইঁদুরের ঘাটতিও পড়বে।

কিন্তু জনসাধারণের জীবন নিয়ে এই হাসিখেলা দূর হয়ে গেল যখন পি. কে. আই জানতে পারল যে ৫ই অক্টোবর সামরিকবাহিনী বিংশ প্রতিষ্ঠা দিবসের জন্য কুচকাওয়াজ করতে প্রস্তুত হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে পি. কে. আই-এর কার্যপদ্ধতি পরিবর্তিত হল। সামরিক-বাহিনী আঘাত হানার আগেই তাদের আঘাত হানতে হবে। সেইজন্য দলীয় লোকদের প্রস্তুত করতে হবে, জনসাধারণকে সামরিকবাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে হবে এবং সুকর্ণের শাসন-অবসানের জন্য ক্ষেত্রও প্রস্তুত করতে হবে।

সুতরাং শহরে, গ্রামের দেয়ালে দেয়ালে দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষিত হল। সুকর্ণের সঙ্গে আঁতাতের পর আট বছরের মধ্যে এই প্রথম পি. কে. আই-এর মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন। সঙ্গে সঙ্গে শহরে শহরে পি. কে. আই এবং তাদের যুব-গোষ্ঠী পেমুদা রাকিয়ত, নারীসঙ্ঘ গেরওয়ানি পথে ফেস্টুন, ব্যানার আর প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিল করে স্লোগান দিয়ে বেড়াতে লাগল। তাদের দাবী :

মূল্যবৃদ্ধি রোধ কর, নয়তো সুকর্ণ গদী ছাড়ো।
নেকোলিম কাবিরদের খতম কর, নয়তো সুকর্ণ গদী ছাড়ো।
আবরি কাবির। (সেনাবাহিনী ক্যাপিট্যালিস্ট ব্যুরোক্র্যাট)।
গান্টুঙ আবরি, হিডুপ পি. কে. আই।
গঞ্জাঙ আবরি, হিডুপ পি. কে. আই।

আট বছরের মধ্যে এই প্রথমবারই সুকর্ণকে হিডুপ করতে ভুলে গেল পি. কে. আই। এই ভুলের মধ্যে গভীর অর্থ যে লুকোনো ছিল, সে কথা তখনও কেউ বুঝতে পারে নি।

বিরাট বড় বড় জনসভায় এবার বক্তৃতা দিতে লাগলেন সুবন্দ্রিয়ো,

আইদিত, লুকমান, নিয়োতো, নয়নো এবং অন্যান্য পি. কে. আই নেতৃবৃন্দ।

জনসাধারণকে ইঁদুর খেতে যিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, সেই আইদিত বললেন :

> The task of the working class at a time like this, when prices are rising and the situation is bad, is to step up the revolutionary offensive in all fields and develop the revolutionary situation towards its peak and thereby cut out the cancer from the body of the Indonesian Revolution.……
>
> The only way to solve the present economic crisis is by way of operating on the cancer of society—namely the capitalist bureaucrats, economic adventures and corruptors known as the three evils of the cities. These three groups constitute the parasite of the fertile tree of the Revolution with its thick foliage. These three evils must be eliminated from the leadership of the State apparatus, politics and culture.

আর সুবন্দ্রিয়ো হুঙ্কার দিলেন :

> জনগণের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা দিতে হবে এবং কলুষকারীদের ধ্বংসের ভার আপনাদের নিজেদের হাতেই তুলে নিতে হবে।…
>
> যারা যারা আমাদের বিপ্লবের ধারা অনুসরণ করতে পারে নি, তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া জনসাধারণের কর্তব্য।

এই সঙ্গে পি. কে. আই সারা ইন্দোনেশিয়ায় গুজব ছড়িয়ে দিল যে সেনাপতিরা 'দেওয়ান জেনারেল' গঠন করে সি. আই. এ-র সাহায্যে

সুকর্ণের হাত থেকে শাসনভার ছাড়িয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করছেন। আমেরিকার সেভেন্‌থ্‌ ফ্লিট ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্রে অপেক্ষা করছে। শুধু কেউই সঠিক জানাতে পারল না যে সামরিক অভ্যুত্থানের দিন কবে?—সামরিকবাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবস ৫ই অক্টোবর-এ, না ১০ই নভেম্বর শহীদ দিবসে?

২৫শে সেপ্টেম্বর সরকারী সংবাদ প্রতিষ্ঠান আন্তারা ঘোষণা করল :

> জাকর্তা-রায়া পুলিশ প্রতিটি থানা চব্বিশ ঘণ্টা খুলে রেখে দেশের শত্রু ক্যাপিট্যালিস্ট বুরোক্র্যাট প্রভৃতিদের দেশের শত্রুতামূলক সমস্ত কাজের সংবাদ জনগণের কাছ থেকে গ্রহণ করবে। নাসাকোম নেতৃবৃন্দ দেশের জনসাধারণের কাছে শুধু একটা প্রশ্নই করছেন—এই শত্রুদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে আমরা এখনও অপেক্ষা করছি কেন? এই প্রশ্নের অর্থ যেন যুবকেরা মনে করে যে সমগ্র দেশব্যাপী সম্মিলিত বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে এই শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং বিপ্লবের অকুণ্ঠ সমর্থক পুলিশ ও সরকারী উকিলদের সাহায্য করার জন্য আদেশ এবং এই সব দুষ্কৃতকারীদের যেন ফাঁসিতে লটকিয়ে দেওয়া বা সকলের সামনে গুলি করে মারা হয়।

এই হল পি. কে. আই-এর মনোভাব। সামরিকবাহিনীরাই 'কাবির' বা ক্যাপিটালিস্ট বুরোক্র্যাট। তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য পি. কে. আই জনগণকে আহ্বান জানাল।

সামরিকবাহিনীও নীরব ছিল না। বিখ্যাত সিলিওয়াঙ্গি বাহিনীর সেনাপতি জেনারেল ইব্রাহিম আজি সদম্ভে ঘোষণা করলেন :

> এর আগেও কামউনিস্টদের খতম করেছি। প্রয়োজন হলে আবার তাদের খতম করব।

সুকর্ণের ডান ও বাম হাত—পি. কে. আই এবং সামরিকবাহিনী—সামনাসামনি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হল। প্রথম আঘাত হানবে কে এবং কবে?

১৮

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫।

এত সুন্দর সকাল আমি যেন অনেকদিন দেখি নি। এমন সুন্দর নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা-ও অনেকদিন আমার চোখে পড়ে নি। মনে হচ্ছিল, যেন এই জাকর্তার চৌহদ্দি পার হয়ে গেলেই আমি দিগন্তপ্রসারী ধানক্ষেতে রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরি খেলা দেখতে পাব। এ যেন বাঙলা দেশের সোনার শরৎ এদেশে হেসে ভেঙে পড়েছে।

সিণ্টার বাড়ির ছাদে বসে বসে এই নির্মল সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম, কিন্তু মনের কোণে একটি বেদনা ধীরে ধীরে জমা হচ্ছিল। আবার নতুন করে আমার দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা জেগে উঠতে লাগল। এখন ফিরে যাওয়া হয়তো খুব কঠিন নয়। অন্ততঃ সিণ্টা আর সুমাত্রোর কথাবার্তা শুনে তাই মনে হয়।

বোধহয় সেইজন্যই এই সকালটাকে এত ভাল লাগল। এ যেন এক নতুন দিন: আমার এক নতুন জীবনের সন্ধান নিয়ে এল। ইন্দোনেশীয়রা তাদের মায়াবাদী ঐতিহ্য আজও কাটিয়ে উঠতে পারে নি, আজও তারা সকলেই মায়াবাদীদের মতো প্রতীকে বিশ্বাস করে। এদের মাঝে থেকে আমারও কি প্রতীকে বিশ্বাস এসে গেল? নয়তো কেন এই সুন্দর সকাল দেখে আমার দুঃখের দিন কেটে গেল বলে মনে হচ্ছে?

দিন সাতেকও হয় নি, অথচ ইন্দোনেশিয়ার সামগ্রিক রূপ কেমন বদলিয়ে গিয়েছে! বুঝতে পারি না এ দেশের লোকদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়! এরা কি কলের পুতুল যে চাবি ঘুরিয়ে কল টিপে যখন যেদিকে খুশি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়?

দিন সাতেক আগে পর্যন্ত এদের ভারত-বিদ্বেষ দেখে শঙ্কিত এবং স্তম্ভিত হয়েছি। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' আর 'ভারত মুর্দাবাদ' ছাড়া আর যেন জপমন্ত্র ছিল না। খবরের কাগজ, রেডিও, মিছিল, সভা-সমিতি—সর্বত্রই এক কথা: ভারতবর্ষীয় অফিস, দোকানপাট—সব কিছু লুটপাট তছনছ কর। সমস্ত ভারতবাসী বাড়ির দরজা জানলা বন্ধ করে ভিতরে বসে আছে, পথে বেরুতে সাহস নেই। সেই একই ভয়ে আমিও আজ সিণ্টার বাড়িতে আত্মগোপন করে আছি।

অথচ এই ভারত-বিদ্বেষ বান হঠাৎ যেমন এসেছিল, হঠাৎই আবার কখন চলে গেল। খবরের কাগজ খুঁজে ভারত-পাকিস্তানের সংবাদ কোন এক কোণায় পাওয়া যায়। অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ার জীবনে ভারত আর পাকিস্তান এখন এক পরিত্যক্ত সাইডিং-এ পড়ে আছে, যেন লাইনে বড় কোন গাড়ি এসে ভিড়বে। তারই আবাহনে আজ খবরের কাগজ সরগরম হয়ে উঠেছে।

এই কয়দিন ধরে প্রতিদিনই দেখেছি দলে দলে মিছিল চলেছে স্লোগান দিতে দিতে: জিনিসপত্রের দাম কমাও। জনগণের শত্রুদের ফাঁসি দাও নয়তো স্থকর্ণ গদী ছাড়ো। খবরের কাগজে পড়ছি, রেডিওতে শুনছি: কমিউনিস্ট নেতারা পাঁচ বছর মন্ত্রিত্বের পরে হঠাৎ জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্যদশায় সচেতন হয়ে উঠেছেন। ১৯৬০ সনে ডিমের জোড়া যেখানে চার রূপিয়া ছিল এখন এঁদেরই কৃতিত্বে দাঁড়িয়েছে সাড়ে তিনশ রূপিয়াতে। এতদিন পরে তাই তাঁদের কণ্ঠই সবচেয়ে উচ্চগ্রামে বাঁধা।

দলে দলে নেতারা ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপে দ্বীপে মিছিল নিয়ে বেড়াতে লাগলেন, শহরে শহরে সভা করে বেড়াতে লাগলেন। সকলের একই বক্তব্য: দাম কমাও। সি. আই. এ-র সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নেকোলিমরা দেশের সমস্ত জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে। এই নাসাকোম সরকারেও রয়েছে যত নেকোলিম আর সি. আই. এ.-র দালাল।

তেস্তারাতেও (সৈন্যবাহিনী) আজ নেকোলিমরা ভিড় করেছে। অতএব হে দেশবাসী, এই নেকোলিম থেকে সাবধান। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত —নেকোলিম ষড়যন্ত্র ব্যর্থ কর, সকলেই প্রস্তুত থাকো, দেশের নেতারা ডাক দিলে সকলে শত্রুদমনে বেরিয়ে পড়।

কাল পর্যন্ত সংবাদ-পত্রের পাতায় ছিল এই সংবাদ। সুবন্দ্রিয়োর প্রেরণায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং পি. কে. আই-এর বিরুদ্ধবাদী কমিউনিস্ট নেতা চইরুল সালে যে হঠাৎ চীন-যাত্রা করলেন, এ সংবাদ খবরের কাগজের অন্যান্য সংবাদের তলায় চাপা পড়ে গেল।

কাল দুপুরে হঠাৎ ধূমকেতুর মতো উদয় হয়েছিল হরাতোনো।

সুমাত্রো এখানে আসার পর থেকে হরাতোনো এ বাড়িতে আসা ছেড়ে দিয়েছিল। সুমাত্রোর মতে হরাতোনো এখন পাকা বদমাইস হয়ে পড়েছে। চাকরি বা ব্যবসা করবে না, দেশের কাজও করবে না, দল বেঁধে গুণ্ডামি করে বেড়াবে। সুমাত্রো হয়তো তার অনেক কথা জানে সেইজন্যই হয়তো সুমাত্রোকে তার ভয়। একদা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা সুমাত্রো ভবিষ্যতে জনগণের বিভীষিকা হয়ে ওঠে নি বলে হয়তো এখনও সাধারণ লোকের মনের কোণায় তার জন্য শ্রদ্ধার আসন আছে—এ কথা সে জানে বলেই হয়তো হরাতোনো সুমাত্রোকে ভয় করে।

কিন্তু কাল সে যখন এ বাড়িতে এসেছিল তখন সুমাত্রো বাড়িতেই ছিল।

সিণ্টাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—তোমার ওই নেকোলিম শয়তানটা কোথায়? হোটেলে কয়েকদিন খোঁজ করেছি, শুনলাম চলে গেছে। এপাশ ওপাশ খোঁজ করেছি—কোথাও পেলাম না।

সিণ্টা উত্তর দিয়েছিল—হয়তো দেশে ফিরে গেছে।

দেশে ফিরে গেছে!—হুঙ্কার দিয়ে উঠল হরাতোনো,—খোঁজ নিয়েছি, প্লেনে করে যায় নি। কোথায় ওকে লুকিয়ে রেখেছ বল?

এবারে সুমাত্রো তাকে প্রশ্ন করেছিল—কার কথা জিজ্ঞাসা করছ ?
তুমি যেন কিছু জানো না।—বেঁকিয়ে উত্তর দিল হরাতোনো—একটা স্পাইকে লুকিয়ে রাখার শাস্তি তোমাকেও পেতে হবে, মাতোরো। আজ তোমার বাড়ি খুঁজে দেখব—যদি তাকে এখানে পাই তবে তোমাদের কারুর নিস্তার নেই।
সংযত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল সুমাত্রো—আর একটা কথা যদি বল তো এক চড়ে তোমার গাল উড়িয়ে দেব। আর এই মুহূর্তে যদি বাড়ি থেকে বেরিয়ে না যাও তো গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেব।
হরাতোনো উঠে চলে যেতে যেতে বলেছিল—আচ্ছা, আমিও দেখে নেব।
সুমাত্রো এ খবর আমাকে দেয় নি, সিণ্টাই বলেছিল। হরাতোনোর এই অধঃপতন সে যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারে নি। দশ এগারো বছর বয়স থেকে তরুণ হরাতোনোকে সে দেখছে—তারুণ্য ও প্রথম যৌবনের তার শৌর্য, বীর্য ও ত্যাগ সিণ্টাকে মুগ্ধ করেছিল। তার যৌবনের স্বপ্ন তাই ছিল হরাতোনো। হরাতোনোকে নিয়ে ঘর বাঁধবার স্বপ্নও তাই সে বারবার দেখে এসেছে। দেশ-সেবক হরাতোনো যাতে অর্থের চিন্তায় আদর্শচ্যুত না হয় সেইজন্যই সিণ্টা অর্থ উপার্জনে বেরিয়ে পড়ে। প্রথমে সুমাত্রায় শিক্ষকতা, সেখান থেকে সিঙ্গাপুরে। শিক্ষিকার আর উপার্জন কত, কিন্তু হরাতোনোর প্রয়োজন অনেক বেশি। তাই সিণ্টা বেছে নিয়েছিল চিত্র-জগৎ।
প্রচুর অর্থ উপার্জন করে এবং ভবিষ্যতে প্রচুর অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা নিয়ে সিণ্টা যখন দেশে ফিরল তখন তার স্বপ্নের হরাতোনো এক অপরিচিত শয়তানে রূপান্তরিত হয়েছে।
কাল বিকেলে কিমও এসেছিলেন এখানে। জানিয়ে গেলেন যে হরাতোনো তাঁর বাড়িতেও গিয়েছিল এবং আমার সম্বন্ধে নানারকম

প্রশ্ন করেছিল। তাঁর বাড়িও খুঁজে দেখতে চেয়েছিল যে আমি সেখানে লুকিয়ে আছি কিনা। আমাদের তিনি কয়েকটা দিন সাবধানে থাকতে বললেন। ইতিমধ্যে তিনি আমার ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবেন।

আজ তিরিশে সেপ্টেম্বর—কথাটা বারবার শুধু মনে হতে লাগল। কাল পয়লা অক্টোবর, কয়েকদিন পরেই দুর্গাপূজা। সে সময়েও যদি কলকাতায় ফিরতে পারি!

এই সুন্দর শরতের সকাল যেন আমার মনের আশায় রঙ ধরিয়ে দিল। যতই বেলা বাড়তে লাগল ততই আমার বিশ্বাস সুদৃঢ় হতে লাগল। আজ আর পথেঘাটে মিছিল নেই, আজ আর পথের মোড়ে মোড়ে ছোট জনতা সৃষ্টি করে নেকোলিমদের সম্বন্ধে সচেতন করে বক্তৃতা নেই। সুমাত্রো বাজার থেকে ফিরে এসে আর এক আশ্চর্য কথা শুনিয়ে দিল—দেয়ালে দেয়ালে লেখা স্লোগানের ওপর দিয়ে কাল রাতে কারা যেন চুনকাম করে দিয়ে গেছে! একটা বা দুটো বাড়িতে নয়—বড় রাস্তার ওপরে সব কটা বাড়িতেই চুনের পোঁচড়া।

সুমাত্রো বলল—বাইরের থেকে বড় কেউ হয়তো এখানে আসছেন, তাই বাড়ির নতুন অঙ্গসজ্জা।

সিণ্টা বলল—এর আগে কি কখনও এরকম হয়েছে? জাকর্তায় তো বড় বড় লোক কম আসেন নি। চুনকাম করতে গেল কে, খরচই বা দিল কে? আমার কিন্তু ব্যাপারটা ভাল মনে হচ্ছে না।

সুমাত্রো উত্তর দিল—আমারও হচ্ছে না। তবে খারাপ কিছু না মনে করে এ-ও হতে পারে যে হয়তো পুলিশ এই ব্যবস্থা করেছে, কিংবা কর্পোরেশন—

এইটাই আজকের সবচেয়ে বড় খবর এবং আশ্চর্যেরও। এই ঘটনাটি যেমন আকস্মিক সেইরকম রহস্যজনক। ইন্দোনেশিয়ার মেজাজ আমি

যতটুকু জানি তাতে এই ব্যাপারটি শুধু রহস্যজনক নয়, আশঙ্কাজনকও বটে। নতুন কোন দেয়ালের লিখনের জন্য প্রস্তুতি।

এই কথাই আমি সারা দুপুর ধরে ভেবেছি। অথচ অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্যে পড়ে নি। জাকর্তার বুকে এতটুকু চাঞ্চল্য জাগে নি—খরস্রোতা নদী যেন হঠাৎ একদিনে বদ্ধ জলায় পরিণত হয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিক মানুষের কাছে এই ঘটনাই ভীতিকর ; অথচ সিণ্টা কিংবা সুমাত্রোকে আমি এতটুকু চিন্তিত হতে দেখি নি। ইন্দোনেশিয়ার চরিত্রই এই—অসীম নির্লিপ্ততা।

বেলা তিনটে নাগাদ চা নিয়ে সিণ্টা এল। বসে বসে হরাতোনোর সম্বন্ধে অনেক কথা বলে গেল।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম—হরাতোনো আমার খোঁজ করেছিল কেন ?

উত্তর দিয়েছিল,—আপনি চলে গেছেন কিনা হয়তো সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে চায়।

—কেন ?

কেন আবার ? —বলেই সিণ্টা হেসে ফেলল। —ও আপনাকে ভয় করে।

—ভয় ?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ—মাথা ঝাঁকি দিয়ে বলে উঠল সিণ্টা,—আপনি যদি আমাকে নিয়ে পালিয়ে যান !

আমি সিণ্টার মুখের দিকে তাকালাম। ঠিক এ ধরনের কথা তার কাছ থেকে আশা করি নি।

সিণ্টা সেইভাবেই বলল—আমার জন্য ওর ভাবনা নেই, ওর ভাবনা আমার টাকার জন্য। এখানে আমি ফেরার পর থেকে ও শুধু আমাকে জিজ্ঞাসা করে চলেছে—আমি কত রোজগার করেছি, কত টাকা আমার আছে—এই সব। আমার সম্বন্ধে ওর একটা প্রশ্ন নেই। অথচ জানেন—এই রাতোনোর জন্যই—

সিণ্টা চুপ করে গেল। আমি তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। সিনেমার নায়িকার খোলস থেকে বেরিয়ে এই গৃহস্থ মেয়েটিকে আমি যেন আবার নতুন করে দেখতে পেলাম। ওর মুখের রঙ থেকে থেকেই যেন বদলাতে লাগল।

সিণ্টা বলতে লাগল—টাকা নিয়ে আমি কি করব? টাকা রোজগার করতে আমার ভাল লাগে না। আমি ঘরে থাকতে চাই, ঘর বাঁধতে চাই—অনটনের মধ্যেই হোক, সুখে স্বাচ্ছন্দ্যেই হোক—আমি সুখী হতে চাই। হরাতোনো সেরকম লোক নয়, হরাতোনো আমাকে ভালবাসে না। আমাকে কেউ ভালবাসে না। অথচ আমি—

কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতা।

আবার সিণ্টা বলল—আপনি তো বিয়ে করেন নি। এত বয়স হলো, তবু বিয়ে করেন নি—কেন? কাউকে ভালবেসেছিলেন কি?

চুপ করে রইলাম।

—সে বিয়ে করেছে?

—জানি না।

—বেঁচে আছে?

—জানি না।

একেবারে গা ঘেঁষে সিণ্টা বসে পড়ল। বলল—কিছু মনে করবেন না, আমার জানতে ইচ্ছা করছে ওর নাম কি? কোথায় থাকে?

এবারে উত্তর দিলাম—তার নাম নাজমা, থাকত অনেক দূরে—প্যালেস্টাইনে।

সিণ্টার মুখ হঠাৎ যেন পাংশু হয়ে গেল, তারপর আমার ডান হাতটা তার হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল।

আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল—খোঁজ করেন নি কেন? তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল—নাজমাকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছা করছে। আমার চেয়েও কি দেখতে সুন্দর?···নাজমা কত ভাগ্যবতী!

আমি সিণ্টার মুখের দিকে তাকালাম। সিণ্টা চোখ ফিরিয়ে নিল না, হাতের মুঠো আলগা করল না। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল—আমি খুব খুশি হয়েছি। আমার এতটুকু দুঃখ হচ্ছে না, এতটুকু হিংসে হচ্ছে না। যা পেয়েছি তা-ই কম কি ?

সামান্য কয়েক ঘণ্টায় কী বিরাট পরিবর্তন !

কাল রাতে শুয়েছি, আর আজ সকালে উঠেছি—এর মধ্যে জাকর্তার চেহারা একেবারে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। পথে যারা বেরিয়েছিল তারা দৌড়োতে দৌড়োতে বাড়িতে ফিরে আসছে। দুমদাম দরজা বন্ধের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কোন বাড়ির রাস্তার দিকের একটা দরজা খোলা নেই, একটা জানলা খোলা নেই—পথে একটা লোক নেই।

সুমাত্রোও বাজারে বেরিয়েছিল। সে ও পড়ি-মরি করে ছুটে এসেছে বাড়িতে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—সর্বনাশ হয়েছে। মিলিটারি—চারদিকে শুধু মিলিটারি—বন্দুক নিয়ে, মেশিন গান নিয়ে। কাউকে রাস্তায় বেরুতে দিচ্ছে না—

আমি আর সিণ্টা একই সঙ্গে বলে উঠলাম—মিলিটারি !

হ্যাঁ—উত্তর দিল সুমাত্রো,—মিলিটারিরা বাপক কর্ণর হাত থেকে শাসনক্ষমতা ছাড়িয়ে নিয়েছে। হ্যাঁ—ক্যু—

সিণ্টা বলল—কি হবে ?

সামরিক বাহিনী আর সুকর্ণ এবং তাঁর নাসাকোম সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা আমি জানতাম, কিন্তু ঠিক এভাবে—এত তাড়াতাড়ি—আমি কল্পনাও করতে পারি নি।

সিণ্টা প্রশ্ন করল—বাপক কোথায় ?

—কেউ জানে না, কেউ কিছু বলতে পারছে না—

কালকের দেয়ালের চুনকামের সঙ্গে এই ব্যাপারের কোন সম্বন্ধ আছে কি না বুঝতে পারলাম না। সামরিক অভ্যুত্থান যদি সফল হয়ে থাকে তবে কি যে হবে—

কলকাতার দেয়ালের লেখার ব্যাপার আমার জানা ছিল। এত বড় কাণ্ড যখন ঘটে গেল তখন দেয়ালেও নিশ্চয়ই তার লিখন দেখা যাবে। সামরিকবাহিনীর অভ্যুত্থান যদি হয় তবে সাদা দেয়াল আপাততঃ সাদা থাকবে, কিন্তু কোন রাজনৈতিক দল যদি এর মধ্যে লিপ্ত থাকে —তবে তাদের ভাষ্য দেয়াল ধারণ করবেই।

এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য সুমাত্রোকে প্রশ্ন করলাম—দেয়ালগুলো কি এখনো সাদা আছে ?

না,—চমকে উঠল সুমাত্রো। বলল—সাদা চুনকামের ওপর নানারকম স্লোগান লিখে রেখেছে। বেশির ভাগই 'গঞ্জাঙ আবরি,' 'হিতুপ উন্টুঙ্গ', 'গঞ্জাঙ সি. আই. এ.' আর 'হিতুপ কনসিল রেভলুসি' লেখা।

আমার কাছে ব্যাপারটা একটু একটু করে পরিষ্কার হয়ে আসতে লাগল। সিণ্টাও যেন বুঝতে পেরেছিল। তাই সে প্রশ্ন করল—'গঞ্জাঙ আবরি' যখন লিখেছে, তখন মিলিটারিরা শাসন-ক্ষমতা ছাড়িয়ে নিয়েছে কেন বলছ ? 'হিতুপ উন্টুঙ্গ' যখন তখন উন্টুঙ্গেরই এই কাজ—

তা—হ্যাঁ—তা—বলল সুমাত্রো,—উন্টুঙ্গও তো মিলিটারি—কোন খবরের কাগজ এখনও বেরোয় নি। দুপুরে বেরোতে পারে—খবরের কাগজ না দেখলে—

সিণ্টা বলল—রেডিওতেও খবর পাওয়া যেতে পারে—

সুমাত্রো রেডিওটা নাড়াচাড়া করতে লাগল।

হঠাৎ রেডিওতে শোনা গেল ঃ

> রেডিও জাকর্তা। গেরকাস্ক সেপ্টেম্বর ত্রিগাপোলুর সংবাদ সংস্থা থেকে বলছি। দেশবাসীর কাছে 'গেস্টাপু'র অনুরোধ তাঁরা যেন আজ

বাড়িতে থাকেন। সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার শাসনভার 'গেস্টাপু' গতকাল রাত্রি থেকে গ্রহণ করেছে। দেশবাসীকে দুঃখ-দারিদ্র্য দুর্দশা থেকে রক্ষা করার জন্যই 'গেস্টাপু' এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। দেশের প্রত্যেকে এই ব্যবস্থায় আনন্দিত হবেন। বিস্তারিত বিবৃতি সকাল আটটায় ইন্দোনেশিয়ার সমস্ত রেডিও মারফৎ প্রচারিত হবে।

কিছুক্ষণ তিনজনেই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। এক অবিশ্বাস্য, অসম্ভব ঘটনা। দেশের সর্বজনপ্রিয় নেতা প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের বিরুদ্ধে এই অভ্যুত্থান অকল্পনীয় এবং অভ্যুত্থানের সাফল্য অসম্ভব। অথচ···অথচ এত সহজে এই অভ্যুত্থান সম্ভব হল!

অনেকক্ষণ পরে প্রশ্ন করলাম—গেস্টাপু কি?

সুমাত্রো বলল—গেরকাঙ্গ সেপ্টেম্বর ত্রিগাপোলু বা তিরিশে সেপ্টেম্বর আন্দোলনের সংক্ষেপ।

আটটার সময় রেডিও জাকর্তা আবার ঘোষণা করল:

রেডিও জাকর্তা। গেরকাঙ্গ সেপ্টেম্বর ত্রিগাপোলুর সংবাদ সংস্থা থেকে বলছি।

কাল বৃহস্পতিবার ১৯৬৫ সনের তিরিশে সেপ্টেম্বর ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের রাজধানী জাকর্তায় স্থলবাহিনীর অভ্যন্তরে এক আন্দোলন শুরু হয় এবং সামরিকবাহিনীর অন্যান্য অঙ্গও এই আন্দোলনে যোগদান করে।

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের রক্ষীবাহিনী চক্রবীরাওয়া ব্যাটালিয়নের অধ্যক্ষ লেফটেনান্ট কর্নেল উন্টুঙ্গ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং তথাকথিত 'দেওয়ান জেনারেল'-এর সভ্য সেনাপতিদের বিরুদ্ধেই এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে।

বেশ কিছুসংখ্যক সেনাপতিকে বন্দী করা হয়েছে, জন-সংযোগ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যালয়গুলি 'গেস্টাপু'র কর্তৃত্বাধীনে আনা হয়েছে এবং 'গেস্টাপু'র রক্ষণাবেক্ষণে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ নিরাপদে

আছেন। এই 'দেওয়ান জেনারেল' আমেরিকার সি. আই. এ-র পরিচালিত একটি সংস্থা।

প্রেসিডেণ্ট স্থকর্ণ যে অস্থখে মারা যাবেন, তাদের এই আশা ব্যর্থ হয় এবং তাদের ষড়যন্ত্র সফল করার জন্ম 'দেওয়ান জেনারেল' ৫ই অক্টোবর সামরিকবাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনে তাদের শক্তির পরিচয় দেবার কল্পনা করে। জাকর্তায় অনেক সৈন্ম আমদানি ক'রে ৫ই অক্টোবরের পূর্বেই একটি সামরিক অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা করে। তাদের এই সামরিক অভ্যুত্থানকে বানচাল করার জন্মই লেঃ কর্ণেল উণ্টুঙ্গ এই 'গেস্টাপু' আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং তা সফল হয়েছে।

'গেস্টাপু'র নেতা জানাচ্ছেন যে জাকর্তায় 'দেওয়ান জেনারেল'-এর বিরুদ্ধে যেরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার সর্বত্রই অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। 'গেস্টাপু'র নেতৃবৃন্দ আরো জানাচ্ছেন যে একটি কেন্দ্রীয় 'ইন্দোনেশীয় বৈপ্লবিক সমিতি' গঠন করা হবে এবং প্রতি দ্বীপে, শহরে ও গ্রামে তার আঞ্চলিক শাখা গঠিত হবে। এই সমিতির সভ্যেরা সামরিক ও বেসামরিক দুই দলেরই হবেন। রাজনৈতিক দল, জনগণের সমিতি, সংবাদপত্র, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি এই বৈপ্লবিক সমিতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলে এই সমিতির নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পারবে।

এই বৈপ্লবিক সমিতি ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তিত করবে না, কারণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শান্তি বজায় রাখার জন্ম এই পররাষ্ট্র-নীতি নিও-কলোনিয়েলিজম্, ইম্পিরিয়েলিজম্ এবং কলোনিয়েলি-জমের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত। আলজিয়ার্সে আফ্রো-এশীয় সম্মেলন, কোনেফো, মালয়সিয়ার সঙ্গে কনফ্রণ্টাসি প্রভৃতি সম্বন্ধে নীতি অপরিবর্তিত থাকবে।

'গেস্টাপু'র নেতা লেঃ কর্ণেল উণ্টুঙ্গ আশা করেন যে জনগণ 'দেওয়ান জেনারেল' এবং তাদের দালালদের চক্রান্ত থেকে ইন্দোনেশিয়াকে রক্ষা করার জন্ম সজাগ এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

সামরিকবাহিনীর অফিসার, নন্-কমিশনড্ অফিসার এবং জওয়ানদের কাছে লেঃ কর্ণেল উন্টুঙের এই আবেদন যেন তাঁরা সেনাবাহিনীর মধ্য থেকে 'দেওয়ান জেনারেল' এবং তাদের দালালদের সমস্ত প্রভাব ধ্বংস করেন। যে-সব সেনাপতি ও অফিসার ক্ষমতা-প্রিয়, তাঁদের অধীনস্থ সাধারণ সৈন্যের প্রতি সহানুভূতিহীন, যাঁরা অর্থের প্রাচুর্যে বিলাস-ব্যসনে দিন কাটান এবং সরকারের অর্থ অপচয় করেন, তাঁদের সৈন্যবাহিনী থেকে দূর করে দিতেই হবে।

সেনাবাহিনী শুধুমাত্র সেনাপতিদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, সমস্ত অফিসারেরও তার প্রতি দায়িত্ব আছে। স্থলবাহিনীর বাইরে অন্যান্য যে সব সামরিকবাহিনী স্থল-বাহিনীর নোঙরামি দূর করাতে সাহায্য করেছে, তাদের লেঃ কর্ণেল উন্টুঙ ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

১৯

এই অবিশ্বাস্য কাহিনীর শুরু গতকাল সন্ধ্যাবেলায়।

অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্দোনেশিয়ান টেকনিশিয়ান্‌স্‌-এর বার্ষিক সভায় বক্তৃতা করতে এসেছিলেন সুকর্ণ। এক নাগাড়ে সত্তর মিনিট বক্তৃতা দেওয়ার পর হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন, তাঁর সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। অচেতন হয়ে পড়ে যাওয়ার আগেই তাঁর দুই পার্শ্বচর ছুটে এসে তাঁকে ধরে মঞ্চ থেকে নামিয়ে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। এক মুহূর্তের নিস্তব্ধতার পর হৈ চৈ গোলমাল। সুকর্ণের ব্যক্তিগত চীনা ডাক্তার ডক্টর উ তাঁর দলবল নিয়ে সুকর্ণের সাহায্যে ছুটে গেলেন।

সুকর্ণের মারাত্মক অসুস্থতার কথা আগে থেকেই সকলের জানা। বক্তৃতার মঞ্চে এভাবে মাথা ঘুরে তাঁকে পড়ে যেতে দেখে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা দেখা গেল। সভামণ্ডপে মুহূর্তের মধ্যে এক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হ'ল। সকলেই মঞ্চের ওপরে গিয়ে জানতে চায় প্রেসিডেন্টের অবস্থা; কিন্তু দেহরক্ষীদের কড়া পাহারায় কেউ মঞ্চের কাছে যেতে পারে না। ব্যাপারটা সকলেরই কাছে রহস্যজনক বলে মনে হয়। একটা সন্দেহ সকলের মনে দানা বাঁধতে থাকে: কেন এত কড়াকড়ি, কেন প্রেসিডেন্টের অবস্থা গোপন রাখার চেষ্টা?

তবে কি প্রেসিডেন্ট মারা গেছেন?

সঙ্গে সঙ্গে এই কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। যারা যারা এই বক্তৃতা শুনতে এসেছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই বাড়িতে ছুটল এই খবর বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে রাষ্ট্র করে দিতে। শেষ সংবাদ শোনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল সামান্য কয়েকজন লোক, আর নাসাকোম মন্ত্রীসভার মন্ত্রীরা।

কিন্তু সকলের সন্দেহ ও আশঙ্কাকে অমূলক প্রতিপন্ন করে সুকর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং ঘণ্টা দেড়েক পরে মঞ্চে ফিরে এসে তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। কিন্তু সে কথা শুনল মাত্র সামান্য কয়জন লোক। ততক্ষণে অর্ধেক জাকর্তাবাসী পেয়ে গেছে সুকর্ণের মৃত্যু-সংবাদ। সারা নগরীতে এক চাপা উত্তেজনা।

সুকর্ণ অসুস্থ হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সমস্ত মন্ত্রীই ছুটে গিয়েছিলেন তাঁর ঘরে, যান নি শুধু একজন। তিনি হয়েছেন পি. কে. আই-এর সেক্রেটারি জেনারেল ডি. এন. আইদিত। সকলে যখন প্রেসিডেন্টকে নিয়ে ব্যস্ত তখন আইদিত সভামঞ্চ থেকে সোজা বাইরে বেরিয়ে গেলেন। সাধারণ লোকচক্ষুর সামনে থেকে তিনি সেই যে চলে গেলেন, আর তাঁকে তারা কেউ কখনও দেখতে পায় নি।

আর সেদিন সেই বক্তৃতা-মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন না প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষী বাহিনীর অধিকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্ণেল উন্টুঙ্গ। ব্যক্তিগত কারণে তিনি সেদিন সুকর্ণের কাছ থেকে ছুটি নিয়েছিলেন।

জাকর্তা স্টেডিয়াম থেকে আইদিত গাড়ি ছুটিয়ে সোজা চলে গেলেন পনের মাইল দূরে হালিম বিমানবন্দরে। সেখানে ততক্ষণে আরো অনেকে জমায়েত হয়েছে। উন্টুঙ্গের চক্রবীরাওয়া বাহিনী, পি. কে. আই-এর পেমুদা রাকিয়াত আর গেরওয়ানি (গেরকাঙ্গ ওয়নিতা—নারী আন্দোলন) তাদের দলবল নিয়ে প্রস্তুত।

সুকর্ণের মৃত্যু-সংবাদ আইদিত উন্টুঙ্গকে জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে গেস্টাপুর অভিযান শুরু হল। চক্রবীরাওয়া, পেমুদা আর গেরওয়ানির দলপতিদের ডেকে তাদের কাজ বুঝিয়ে দেওয়া হল। চক্রবীরাওয়া বাহিনীর ওপর ভার দেওয়া হল ইন্দোনেশিয়ার প্রথম এবং প্রধান আটজন সেনাপতিকে বন্দী করে নিয়ে আসতে। তালিকায় সবার

ওপরে নাম ছিল তখনকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল নসুশানের। তারপর সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি লেঃ জেনারেল মহম্মদ ইয়ানি। এই তালিকায় আর ছিলেন: রিজার্ভ বাহিনীর সেনাপতি মেজর জেনারেল সুহারতো, জাকর্তা বাহিনীর সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পানজাইতান, প্রথম ডেপুটি কম্যাণ্ডার মেজর জেনারেল এস. পারমান, দ্বিতীয় ডেপুটি কম্যাণ্ডার মেজর জেনারেল সুপ্রাপতো, তৃতীয় ডেপুটি কম্যাণ্ডার মেজর জেনারেল হারিয়োনো এবং মিলিটারি ট্রাইবুনালের ব্রিগ্রেডিয়ার জেনারেল সুতোয়ো।

পেমুদা রাকিয়াতকে দেওয়া হল রেডিও স্টেশন, রেলওয়ে, জলকল, টেলিফোন এবং ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস দখল করতে। প্রত্যেক দলকেই প্রয়োজন মতো লরি, জীপ এবং অস্ত্র দেওয়া হল। প্রত্যেক দলকেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ হাসিল করে হালিম বিমান বন্দরে খবর দিতে বলা হল।

হঠাৎ জাকর্তার সমস্ত বৈদ্যুতিক আলো নিভে গেল।

শেষরাত্রের অন্ধকারে চক্রবীরাওয়ার একটি দল জীপ এবং লরি নিয়ে জালান টেস্কু উমার রাস্তার ওপরে জেনারেল নসুশানের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। চারজন সশস্ত্র সৈন্য নেমে এসে প্রহরারত রক্ষীদের আদেশ করল দরজা খুলে দিতে। একটা কাগজ দেখিয়ে জানাল যে প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ এই মুহূর্তে জেনারেলকে তলব করেছেন। প্রহরী দুজনের কেমন যেন সন্দেহ হল। জানাল যে টেলিফোন করে জেনারেলের অনুমতি না নিয়ে তারা দরজা খুলতে পারবে না।

সঙ্গে সঙ্গে তারা চারজন বন্দুক তুলে ধরল। গুলির ঘায়ে দুজন রক্ষীই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। দরজা ভেঙে তখন চক্রবীরাওয়ার দল জীপ আর লরি নিয়ে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করল।

জেনারেল নস্থুশানের এক পার্শ্বরক্ষী লেফটেন্যাণ্ট টেনডিন গুলি ছোঁড়ার শব্দে জেগে উঠে একটা কিছু ঘটেছে সন্দেহ করে ছুটে জেনারেল নস্থুশানকে সংবাদ দিলেন। নস্থুশান সঙ্গে সঙ্গে উঠে নিজের পোশাক পরে ব্যাপার জানবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, কিন্তু বাধা দিলেন টেনডিন।

নস্থুশান সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে যাবেন, কিন্তু পথ ছাড়লেন না টেনডিন। স্যালিউট করে বললেন—আপনাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার, জেনারেল। আমি যতক্ষণ না নামতে বলি ততক্ষণ আপনি এখানে থাকুন। আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।

তারপর টেনডিন হঠাৎ জেনারেল নস্থুশানের হাত থেকে জেনারেলের টুপি আর কোটটা ছাড়িয়ে নিয়ে নিজে পরে বললেন—মাপ করবেন, জেনারেল।

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইলেন নস্থুশান। ততক্ষণে সিঁড়ি দিয়ে সেনাপতির ভঙ্গীতে নেমে যাচ্ছেন লেফটেন্যাণ্ট টেনডিন।

টেনডিনকে দেখেই অন্ধকারে চক্রবীরাওয়ার দলপতি প্রশ্ন করে উঠল —জেনারেল নস্থুশান?

টেনডিন গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, কি ব্যাপার?

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে পনের ষোল জন সৈন্য টেনডিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে জোর করে ধরে লরিতে তুলে ফেলল। লরি আর জীপ ছুটে চলল হালিমের দিকে। টেনডিনের হাত পা বাঁধার সময়ে সেই অন্ধকারে হঠাৎ একজনের কেমন যেন সন্দেহ হল। বন্দী লোকটির বয়স যেন অল্প বলে মনে হচ্ছে। এবারে সকলে ভাল করে লক্ষ্য করল তাঁকে। দলপতি টর্চ জ্বালিয়ে টেনডিনের মুখ দেখে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। সঙ্গে সঙ্গে 'বিশ্বাসঘাতক' লেফটেন্যাণ্ট টেন-ডিনকে তারা পথের মধ্যেই হত্যা করল। তারপর ফিরে চলল তারা জেনারেল নস্থুশানের বাড়ির দিকে।

ব্যাপারটা দেখে নস্থুশান বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার জন্য ছুটে নীচে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এবারে বাধা দিলেন তাঁর স্ত্রী। তিনি অনুনয় করতে লাগলেন যাতে নস্থুশান গিয়ে আপাততঃ কোথাও আত্মগোপন করে থাকেন, কিন্তু নস্থুশান সে কথা শুনতে চাইলেন না। ততক্ষণে হত্যাকারীর দল আবার ফিরে এসেছে। বিনা বাধায় তারা দোতলায় উঠে এল। নস্থুশানের স্ত্রী তাঁকে জোর করে জানালা দিয়ে নীচে নামিয়ে দিয়ে একমাত্র মেয়ে এর্মার বিছানার কাছে ফিরে এলেন। হত্যাকারীরা অন্ধকারে শয্যায় শায়িত এর্মাকে দেখে নস্থুশান বলে ভুল করে গুলি চালাল। নস্থুশানের স্ত্রী চীৎকার করে বিছানায় লুটিয়ে পড়লেন। গুলির শব্দে এবং চীৎকারে আশে পাশের লোকেরা জেগে উঠল। হত্যাকারীর দল তখন সেখান থেকে পালাল। মেয়েকে বুকে করে নিয়ে নস্থুশানের স্ত্রী রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে হাসপাতালে গিয়ে হাজির হলেন। মেয়ের বুকে পাঁচটা গুলি বিঁধেছিল। এর্মাকে আর বাঁচানো গেল না।

নস্থুশান নীচে লাফিয়ে পড়ে বাড়ির পাঁচিল টপকিয়ে পাশের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। উত্তেজনার মুখে প্রথমে কিছু বুঝতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর বাঁ পায়ে খুব জোরে চোট লেগেছিল। কোনরকমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিনি সেনাবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দরজার রক্ষীকে প্রথম প্রশ্ন তিনি করলেন—ইয়ানি কোথায়?

জেনারেল নস্থুশানের বাড়িতে যখন এই নাটকীয় ঘটনা সংঘটিত হচ্ছিল, ঠিক তখন আর একদল চক্রবীরাওয়ার সৈন্য হাজির হয়েছিল লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমদ ইয়ানির বাড়িতে।

শেষরাত্রে হঠাৎ গুলির শব্দে সপরিবারে ইয়ানির ঘুম ভেঙে যায়। ব্যাপার কি বুঝতে পারার আগেই সদর দরজার কাছে আবার গুলির

শব্দ। গুলি মেরে দরজার তালা ভেঙে একদল সৈন্য ইয়ানির বাড়িতে ঢুকে পড়ে। বসবার ঘরে এসে তারা চীৎকার করে জেনারেল ইয়ানিকে ডাকতে শুরু করে।

জেনারেল ইয়ানি শোওয়ার পোশাক পরেই দ্রুত নীচে নেমে যান। তাঁর পিছন পিছন যান তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা।

ক্রুদ্ধস্বরে ইয়ানি প্রশ্ন করলেন—কি ব্যাপার? তোমরা এভাবে জোর করে বাড়িতে ঢুকছে কেন? কি চাও?

একজন এগিয়ে এসে উত্তর দিল—প্রেসিডেন্ট আপনাকে ডেকেছেন।

ভ্রূ কুঞ্চিত হল ইয়ানির। বললেন—প্রেসিডেন্ট ডেকেছেন! আচ্ছা, আমি যাব—কিন্তু তোমরা বাড়িতে ঢুকলে কি করে? আমার প্রহরীরা কোথায়?

কেউ কোন উত্তর দিল না।

ইয়ানির সন্দেহ হল। তিনি বললেন—তোমরা গিয়ে প্রেসিডেন্টকে বল যে আমি একটু পরে যাচ্ছি।

এবারে দলপতি উত্তর দিল—তা হবে না। আমাদের ওপর আদেশ হয়েছে আপনাকে নিয়ে যেতে।

সঙ্গে সঙ্গে সকলে তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য টানাটানি করতে লাগল। ইয়ানি তাদের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ভয়ে চীৎকার করতে লাগলেন। হঠাৎ একজন লোক বন্দুক তুলে জেনারেল ইয়ানিকে পর পর দু'বার গুলি করল। তিনি মাটিতে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঝের গালিচা দিয়ে তাঁকে মুড়ে সকলে মিলে টেনে তাঁকে লরিতে তুলে নিয়ে চলে গেল।

সেই রাত্রের শেষের দিকে জেনারেল পারমানের হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। বাইরে যেন কিসের গোলমাল শুনতে পেলেন। সন্দেহ হল, হয়তো

চোর এসেছে। তিনি বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলেন যে চক্রবীরাওয়ার পোশাক পরিহিত প্রায় কুড়িজন সৈন্য দাঁড়িয়ে।

জেনারেল পারমান বললেন—তাই বল, তোমরা চক্রবীরাওয়া ব্যাটালিয়নের সৈন্য! কী খবর?

—প্রেসিডেণ্ট আপনাকে আমাদের সঙ্গে তাঁর কাছে যেতে বলেছেন।

—ব্যাপারটা কি খুব গুরুতর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব গুরুতর।

জেনারেল পারমান ঘরে ফিরে এসে তাঁর পোশাক পরতে লাগলেন। তাঁর কিংবা তাঁর স্ত্রীর মনে কোনরকম সন্দেহ উপস্থিত হল না। অনেকদিনই জরুরী কাজে তাঁকে এভাবে রাত্রে বাইরে বেরোতে হয়েছে।

জেনারেল পারমানকে নিয়ে চক্রবীরাওয়ার দল গাড়ি করে চলে গেল।

মিনিট পনের পরে ছুটে এলেন জেনারেল পানজাইতানের স্ত্রী। পারমানের স্ত্রীকে দেখেই কেঁদে উঠলেন—জেনারেল কোথায়?

কেন? কি হয়েছে?—আতঙ্কে প্রশ্ন করলেন মিসেস্ পারমান।

জেনারেলকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে—হু হু করে কেঁদে ফেললেন মিসেস্ পানজাইতান।

কিছুক্ষণ আগে চক্রবীরাওয়ার একদল সৈন্য গিয়েছিল জেনারেল পানজাইতানের বাড়িতে। অবাধ্য সৈন্যদলের সঙ্গে জেনারেলের ভাইপো আলবার্ট নেইবোড়োর কথা কাটাকাটি হয়। তিনি তাদের বাধা দিলে পর তাঁকে গুলি করে মেরে তারা বাড়িতে ঢুকে জেনারেল পানজাইতানকে জোর করে ধরে টেনে নিয়ে যায়।

আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়ে গেলেন জেনারেল সুহারতো।

২৫শে সেপ্টেম্বর তাঁর ডুকুন (গণৎকার) তাঁকে তিরিশে সেপ্টেম্বর রাত্রটা যতক্ষণ সম্ভব বাইরে কাটাতে বলেছিলেন। ডুকুনের কথা মনে করে সুহারতো সেদিন সন্ধ্যাবেলায় নদীর ধারে গোপনে বসে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন। রাত তিনটে নাগাদ বাড়ির কাছাকাছি এসে তিনি দূর থেকে দেখলেন যে তাঁর বাড়ির সামনে কিছু লরি, জীপ দাঁড়িয়ে আছে। ডুকুনের কথা তাঁর মনে হল। তিনি কিছু বুঝতে পারলেন না। তাঁর মেয়ে হাসপাতালে ছিল। তার অসুখের বাড়াবাড়ি হতে পারে মনে করে তিনি হাসপাতালে ছুটে গেলেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন যে মেয়ে ভালই আছে এবং তাঁর স্ত্রী সেখানে আছেন। আবার তিনি বাড়ির দিকে ফিরলেন। এবারে আর তাঁর বাড়ির সামনে গাড়ির ভিড় নেই। গিয়ে দেখলেন, সদর দরজার তালা ভাঙা।

তাঁকে ফিরতে দেখে একজন প্রতিবেশী জানালেন যে একদল সৈন্য তাঁর খোঁজে এসেছিল। তারাই দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে সবকিছু তছনছ করে গেছে।

জেনারেল সুহারতোর সমস্ত শরীরে এক শীতল শিহরণ বয়ে গেল। ডুকুনের ভবিষ্যদ্‌বাণী আশ্চর্যভাবে মিলে গেছে। তিনি বাড়িতে ঢুকে তাঁর ঊর্ধ্বতম অফিসার জেনারেল নসুশান, জেনারেল ইয়ানি, জেনারেল সুপ্রাপতো ও জেনারেল হারিয়োনোকে টেলিফোনে ডাকবার চেষ্টা করলেন ; কিন্তু টেলিফোনে সাড়া পাওয়া গেল না।

তিনি তাঁর গাড়ি নিয়ে ছুটে চললেন সেনাবাহিনীর প্রধান কার্যালয়ে। সেখানে পৌঁছিয়েই তিনি দেখলেন ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা পায়ে দাঁড়িয়ে আছেন জেনারেল নসুশান। নসুশানকে দেখে অভিবাদন করে দাঁড়ালেন সুহারতো। তাঁর নিজের ভাষায়, একজন লোককে—বিশেষ করে জেনারেল নসুশানকে দেখে এত আনন্দ আমি আর জীবনে উপলব্ধি করি নি।

আদেশের প্রতীক্ষায় রইলেন জেনারেল সুহারতো।
এই অস্বাভাবিক বিদ্রোহের সম্মুখীন হওয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন আবার জেনারেল নসুশান।
প্রথমেই তিনি বান্দুং থেকে বিখ্যাত সিলিওয়াঙ্গি সৈন্যদলকে জাকর্তার অভিমুখে আসতে নির্দেশ দিলেন এবং সুহারতোকে বললেন তাঁর রিজার্ভ সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত রাখতে।
প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণকে টেলিফোন করলেন তিনি। সুকর্ণ জাকর্তায় নেই। কোথায় গেছেন কেউ জানে না।

২০

সারা রাত সুকর্ণের চোখে ঘুম নেই।

কোথায় যেন একটা কি হয়ে গেছে—তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। সন্ধ্যাবেলার অসুস্থতার জন্যই তাঁর মানসিক এই অস্থিরতা নয়। আজ বহুদিন তিনি অসুস্থ, কিন্তু এরকম শূন্যতা তিনি কোনদিন অনুভব করেন নি।

গভীর রাত্রে তাঁর মেরডেকা প্রাসাদে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলেন এই কথা। এই নিদ্রাবিহীন রজনীতে তাঁর মনোরঞ্জন করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রী সুবন্দ্রিয়োকে আজ পাওয়া যাবে না। বিশেষ দরকারে তিনি আর নিয়োতো হঠাৎ সুমাত্রায় চলে গেছেন। সুবন্দ্রিয়ো থাকলে তিনি একটু মনে সাহস পেতেন।

বাইরে ভারী গাড়ীর যাতায়াতের শব্দে তিনি বিরক্ত হলেন। বিছানা ছেড়ে উঠে বারান্দায় বেরিয়ে দেখলেন চারটে ট্যাঙ্ক কামান উঁচিয়ে প্রাসাদ লক্ষ্য করে আছে। কতগুলি সাঁজোয়া গাড়ি সৈন্য-পূর্ণ অবস্থায় অপেক্ষা করছে।

প্রেসিডেন্টকে অভিবাদন করে একজন ক্যাপ্টেন বললেন—লেঃ কর্ণেল উন্টুঙ্গ আমাদের আপনাকে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন। 'দেওয়ান জেনারেল' বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। আপনার জীবন বিপন্ন। আপনাকে হালিম বিমান বন্দরে নিয়ে যেতে বলেছেন।

সুকর্ণ 'দেওয়ান জেনারেল'-এর বিদ্রোহের কথা শুনে আসছিলেন। মনে হল, হয়তো তা-ই সত্য হবে।

প্রশ্ন করলেন—উন্টুঙ্গ কোথায়? হালিমে?

উত্তর হল—বলতে পারব না, বাপক।

—তবে আমি কেন হালিমে যাব ?
—যদি বিপদ দেখা যায় তো আপনাকে সহজেই দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে। অবস্থা আয়ত্তে এলে আপনি আবার ফিরে আসবেন।
সুকর্ণ তাদের সঙ্গে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

আইদিতের ধারণা হয়েছিল যে সন্ধ্যার ওই অসুস্থতা সুকর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারবেন না। হয়তো মারা-ই যাবেন, নয়তো চিরকালের জন্য শয্যাশায়ী হয়ে থাকবেন। সেইজন্যই সুকর্ণের সুস্থ হওয়ার জন্য এতটুকু অপেক্ষা না করে তিনি হালিমে উপস্থিত হলেন। উন্টুঙ্গকে তিনি সুকর্ণের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়ে দিলেন।
সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রেসিডেন্টের মৃত্যু-সংবাদ শুনলেই শাসনক্ষমতা হস্তগত করার চেষ্টা করবে। তাদের প্রস্তুত হওয়ার আগেই তাদের ওপর আঘাত হানবার ব্যবস্থা হল।
কিন্তু আইদিত আর উন্টুঙ্গকে হতচকিত করে দিয়ে সুকর্ণ আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলেন। এই খবর পেয়ে দুজনেই প্রমাদ গণলেন। ততক্ষণে তাঁরা অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছেন, আর ফেরা অসম্ভব। আইদিত উন্টুঙ্গকে জানালেন যে সুকর্ণের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া না করতে পারলে বিপদ হতে পারে। সেইজন্য উন্টুঙ্গ দলবল পাঠালেন সুকর্ণকে নিয়ে আসতে।
সুকর্ণের আসার সঙ্গে সঙ্গে আইদিত আর উন্টুঙ্গ তাঁকে জানালেন যে সি. আই. এ-র দালাল 'দেওয়ান জেনারেল'-এর সেনাপতিরা বিদ্রোহ করার ষড়যন্ত্র করেছিল বলে তাদের বন্দী করা হয়েছে এবং 'গেস্টাপু' একটি বিপ্লব ঘোষণা করেছে। এই বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়ে এবং জেনারেলদের বন্দী করার সমর্থন জানিয়ে একটা ইস্তাহারে তাঁর স্বাক্ষর চাই। ইস্তাহারটি আইদিত লিখে সুকর্ণের হাতে দিলেন।
ইস্তাহারটি পড়ে সুকর্ণ জানালেন যে এই ব্যবস্থা দেশের লোক কি

ভাবে নেবে তা জানতে না পারলে, সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে না পারলে তাঁর পক্ষে ইস্তাহারে সই করা অসম্ভব।

আইদিতের সঙ্গে সুকর্ণের তর্ক বাধল, কিন্তু সুকর্ণ সই করতে কিছুতেই রাজি হলেন না।

হঠাৎ একজন দূত ছুটে এসে খবর দিল যে সকলকে আনা হয়েছে, শুধু নসুশান আর সুহারতোকে পারা যায় নি।

আইদিত এবং উণ্টুঙ্গের মুখ থেকে নিমেষে সমস্ত রক্ত নিঃশেষ হয়ে গেল। দাবার প্রথম চালেই এত বড় ভুল! জেনারেল নসুশানকে বন্দী করতে না পারলে তাঁদের এই বিদ্রোহ সফল হওয়া অসম্ভব।

উণ্টুঙ্গ আদেশ দিলেন—যেমনভাবে পার জেনারেল নসুশানকে ধরে আনতেই হবে।

নসুশানকে ধরবার জন্য চারটে দল ছুটে চলল জাকর্তায়।

সকাল আটটায় রেডিও জাকর্তা ঘোষণা করল গেস্টাপুর বিপ্লবের সংবাদ।

সাড়ে আটটায় আর একটি সংবাদে ঘোষিত হল ইন্দোনেশীয় বৈপ্লবিক সমিতির কর্ম কর্তাদের নাম ঃ

চেয়ারম্যান—লেফটেন্যান্ট কর্নেল উণ্টুঙ্গ।

ভাইস চেয়ারম্যান—ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সুপার্জো, এয়ার লেফটেন্যান্ট কর্নেল হেরু এবং পুলিশ কমিশনার আনোয়ার।

সভ্য—ভাইস অ্যাডমিরাল ওমর দানি, ইনস্পেক্টর জেনারেল অব পুলিশ সুচিপ্তো জুদোদিহার্জো, ভাইস অ্যাডমিরাল এডি মার্তাদিনাতা, ডক্টর সুবন্দ্রিয়ো, ডক্টর জোহানেস লেইমেনা প্রভৃতি বিমানবাহিনী, মেরিন বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, পি. কে. আই এবং কমিউনিস্ট দলের ফ্রণ্ট পেমুদা, গেরওয়ানি, ফ্রণ্ট পেমুদা পুসট, সাংবাদিক গোষ্ঠী পি. ডব্লু. আই, পি. এন. আই (বামপন্থী) প্রভৃতি দলের চল্লিশ জন।

রেডিও আরো ঘোষণা করল :

> 'গেস্টাপু'র পক্ষ থেকে বৈপ্লবিক সমিতির চেয়ারম্যান লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল উন্টুঙ্ জানাচ্ছেন যে উচ্চ পর্যায়ের সমস্ত সামরিক কর্মচারীর পদমর্যাদা লেফটেন্যাণ্ট কর্নেলে পরিণত করা হল। ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ সনের পূর্বে অন্যান্য অফিসার ও সৈন্যদের যে পদ ছিল, তার মর্যাদা এক ঘর উঁচু করে দেওয়া হল এবং যাঁরা এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মর্যাদা দুই ঘর বাড়িয়ে দেওয়া হল। লেফটেন্যাণ্ট কর্নেলের চেয়ে বড় মর্যাদার যে-সব সামরিক অফিসার আছেন তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে যেন তাঁরা বৈপ্লবিক সমিতির আনুগত্য স্বীকার করে ঘোষণা করেন এবং তারপর তাঁরা লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল-এর পদ মর্যাদা গ্রহণ করতে পারবেন।

এই নামের তালিকার মধ্যে একজনের নাম কিন্তু দেখা গেল না। তিনি হয়েছেন প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ। 'দেওয়ান জেনারেল'-এর ষড়যন্ত্রের হাত থেকে সুকর্ণকে রক্ষা করার জন্যই যদি এই বিপ্লব সংঘটিত হয়ে থাকে তবে তার সর্বপ্রথমে সুকর্ণের নামই থাকত ; কিন্তু তালিকায় তাঁর নাম আশ্চর্যভাবে বাদ পড়ে গেল। পি. কে. আই. পরিচালিত 'আন্তারা' সংবাদ সংস্থাকে সংবাদ পরিবেশনের জন্য আগে থেকেই এই সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। তখন সুকর্ণকে তাঁরা দলে রাখার কথা ভাবেন নি, কারণ সুকর্ণের হাত থেকে দেশের শাসনক্ষমতা অধিকারের ষড়যন্ত্রই তাঁরা করেছিলেন।

এবার মাদিউন থেকে বিমানবাহিনীর কর্তা জেনারেল ওমর দানি ঘোষণা করলেন :

> সি. আই. এ-র ষড়যন্ত্রের হাত থেকে আমাদের দেশের বিপ্লব এবং তার মহান্ নেতাকে রক্ষা করার জন্য 'গেস্টাপু' কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। সেইজন্য ইন্দোনেশিয়ার বিপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বিদেশী সরকারের দালালদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে।

এই বিদ্রোহ দমন করতে ষড়যন্ত্রকারীরা নীরব থাকবে না এবং তাদের প্রতি-বৈপ্লবিক কাজ আরো জোরদার করে তুলবে। বিপ্লবের এক অঙ্গ হিসেবে বিমান বাহিনী সর্বদাই প্রগতিশীল বৈপ্লবিক আন্দোলনকে সমর্থন করে চলবে। ইন্দোনেশীয় বিপ্লবকে বিপদগ্রস্ত করতে পারে এমন সব কিছুকেই বিমানবাহিনী আক্রমণ করবে।

এই ঘোষণায় আমি বিমানবাহিনীর প্রত্যেককেই আদেশ করছি যে আমাদের বিপ্লবকে হেয় প্রতিপন্ন করার সমস্ত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তারা যেন সচেতন থাকে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ ও বাইরের সমস্ত ষড়যন্ত্রকারীদের ওপর তারা প্রখর দৃষ্টি রাখে।

জেনারেল ওমর দানি।

বিমান বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ।

হালিম বিমান বন্দরে সুকর্ণের উপস্থিতি এবং এই বিপ্লবের নেতাদের সমস্ত কথা তাঁর একবাক্যে মেনে না নেওয়াতে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল। এতক্ষণে দেশের সর্বসাধারণে জেনে গেছে যে সুকর্ণ মারা যান নি। সমস্ত দোষ থাকা সত্ত্বেও এখনও সুকর্ণ জনসাধারণের কাছে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা। এখনও তিনি সর্বজনপ্রিয় —তাঁকে বাদ দিয়ে জনসাধারণ কোন বিপ্লব মেনে নেবে না।

সুতরাং আবার আর এক সংবাদ ঘোষণা করতে হল ঃ

চক্রবীরাওয়া রেজিমেণ্টের সেনাধ্যক্ষ জানাচ্ছেন যে প্রেসিডেণ্ট এবং বিপ্লবের মহান্ নেতা বুঙ্গ কর্ণ সুস্থ আছেন এবং দেশের শাসনক্ষমতা তাঁর হাতেই আছে। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে চক্রবীরাওয়া রেজিমেণ্টের চীফ অব স্টাফ লেঃ কর্নেল সস্তোষো এই সংবাদ জানিয়েছেন।

চারটে দলই শূন্য হাতে ফিরে এল।

সারা জাকর্তা চষে বেড়িয়ে তারা জেনারেল নসুশানের খোঁজ পায় নি। চক্রবীরাওয়া বাহিনী, পেমুদা রাকিয়াত, ফ্রণ্ট পেমুদা পুসট এবং

গেরওয়ানির সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক স্বেচ্ছাসেবিকা দল জাকার্তার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদেরও কেউ নসুশানকে দেখতে পায় নি। আর্মি হেড কোয়ার্টার্সে তারা যেতে সাহস পায় নি, কারণ এখনও তারা জানে না স্থলবাহিনী এই বিদ্রোহে যোগ দেবে কি না।

এই সংবাদে চিন্তিত হয়ে পড়লেন আইদিত এবং উন্টুঙ্গ। নসুশানের সিলিওয়াঙ্গি ডিভিশনকে সবচেয়ে বেশি ভয়। নসুশান ডাক দিলে তারা ছুটে আসবে এবং এই সেনাবাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। এখনও জাকার্তা তাঁদের হাতেই আছে, একটিও সেনাবাহিনী বিদ্রোহ দমন করতে অগ্রসর হয় নি। মাদিউন তাঁদের হাতে আছে, সেখানে জেনারেল ওমর দানি তাঁদের সহায়।

সুহারতো তাঁর রিজার্ভ বাহিনীকে একত্রিত করে জাকার্তা আক্রমণ করলেন। রাত আটটার সময়ে রেডিও জাকার্তা তাঁদের হাতে এল। নসুশান এবং সুহারতোর অধিনায়কতায় সেনাবাহিনী জাকার্তা অধিকার করল মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। চারদিকে তারা ঘাঁটি করে পথ আটকিয়ে বসল।

দ্বিতীয় উপ-প্রধানমন্ত্রী ডক্টর জোহানেস লেইমেনা কেমন করে যেন খবর পেয়েছিলেন যে সুকর্ণ হালিম বিমান বন্দরে আছেন। খুব বড় রকমের ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়েও তিনি ছুটলেন হালিম বিমান বন্দরে। সুকর্ণ তখন উন্টুঙ্গ এবং আইদিতের সঙ্গে এই অভ্যুত্থান সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। লেইমেনাকে দেখে সকলেই আশ্চর্য হলেন। লেইমেনা জানালেন যে এই বিদ্রোহ টিকতে পারে না। সমগ্র সামরিকবাহিনী এই অভ্যুত্থানে যোগ দেয় নি। অধিকাংশ সৈন্যদলকে জেনারেল নসুশান এবং জেনারেল সুহারতো সঙ্ঘবদ্ধ করে আক্রমণের চেষ্টা করছেন, সুতরাং সুকর্ণের এর মধ্যে থাকা কোমমতে উচিত নয়। বিশ্বাস করতে পারেন নি সুকর্ণ। আইদিত আর উন্টুঙ্গের সন্দেহ ছিল, কিন্তু এতক্ষণ কোন দুঃসংবাদ তাঁরা জাকার্তা থেকে পান নি।

আর তাছাড়া জাকর্তাই সমগ্র ইন্দোনেশিয়া নয়। জাকর্তার পতন যদিও বা হয়, অন্যত্র তাঁদের ঘাঁটি খুব শক্তিশালী।

সুকর্ণ চিন্তিত হলেন খুব। বরাবর দু-নৌকোয় পা রেখে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ নদী পার হয়েছেন সার্কাস-খেলোয়াড়ের মতো, এবারেও সেই পন্থাই অবলম্বন করলেন। তখন পর্যন্ত যতখানি সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে এই অভ্যুত্থান জয়ী, কেউ এর বিরুদ্ধে মাথা তোলে নি। পি. কে. আই এবং তার অধীনস্থ সংস্থাগুলির ওপরও তাঁর অগাধ বিশ্বাস। শেষ পর্যন্ত যদি এই অভ্যুত্থানই জয়লাভ করে, তখন ?

সুকর্ণ সময় নিতে লাগলেন।

হালিম বিমান বন্দরে সংবাদ আসতে লাগল : মাদিউনে বিপ্লব সার্থক হয়েছে। মধ্য-যবদ্বীপে বিপ্লবীদের কেউ বাধা দেয় নি। সুমাত্রায় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে।

রাত আটটায় যেন বোমা পড়ল হালিম বিমান বন্দরে।

রেডিও জাকর্তার হঠাৎ সুর পরিবর্তিত হয়ে গেল। সারাদিনে সেই প্রথম 'ইন্দোনেশিয়া রায়া' জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠল রেডিওতে। তারপর ঘোষণা হল :

> রেডিও জাকর্তা বলছি। জেনারেল নসুশানের নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় সামরিকবাহিনী প্রেসিডেণ্টের দেহরক্ষীদল চক্রবীরাওয়া রেজিমেণ্টের অধিনায়ক লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল উণ্টুঙ্গের বিদ্রোহ চূর্ণ করে আবার জাকর্তার কর্তৃত্ব প্রেসিডেণ্টের হাতে নিয়ে এসেছে। এই বিদ্রোহ শুধুমাত্র লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল উণ্টুঙ্গের ব্যক্তিগত উচ্চাশার জন্য, জনসাধারণের উপকারের জন্য নয়। দেশবাসীদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন এই ঘৃণ্য বিদ্রোহকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য ন্যায়ানুগ শাসনতন্ত্রকে সর্বদিক দিয়ে সাহায্য করেন। সামরিকবাহিনীর অফিসার এবং জওয়ানদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে যেন তাঁরা স্থানীয় বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হন।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে উন্টুঙ্গ, আইদিত এবং সুকর্ণের জরুরী পরামর্শ-সভা বসল। একটু পরেই এলেন জেনারেল ওমর দানি। জাকর্তার বিদ্রোহ যখন ব্যর্থ হয়েছে তখন হালিমের পতনও আসন্ন। অবশ্য এখনও পর্যন্ত কেউ জানে না যে হালিম বিমানবন্দর হয়েছে বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটি। উন্টুঙ্গের আদেশমতো হালিম বিমানবন্দর থেকে সকলকে সরিয়ে দেওয়া হল। সৈন্য এবং পি. কে. আই স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্য যবদ্বীপে আত্মগোপন করে অন্যান্য বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আদেশ দেওয়া হল।

আইদিত স্থির করলেন যে তিনি প্লেনে করে প্রথমে মাদিউনে যাবেন, সেখান থেকে তিনি মধ্য-যবদ্বীপ বা সোলো—যেখান থেকে বিদ্রোহ পরিচালনা করা সহজ হবে, সেখানে যাবেন। তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য তিনি প্রেসিডেন্ট সুকর্ণকে বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। জেনারেল দানি এবং লে. কর্ণেল উন্টুঙ্গও প্রেসিডেন্টকে সেই পরামর্শ দিলেন; কিন্তু অস্বীকার করলেন সুকর্ণ। রুটির কোন দিকে মাখন লাগানো তা বুঝতে তাঁর এবার দেরী হয় নি।

জাকর্তা এবং তার উপকণ্ঠে একটার পর একটা বিদ্রোহীদের ঘাঁটি নসুশান এবং সুহারতোর সেনাবাহিনীর হস্তগত হতে লাগল। নসুশান এবং সুহারতোকে শুধু দুটি ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখা গেল। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ কোথায়? সেনাপতিরাই বা কোথায়? সেনাপতিদের যে বন্দী করা হয়েছে সে সংবাদ নসুশান পেয়েছেন। প্রেসিডেন্টের সংবাদ কেউ দিতে পারে নি।

সেনাপতিদের অবর্তমানে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে এবং অনুপস্থিত প্রেসিডেন্টের নামে নসুশান জেনারেল সুহারতোকে বিদ্রোহ দমনে সর্বক্ষমতা প্রদান করলেন। এই গুরুদায়িত্বের ভার তিনি স্বহস্তে

রাখলেন না। একে তিনি আহত এবং অসুস্থ, তাঁর ওপর একমাত্র সন্তান এর্মা বিদ্রোহী সৈন্যদের গুলিতে নিহত। দেহে ও মনে তিনি বিশেষ শক্তি পাচ্ছেন না।

রাত দশটা নাগাদ আর্মি হেড কোয়ার্টার্সে হালিম বিমানবন্দর থেকে টেলিফোন এল: প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ সেখানে রয়েছেন।

নসুশানের নির্দেশে সুহারতো নিজে কয়েকটি সাঁজোয়া গাড়ি-পূর্ণ সশস্ত্র সেনা নিয়ে হালিম বিমানবন্দরে উপস্থিত হলেন। সুকর্ণ ফিরে যেতে চাইলেন মেরডেকা প্রাসাদে, কিন্তু সুহারতো তাঁকে নিয়ে রাখলেন প্রেসিডেন্টের বোগোর প্রাসাদে। 'প্যারাট্রুপ' বাহিনীর একটি দলকে বোগোর প্রাসাদ রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে তিনি ফিরে এলেন জাকর্তায়।

২রা অক্টোবর সকালবেলাতেই জাকর্তাবাসীরা জানতে পেরে গেল যে এই বিদ্রোহ চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। জনসাধারণের কাছে এই বিদ্রোহও যেমন হেঁয়ালি ছিল, বিদ্রোহ-দমনও সেইরকম হেঁয়ালি রয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে এ সম্বন্ধে গল্পগুজব ও আলাপ-আলোচনা করা ছাড়া আর তারা বিশেষ কিছু করে নি।

কিন্তু শঙ্কিত হয়ে উঠল এই বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি এবং দলগুলি। যাঁরা যাঁরা এই বিদ্রোহকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, প্রাণ বাঁচানোর জন্য চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁরা একেবারে সুর বদলিয়ে ফেললেন।

পি. কে. আই দলের কর্তৃত্বাধীনে সাংবাদিক সংস্থা পি. ডব্লু. আই. ২রা অক্টোবর প্রতিটি সংবাদ-পত্রে একটি বিবৃতি প্রকাশ করল:

> বৈপ্লবিক সমিতির সভ্য-তালিকায় ইন্দোনেশীয় সাংবাদিক সমিতি পি. ডব্লু. আই-এর চেয়ারম্যান এ. করিম ডি. পি এবং জুস্তা সুয়ার্দির নাম অন্তর্ভুক্ত করা সম্পর্কে জানানো হইতেছে যে পি. ডব্লু. আই-এর কেন্দ্রীয় বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা না করিয়াই উহা করা হইয়াছে। পি. ডব্লু. আই-এর কেন্দ্রীয় বোর্ড জানাইতেছে যে ইন্দোনেশীয় বিপ্লব সফল করিবার জন্য বিপ্লবের মহান নেতা ও সামরিকবাহিনীর সর্বাধিনায়ক বুঙ্গ কর্ণের সমস্ত কার্যকলাপ এই বোর্ড সমর্থন করে।

একই সুরে বিবৃতি দিল পি. কে. আই এবং পি. এন. আই-এর বামপন্থী দল। সবচেয়ে আশ্চর্য করলেন বিমানবাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল ওমর দানি। ১লা অক্টোবর যিনি বিমানবাহিনীর প্রত্যেককে এই বিদ্রোহে যোগদান করার আদেশ দিয়েছিলেন, ২রা অক্টোবর তিনিই আবার আর এক ঘোষণা করলেন :

> 'গেস্টাপু'র সঙ্গে বিমানবাহিনীর কোন সম্পর্ক নেই। সামরিক-বাহিনীর অন্যান্য অঙ্গের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিমানবাহিনী মাথা গলাতে চায় না। "বৈপ্লবিক সমিতির" অস্তিত্ব বা তার সভ্য-তালিকা সম্বন্ধে বিমানবাহিনী কোনও সংবাদ রাখে না।

বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত। প্রেসিডেন্ট তাঁর প্রাসাদে সুরক্ষিত। শুধু সংবাদ পাওয়া যায় নি সেনাপতিরা কোথায়। সারা শহরে শুধু গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে কমিউনিস্টরা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তাঁদের হত্যা করেছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

সন্ধ্যাবেলায় বোগোর প্রাসাদে জেনারেল সুহারতো সুকর্ণের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে জানালেন যে এই বিদ্রোহকে নিন্দা করে তাঁকে বিবৃতি দিতে হবে। সুকর্ণ অস্বীকার করলেন। জানালেন যে কোনরকম বিদ্রোহ হয় নি। স্থলবাহিনী নিজেদের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য এই দাবী জানাচ্ছে। তাঁর দেহরক্ষী হিসেবে চক্রবীরাওয়া রেজিমেন্টকে সরিয়ে প্যারাট্রুপ আনার জন্যও তিনি প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু সুহারতো সুকর্ণের কথায় কর্ণপাত করলেন না। প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তিনি হালিম বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন? সুকর্ণ কোন উত্তর দিলেন না।

পাঁচ ঘণ্টা ধরে সুকর্ণ এবং সুহারতোর তর্ক চলল। শেষ পর্যন্ত সুকর্ণ একটা বিবৃতি দিতে স্বীকার করলেন। রেডিও মারফৎ ঘোষণা করলেন:

> আমি আপনাদের প্রেসিডেন্ট কথা বলছি। এ আমার কণ্ঠস্বর। আমি

> এখনও জীবিত। আমার দেশবাসীরা, আমার সম্বন্ধে কোন শঙ্কা বা উদ্বেগ মনে পোষণ করবেন না। আমি এখনও জীবিত। দেশের শত্রুরা নানাভাবে দেশকে বিপন্ন করার চেষ্টা করছে। তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আপনাদের সচেতন হতে আহ্বান জানাচ্ছি। ইন্দোনেশিয়ার সমগ্র সামরিকবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে আমি স্থলবাহিনীর সমস্ত কর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেছি এবং দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার সমস্ত দায়িত্ব আমি জেনারেল সুহারতোর হাতে সমর্পণ করেছি।

নসুশান এবং সুহারতো চেয়েছিলেন যেন সুকর্ণ আরো পরিষ্কারভাবে বিদ্রোহের বিরুদ্ধে বিবৃতি দেন এবং অপরাধীদের চিহ্নিত করেন ; কিন্তু এই বিবৃতিটুকুও কম নয়। সুকর্ণের অপরাধী দুর্বল মনের সুযোগ নিয়ে চাপ দিয়ে জেনারেল সুহারতো দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা আদায় করেছেন। প্রেসিডেণ্টের ফরমান অনুযায়ী এখন সুহারতোই সামরিক শাসনের প্রধান।

সুহারতো নসুশানের পরামর্শমতো দেশে সামরিক আইন জারি করলেন। চারদিক থেকে সংবাদ আসছিল, বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে একত্র হয়ে পি. কে. আই-এর সভ্যেরা সমান তালে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এই বিদ্রোহের মূলে কোন্ দল তা বুঝতে সুহারতো এবং নসুশানের একটুও সময় লাগল না। উন্টুঙ্গের গঠিত "বৈপ্লবিক সমিতির" সভ্যের নামগুলিও কোন্ দলের, তা-ও তাঁরা জানতেন। তাছাড়া ১লা অক্টোবর এই বিদ্রোহকে "দেশাত্মবোধক এবং বৈপ্লবিক কাজ" বলে পি. কে. আই দলের দুটি দৈনিক পত্রিকা 'হরিয়ান রাকিয়ত' এবং 'বার্তা ভক্তি' অভিনন্দন জানিয়েছিল।

সুহারতোর প্রথম খড়্গ পড়ল এই দুটি পত্রিকার ওপর। সামরিক আইনে এই দুটি পত্রিকাকে বন্ধ করে দেওয়া হল। তারপর কমিউনিস্ট প্রভাবিত সরকারী সংবাদ সংস্থা 'আন্তারা'কে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হল যতদিন না 'আন্তারা' থেকে কমিউনিস্টদের দূর করা যায়।

জনসাধারণ এই ক'দিন কোন পক্ষই গ্রহণ করে নি। কি হয়েছে, কেন হয়েছে এবং কারা এই গণ্ডগোলে আছে—এই নিয়ে তারা জল্পনা-কল্পনাই করেছে, কিন্তু বিদ্রোহীদের শাস্তি দাবী করে নি।

৪ঠা অক্টোবর 'জাকর্তা ডেইলি মেইল' পত্রিকা একটি সাঙ্ঘাতিক নৃশংস কাহিনী প্রকাশ করল। মিসেস্ জামিলা নামে 'গেরওয়ানি'র এক সভ্যার বিবৃতি তারা তুলে ধরল তাদের পত্রিকায়। ছয়জন জেনারেলকে হালিম বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হয়েছিল। তারপর 'গেরওয়ানি'র একশ' জন সভ্যাকে সেখানে ডেকে পাঠানো হয়। মিসেস্ জামিলার বিবৃতি অনুযায়ী :

> ছুরি এবং খুর আমাদের দেওয়া হল। আমি একটা খুর পেয়েছিলাম। দূর থেকে আমরা দেখলাম লাল কাপড় দিয়ে দুটো হাত পিছমোড়া করে বাঁধা একজন বলিষ্ঠ পুরুষ শোওয়ার পোশাক পরা অবস্থায় পড়ে আছেন। তাঁর চোখ মুখও লাল কাপড় দিয়ে বাঁধা। আমাদের বলা হল ওঁকে প্রহার করে ওঁর যৌনাঙ্গ কেটে ফেলতে। প্রথমে শুরু করলেন মিসেস্ সাম্রো, তারপর আর সকলে।
>
> আমিও এই অত্যাচারে যোগ দিলাম।…
>
> এইভাবে প্রতিটি জেনারেলের ওপর অত্যাচার করা হয় যতক্ষণ না তাঁদের মৃত্যু হয়।

জামিলার এই বিবৃতি পড়ে সামরিকবাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে গেল হালিম বিমানবন্দরে। কোথায় সেনাপতিদের হত্যা করা হয়েছিল জামিলা দেখিয়ে দিলেন, কিন্তু তাঁদের মৃতদেহ কোথায় সরিয়ে ফেলা হয়েছে তা তিনি বলতে পারলেন না, তবে তিনি শুনেছেন যে কাছেই কোন একটা কুয়োর মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

সামরিকবাহিনী বিমানবন্দরের আশপাশ তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াতে লাগল। তারপর সেই কুয়ো খুঁজে পাওয়া গেল। লোকমুখে এটি 'কুমীর কুয়ো' নামে পরিচিত। প্রায় একশ' দশ ফুট গভীর, তিন ফুট চওড়া। ছয় জন সেনাপতি এবং জেনারেল পানজাইতানের দেহরক্ষীর

মৃতদেহ কুয়ো থেকে তুলে আনা হল। শুধু যে তাঁদের যৌনাঙ্গ কেটে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, তা নয়—চোখ বাঁধা লাল কাপড় খুলে দেখা গেল তাঁদের চোখগুলো খুবলে তুলে নেওয়া হয়েছে।

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ঘৃণা এবং আক্রোশ জাগ্রত করার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রতিটি দৈনিক সংবাদপত্রে মৃত সেনাপতিদের অত্যাচারিত দেহের ছবি প্রকাশ করলেন। এবং সেই সঙ্গে কিভাবে অত্যাচার করে তাঁদের হত্যা করা হয়েছে, তার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করলেন। টেলিভিশনে বারবার এই ছবি দেখানো হতে লাগল। রেডিওতেও জামিলার বিবৃতি বারবার শোনানো হতে লাগল।

সামরিকবাহিনী এই প্রচারে আশাতীত ফল লাভ করল। দেশের জনসাধারণ কমিউনিস্টদের শাসনক্ষমতা অধিকারের প্রচেষ্টায় এতদিন নীরব দর্শক ছিল, কিন্তু এবারে তাদের পুঞ্জিত আক্রোশ দুরন্ত ঝঞ্ঝার মতো ভেঙে পড়ল। ১লা অক্টোবর জাকর্তার সাদা দেয়ালে যেখানে সামরিকবাহিনীদের মুণ্ডপাতের স্লোগান লেখা ছিল, সেখানে এবার সেই স্লোগান চাপা দিয়ে লাল রঙে নতুন স্লোগান দেখা দিল :

হিদুপ আবরি
হিদুপ নসুশান
হিদুপ সুহারতো
গান্টুঙ উন্টুঙ্গ

এখানেই শেষ হল না। গুরু-মারা বিদ্যা প্রয়োগ করল গুরুর বিরুদ্ধে। প্রতি শহরের প্রতিটি দেয়াল এবার জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হল। স্লোগানের ঝড়ে এবার কমিউনিস্ট দল ভেসে গেল। দেয়ালে দেয়ালে নতুন স্লোগান ফুটে উঠল :

বুবরাকন পি কে আই
সালিপ আইদিত (আইদিতকে ক্রুশ-বিদ্ধ কর)
গঞ্জাঙ পি. কে. আই

গাণ্টুঙ লুকমান

আইদিত পহলওয়ান গেস্টাপু (আইদিত গেস্টাপুর সর্দার)

মহমিলুবকান সুবন্দ্রিয়ো

সোটে আইদিত (আইদিতকে পুড়িয়ে মারো)

কমিউনিস্ট পার্টির নারী-শাখা গেরওয়ানিও বাদ গেল না।

গেরওয়ানি চাবোল (গেরওয়ানি বারবনিতা)

গাণ্টুঙ গেরওয়ানি

গঞ্জাঙ গেরওয়ানি।

একদিকে যেমন পি. কে. আই এবং আইদিত প্রভৃতি জনসাধারণের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হল, সেইরকম নসুশান, সুহারতো, মৃত সেনাপতিবৃন্দ এবং সামরিকবাহিনীর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেল। জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সামরিকবাহিনী ডেকে তাদের আঞ্চলিক কমিউনিস্টদের ধরিয়ে দিতে লাগল। তিন দিনের মধ্যে হাজারের ওপর ছোট বড় কমিউনিস্ট নেতা ধরা পড়লেন।

জাকর্তার বিদ্রোহ দমন করতে বেশি সময় লাগে নি। মধ্য এবং পূর্ব যবদ্বীপে কমিউনিস্ট ঘাঁটি ছিল খুব শক্ত। সামরিকবাহিনীতে পর্যন্ত তাদের যথেষ্ট প্রভাব। এখানে খণ্ডযুদ্ধ চলতে লাগল। একটা গুজব হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ল যে উন্টুঙ্গ একদা যে দীপোনেগোরো বাহিনীর একটা ব্যাটালিয়নের অধিনায়কত্ব করেছিলেন, সেই দীপোনেগোরো বাহিনী জাকর্তা অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। সুহারতো সঙ্গে সঙ্গে ট্যাঙ্ক আর কামান দিয়ে জাকর্তাকে ঘিরে ধরলেন। দীপোনেগোরো বাহিনী কিন্তু এল না। বিদ্রোহীরা পশ্চাদপসরণ করতে করতে এবার গেরিলা যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করল। গেরিলা যুদ্ধে নসুশান একটি বিশ্ব-বিখ্যাত নাম। তাঁর রণ-কৌশলে গেরিলারাও আত্মগোপন করতে লাগল।

সিলিওয়াঙ্গি বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ইব্রাহিম আজি বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করলেন :

> সেনাবাহিনীর সহ্যেরও একটা সীমা আছে। যদি প্রতিরোধ বন্ধ না কর তো অত্যন্ত কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রেসিডেণ্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে যে-কোন কাজই বিপ্লবের বিরুদ্ধ-কাজ। দেশে আইন ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য মেজর জেনারেল সুহারতোর ওপর প্রেসিডেণ্ট যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তা সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ করার জন্য সেনাবাহিনী বদ্ধপরিকর।

জোগিয়াকর্তার বিদ্রোহ শেষ হল ৫ই অক্টোবর। পূর্ব-যবদ্বীপ শান্ত হল ১২ই, মধ্য-যবদ্বীপের প্রতিরোধ-ক্ষমতাও ভেঙে পড়ল।
গেস্টাপু আন্দোলন ধ্বংস হয়ে গেল পনের দিনের মধ্যেই।

২১

৩০শে সেপ্টেম্বর রাতে এবং পরদিন সকালে জাকর্তায় যখন এত বড় একটি নাটক অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তখন সুকর্ণের প্রধান পরামর্শদাতা এবং সিংহাসন-অভিলাষী সুবন্দ্রিয়ো কি করছিলেন ?

সকলেই জানে যে গেস্টাপু বিদ্রোহের দিন সকালে হঠাৎ জরুরী কাজে নিয়োতোর সঙ্গে তিনি সুমাত্রায় গিয়েছিলেন। ১লা অক্টোবর সকালে রেডিও জাকর্তা যখন এই বিদ্রোহের সাফল্যের কথা সাড়ম্বরে ঘোষণা করল, যখন বৈপ্লবিক সমিতির প্রতিষ্ঠা এবং তার সভ্যদের তালিকা প্রকাশ করল, তখন পর্যন্ত সুবন্দ্রিয়োর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। সুমাত্রাতেই তিনি তাঁর "জরুরী কাজে"র মধ্যে ডুবে ছিলেন।

রাত আটটায় জাকর্তা রেডিওর ঘোষণা তাঁকে বিচলিত করে তুলল। রেডিও ঘোষণা করছে যে বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে! বিশ্বাস হয় নি সুবন্দ্রিয়োর। প্রধান সেনাপতিরা প্রায় সকলেই নিহত। পরিকল্পনা মতো সব কিছুই ঘড়ির কাঁটা ধরে চলেছে। চক্রবীরাওয়া বাহিনী জাকর্তার প্রাণশক্তি, তাদের সঙ্গে রয়েছে পেমুদা রাকিয়াত, ফ্রন্ট-পেমুদা পুসট অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। এত তাড়াতাড়ি বিদ্রোহ ধ্বংস হওয়া সম্ভব নয়, হয়তো শুধু রেডিও স্টেশনই হস্তচ্যুত হয়েছে।

সুবন্দ্রিয়োর তবু সংশয় যায় না। শাসনক্ষমতা যদি এখনও উন্টুঙের হাতে থাকে তবে তাঁর কোন ভয় নেই। নসুশান যদি বিদ্রোহ দমন করতে পেরে থাকেন তবেই তাঁর সমূহ বিপদ। সামরিকবাহিনী তাঁর এতদিনকার শত্রুতার ঋণ সুদে আসলে শোধ করবে। জাকর্তায় ফিরে যাওয়াই ভাল—ঘটনার কাছাকাছি থাকা যাবে এবং সঠিক সংবাদ

পাওয়া যাবে। আর যদি বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে থাকে তবে বলা যেতে পারে যে বিদ্রোহের সংবাদ শুনেই তিনি জাকর্তায় ফিরে এসেছেন। কিন্তু অতি বড় হুঁসিয়ার সুবন্দ্রিয়ো চালে একটু ভুল করেছিলেন। ১লা অক্টোবর রাত্রে ফিরে এলেন জাকর্তায় বিমানে করে, কিন্তু নামলেন—জাকর্তার বেসামরিক বিমানবন্দর কেবাজোরানে নয়,—নামলেন সামরিক বিমানবন্দর হালিমে। এর আগে যতবার তিনি বাইরে গিয়েছেন কিংবা বাইরে থেকে এসেছেন কোনদিন হালিম বিমানবন্দর ব্যবহার করেন নি। তবে এবারে কেন?

হালিম বিমানবন্দরে এসে তাঁর দলের কাউকে না দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তবে কি সত্যসত্যই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে? রাত্রে জাকর্তায় ফিরে যেতে সাহস হল না। একটু সময়ও দরকার ভবিষ্যৎ পন্থা নির্ধারণের। সুকর্ণ কোথায় গেছেন জানতে পারলেও হত।

সকালে এসে পৌঁছুলেন বিমানবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওমর দানি। তাঁর কাছ থেকে সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। চুপসে যাওয়া বেলুনের মতো অবস্থা হল সুবন্দ্রিয়োর। বিমানবন্দর থেকে সোজা গেলেন বোগোর প্রাসাদে সুকর্ণের সঙ্গে দেখা করতে। প্রহরারত সামরিকবাহিনী জেনারেল নসুশান কিংবা জেনারেল সুহারতোর আদেশ ছাড়া কাউকে বাড়িতে প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকার করল। ফিরে এলেন নিজের বাড়িতে।

৪ঠা অক্টোবর প্রেসিডেন্ট সুকর্ণকে নিয়ে আসা হল মেরডেকা প্রাসাদে। অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নেই—সেই সাইরেন বাজানো অগ্রদূত মোটর-বাইকের দল, চারদিকে সাঁজোয়া গাড়ি—কিন্তু এবারে রক্ষীদল আর চক্রবীরাওয়া বাহিনীর নয়, প্যারা-কম্যাণ্ডো বাহিনীর। সুকর্ণ এখনও সম্মানিত রাষ্ট্রপতি, কিন্তু কার্যতঃ সামরিক বন্দী। বিদ্রোহের ঝড়ের প্রথম প্রকোপ চলে গেলে পর আবহাওয়া শান্ত না হওয়া পর্যন্ত সামরিক কর্তৃপক্ষ সুকর্ণকে তাদের নজরবন্দী করে রাখার সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করে। এই বিদ্রোহে সুকর্ণের হাত কতখানি তা-ও বিচার করে দেখতে হবে।
সুকর্ণ মেরডেকা প্রাসাদে আসামাত্র নাসাকোম সরকারের মন্ত্রীরা একে একে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সামরিক কর্তৃপক্ষ বাধা দিল না। সকলে একত্রে এক জায়গায় থাকলে তাঁদের ওপর দৃষ্টি রাখা সহজ হবে।

৬ই অক্টোবর। নিহত সেনাপতিদের বিকৃত মৃতদেহ শবাধারে নিয়ে বিভিন্ন স্থলবাহিনীর প্রতিনিধিবৃন্দ এক বিরাট মৌন-মিছিল করে এল ন্যাশানাল হিরোজ সিমেট্রিতে। পথের দুধারে দাঁড়িয়ে অগণ্য জনতা এই বীর শহীদদের ওপর পুষ্প বর্ষণ করে শেষ বিদায় জানাল। সিমেট্রিকে রক্ষা করার জন্য নিযুক্ত হয়েছে কুড়িটি ট্যাঙ্ক এবং সিলিওয়াঙ্গি ডিভিশনের একদল সৈন্য। বিমান-বিধ্বংসী কামানগুলি আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। সেনাবাহিনী এখনও বিমানবাহিনীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত নয়। তাদের অতর্কিত আক্রমণ সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা।
এই বীর সেনাপতিদের শেষ বিদায় জানাতে এলেন না ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ। তাঁর মানসিক অবস্থা এমন নয় যে তিনি এই গুরুদায়িত্ব বহন করতে পারেন। তাঁর পরিবর্তে ক্রাচে করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে অগ্রসর হলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল নসুশান। তাঁর একমাত্র কন্যা এর্মার শেষকৃত্য সম্পাদন করে এলেন সেনাপতিদের বিদায় জানাতে।
দশ হাজার ইন্দোনেশীয় দূর থেকে এই দৃশ্য দেখতে লাগল। নসুশান বীর সেনাপতিদের বিদায়-অভিবাদন জানিয়ে বললেন :

আমরা যারা জীবিত আছি তারা জানি যে আপনারা সত্য এবং

ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। আমাদের অন্তঃকরণে আপনারা তাই বিজয়ী বীর। আমরা বিশ্বাস করি যে শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হবে।

সারা জাকর্তায় সকলেই এই কথা আলোচনা করতে লাগল—প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ যেখানে বক্তৃতা দেওয়ার কোন সুযোগ ত্যাগ করেন না, তখন পদাধিকার বলে যে সেনাবাহিনীর তিনি সর্বময় কর্তা সেই সেনাবাহিনীর প্রধান প্রধান সেনাপতিদের শেষ বিদায় জানাতে কেন উপস্থিত হলেন না! তবে কি এই বিদ্রোহের সঙ্গে তাঁরও যোগ ছিল? সুবন্দ্রিয়োর পরামর্শমতোই কি আবার তিনি পরিচালিত হচ্ছেন?

পরদিন সুকর্ণ তাঁর নাসাকোম মন্ত্রীসভার জরুরী অধিবেশন আহ্বান করলেন। এবারে যোগ দিলেন না পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল নসুশান। আর যোগ দিলেন না তিনজন কমিউনিস্ট মন্ত্রী—আইদিত, লুকমান ও নিয়োতো, যদিও অন্য দু'জন কমিউনিস্ট মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। আইদিত, লুকমান এবং নিয়োতোর কোন সংবাদ নেই।

সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে রুদ্ধদ্বার কক্ষে এই মন্ত্রীসভার অধিবেশন বসল। গেস্টাপু আন্দোলন সম্বন্ধেই বিশেষ করে আলোচনা হল। সুকর্ণের সান্নিধ্যে এসে সুবন্দ্রিয়ো আবার যেন তাঁর আগেকার সাহস এবং কূটবুদ্ধি ফিরে পেয়েছেন। এই অধিবেশনে তিনিই কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন। নাসাকোম মন্ত্রীসভার অধিকাংশ সভ্যের অভিমত নাকচ করে এই মন্ত্রীসভা গেস্টাপু আন্দোলনকে নিন্দা করতে স্বীকৃত হল না।

অধিবেশন শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের সুবন্দ্রিয়ো জানালেন যে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ তাঁর মন্ত্রীসভার সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করেছেন যে (১) এই বিদ্রোহ সামরিকবাহিনীর আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং তার ব্যবস্থা সামরিকবাহিনীই গ্রহণ করবে, (২) এই বিদ্রোহে কমিউনিস্টরা

কোনরকম সহযোগিতা করে নি, এবং (৩) দেশে আবার একতা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন এবং সেইজন্য 'নাসাকোম' সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা উচিত।

সামরিকবাহিনী সুকর্ণ-সুবন্দ্রিয়োর এই অভিমতে কর্ণপাত করল না, জনসাধারণ উঠল ক্ষেপে। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল না, উপরন্তু তাদের এই দুষ্কৃতিকে অস্বীকার করা হচ্ছে না দেখে জনসাধারণ কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে স্লোগানের ঝড় তুলে মিছিল করে হৈ-চৈ বাধিয়ে তুলল। দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার:

পেকিঙ কাসিফ পি. কে. আই
বুরবাকন পি. কে. আই
গাণ্টুঙ আইদিত
হিদুপ নসুশান
হিদুপ সুহারতো

সুকর্ণকে আবার মুখ খুলতে হল। জনগণের উদ্দেশ্যে তিনি জানালেন যে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে এই বিদ্রোহের রাজনৈতিক সমাধান সন্ধান করছেন, সুতরাং জনগণ যেন ততদিন শান্ত থাকে এবং জনগণ যেন ইন্দোনেশিয়ার বিপ্লবের প্রধান শত্রু নেকোলিমের আত্মঘাতী কার্য-কলাপ সম্বন্ধে খরদৃষ্টি রাখে।

দেশের অবস্থা একটু শান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামরিকবাহিনী সুবন্দ্রিয়োর ওপর দৃষ্টি দিল। সুবন্দ্রিয়োর বাড়িতে বসল কড়া পাহারা, সুবন্দ্রিয়োর পিছনে পিছনে সর্বত্র লেগে রইল দু'জন সামরিক দপ্তরের কর্মী। সুবন্দ্রিয়োর আহার-নিদ্রা দূর হওয়ার অবস্থা। সুকর্ণের কাছে তিনি এ বিষয়ে অভিযোগ জানালেন, কিন্তু সুকর্ণও নিরুপায়। তাঁকেও কার্যত নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত সুবন্দ্রিয়ো একদিন জেনারেল সুহারতোর কাছে দরবার

করলেন। জানালেন যে তিনি এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে একেবারে নির্দোষ, গেস্টাপুর বিদ্রোহের তিনি বিন্দুবিসর্গও জানতেন না।

জেনারেল সুহারতোর জবাব হল—এই ষড়যন্ত্রের কুলকিনারা করার আদেশ হয়েছে আমাদের ওপর এবং আমরা তাই করে যাচ্ছি। আপনার অপরাধ কিংবা নির্দোষিতা প্রমাণিত হবে সাক্ষী-প্রমাণের ওপর।

সুবন্দ্রিয়ো অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে একদিন সামরিক-বাহিনী তাঁর বাড়ি খানাতল্লাস করে কিছু কাগজপত্র নিয়ে চলে গেল। সুবন্দ্রিয়ো আর নিজের বাড়িতে থাকতে সাহস পেলেন না। সোজা চলে গেলেন সুকর্ণের প্রাসাদে এবং তাঁর আশ্রয় ভিক্ষা করলেন। প্রেসিডেণ্ট যখন মেরডেকা প্রাসাদ থেকে বোগোর প্রাসাদে যান, সঙ্গে যান সুবন্দ্রিয়ো। সুকর্ণ যখন যে-ঘরে যান, সুবন্দ্রিয়ো সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিছন পিছন সেখানে হাজির। সুকর্ণ ই তাঁর এখন একমাত্র ভরসা। সুকর্ণের সামনে সামরিকবাহিনী তাঁকে কিছু করতে সাহস করবে না। বিমানবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ওমর দানি-ও সুবন্দ্রিয়োর মতো সুকর্ণের আশ্রয়ে এসে উঠলেন।

জনসাধারণ বিভ্রান্ত বোধ করতে লাগল। সামরিকবাহিনীর সংবাদপত্র-গুলি দিনের পর দিন সুবন্দ্রিয়ো এবং ওমর দানিকে গেস্টাপু ষড়যন্ত্রে জড়িত বলে অভিযুক্ত করছে, অথচ সুকর্ণ তাঁদের দুজনকে বরাভয় দিয়ে নিজের আশ্রয়ে রেখেছেন! তারাও সুকর্ণের সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। এবারে সুবন্দ্রিয়ো নিজেকে অভিযোগ-মুক্ত করার জন্য তাঁর পরিচালিত ইংরাজি দৈনিক পত্রিকা "ইন্দোনেশিয়ান হেরাল্ড"-এর ১২ই অক্টোবরে একটি সম্পাদকীয় লিখলেন :

> ১লা অক্টোবরকে ইন্দোনেশীয় জনসাধারণ জাতীয় দুঃখের দিন বলে স্মরণ করবে। এইদিন ভোরে 'গেস্টাপু' ইন্দোনেশীয় সরকারের গঠন

> পরিবর্তন এবং রাষ্ট্রপতি ও ইন্দোনেশীয় বিপ্লবের মহান্ নেতার পদ থেকে অপসারণের দুশ্চেষ্টা করে।
>
> নেকোলিম শক্তিবর্গ আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে। ইন্দোনেশিয়ায় এইরকম এক পরিস্থিতির জন্যই তারা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল।……তাদের মুখপাত্র "মালয়সিয়ার তথ্যমন্ত্রী", শোনা গেছে, এই ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন যে ইন্দোনেশিয়া শীঘ্রই "মালয়সিয়ার" সঙ্গে শান্তি-চুক্তির কথা চিন্তা করবে।
>
> কিন্তু তাদের শোচনীয়ভাবে হতাশ হতে হয়েছে। মেজর জেনারেল সুহারতোর নেতৃত্বে সামরিকবাহিনী অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দেশে শাসন ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছেন।……
>
> দেশের ঐক্য ব্যাহত না হওয়ায় ইন্দোনেশিয়া এখন আবার তার সবচেয়ে বড় শত্রু নেকোলিম-এর বিরুদ্ধে মন-প্রাণ নিযুক্ত করতে পারবে। সিঙ্গাপুর পৃথক হওয়ার পর এবং পাকিস্তান কূটনীতিক সম্বন্ধ ছেদ করায় "মালয়সিয়া" দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়া সত্ত্বেও এখনও আমাদের দেশের দোরগোড়ায় বিদেশী সামরিকবাহিনীর এক ভয়ঙ্কর আবাসস্থল হয়ে রয়েছে।
>
> এইজন্য ইন্দোনেশিয়ার কাছে প্রধান জাতীয় কর্তব্য হল নেকোলিমদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। দেশের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং গেস্টাপু আন্দোলনের নেতাদের শাস্তিবিধানে যদিও আমরা সাহায্য করছি, তবুও আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা উচিত "দ্বিকোরা"কে সফল করায়।…

এইভাবে চলল জনসাধারণের দৃষ্টিকে 'গেস্টাপু' আন্দোলনের পরিবর্তে অন্যদিকে চালিত করার চেষ্টা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণকে সাহায্যের আহ্বান জানিয়ে, আফ্রিকা ও এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশকে নেকোলিমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সম্পাদকীয় শেষ হল এইভাবে :

> Indeed, GESTAPU must not be allowed to cause any

relaxation in our confrontation against "Malaysia.' While the threat caused by GESTAPU to law and order is serious, we must never relax our determination to face the ever increasing danger of necolim subversion, interference and intervention.

কিন্তু জনসাধারণ কিংবা সামরিক কর্তৃপক্ষ কেউই আর এখন নেকোলিম-জুজুর ভয় দেখতে কিংবা 'মালয়সিয়া'র সঙ্গে কনফ্রন্টাসি করতে রাজি হল না। পি. কে. আই এবং তাদের অনুষ্ঠিত বিদ্রোহের সঙ্গে সমস্ত সংস্রব অস্বীকার করার সুবন্দ্রিয়োর সর্বরকম প্রচেষ্টাকেও কেউ বেশি আমল দিল না। সামরিক কর্তৃপক্ষ তো ঘোষণাই করল যে সুবন্দ্রিয়োর বাড়িতে খানাতল্লাস করে এমন কাগজপত্র তারা হস্তগত করেছে যাতে এই ষড়যন্ত্রে তাঁর অন্যতম প্রধান ভূমিকা প্রমাণিত হবে।

সুকর্ণও জনসাধারণের বিরূপ সমালোচনার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। মৃত সেনাপতিদের শেষকৃত্যে তাঁর উপস্থিত না হওয়াকে কেউ সুনজরে দেখে নি। আবার সুবন্দ্রিয়োর পরামর্শে তিনি যখন জেনারেল নসুশানের মৃত কন্যার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে অনুপস্থিত হলেন তখন তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ গুরুতর আকার ধারণ করল। নসুশানকে সুবন্দ্রিয়ো এবং পি. কে. আই বরাবর সবচেয়ে বড় শত্রু বলে মনে করে এসেছেন। তিনি বেঁচে থাকলে কোন বিদ্রোহ সফল সম্ভব নয় বলেই তাঁকেই প্রথম হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল এবং তাঁর বেঁচে থাকার জন্যই এই বিদ্রোহ এত তাড়াতাড়ি ব্যর্থ হয়েছে।

সুকর্ণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ যখন খুব গুরুতর আকার ধারণ করল, তখন একদিন মেরডেকা প্রাসাদে সুকর্ণ নসুশান এবং তাঁর স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন সান্ত্বনা দেবার জন্য। মিসেস্ নসুশানের দুঃখম্লান মুখের দিকে

তাকিয়ে সুকর্ণের আদরিণী জাপানী স্ত্রী রত্নাসারি দেবী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠে সুকর্ণকে বলে উঠলেন—যে কমিউনিস্টরা এরকম ভদ্র লোককে এত কষ্ট দিতে পারে, তাদের তুমি শাস্তি দিচ্ছ না কেন?

সুকর্ণ উত্তর দিলেন—এসব ব্যাপার তোমার মাথায় ঢুকবে না। মেয়েদের বুদ্ধির বাইরে এসব ব্যাপার।

তারপর নসুশানের দিকে তাকিয়ে বললেন—তুমি 'দেওয়ান জেনারেল'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলে?

নসুশান অস্বীকার করলেন।

সুকর্ণ বললেন—'দেওয়ান জেনারেল' যে ষড়যন্ত্র করছিল—সে কথা তো জান?

না—গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন নসুশান।

দুনিয়াশুদ্ধ সকলে জানত আর তুমি জানতে না!—বলে উঠলেন সুকর্ণ।—ইয়ানি আর তার দলবল যে আমার হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল সে কথা নিশ্চয়ই জানতে?

নসুশান আবার অস্বীকার করলেন।

রাগে ফেটে পড়লেন সুকর্ণ। চীৎকার করে উঠলেন—মিথ্যাবাদী! তুমি নিশ্চয়ই জানতে—

এবার নসুশান উত্তর দিলেন—বাপক, মিথ্যা দোষারোপ হত্যার চেয়েও খারাপ—

সুকর্ণ চোখ নামিয়ে নিলেন। একটু পরেই অসুস্থতার অজুহাতে ভিতরে চলে গেলেন। এই প্রথম তাঁকে একরকম স্পষ্টভাবে সেনাপতিদের হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

১৭ই অক্টোবর নসুশান এবং সুহারতো গেস্টাপু ষড়যন্ত্রের সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য নিয়ে সুকর্ণের কাছে একটি রিপোর্ট পেশ করলেন। বিচারের ভার দেওয়া হল প্রেসিডেন্টের ওপর।

কিন্তু তখনও অনুসন্ধান শেষ হয় নি। পরাজিত কমিউনিস্টদের কাছ

থেকে চীনা অস্ত্রশস্ত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাওয়ার পর থেকেই লুকোনো অস্ত্রশস্ত্রের অনুসন্ধান চলল। পাহাড়ের গুহায়, জঙ্গলে এবং সামরিক বিমানবন্দরে আরো অনেক অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ আবিষ্কৃত হল।

জেনারেল সুহারতো সুকর্ণের সামনেই জেনারেল ওমর দানিকে চীনা অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে জেরা করতে লাগলেন। কিছু প্রশ্নের তিনি উত্তর দিতে অস্বীকার করলেন, কিছু প্রশ্নে নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইলেন। প্রেসিডেন্টের সামনেই সুহারতো দানির গালে এক চড় কষিয়ে দিয়ে তাঁর পোশাক থেকে মিলিটারি ডেকোরেশনগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। সুকর্ণ একবার প্রতিবাদ করতেও সাহস করলেন না।

১৯শে অক্টোবর সুকর্ণ তাঁর রাজনৈতিক সমাধানের প্রথম অংশ প্রকাশ করলেন। জেনারেল ওমর দানিকে বিশেষ রাজকার্যে দেশের বাইরে পাঠান হবে। সেই রাতেই জেনারেল দানি জাকর্তা ত্যাগ করলেন। সুকর্ণের নাসাকোম-স্বর্গে ভাঙন দেখা দিল।

২২

উণ্টুঙ্গ শব্দের অর্থ ভাগ্যবান।

কিন্তু লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল উণ্টুঙ্গের ওপর ভাগ্যদেবী প্রথম থেকেই বিশেষ সুপ্রসন্না ছিলেন না। যে-সুকর্ণের মৃত্যু অবধারিত, সেই সুকর্ণ ঘণ্টাখানেক বাদে সুস্থ হয়ে উঠলেন। আটজন প্রধান সেনাপতিকে হত্যা করার জন্য যে পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ সফল হতে পারল না। আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়ে গেলেন জেনারেল নসুশান এবং মেজর জেনারেল সুহারতো। আর এই নসুশান এবং সুহারতোই তাঁর প্রাথমিক জয়লাভকে ব্যর্থ করে মাত্র বারো ঘণ্টার মধ্যে জাকর্তাকে নিজেদের কর্তৃত্বে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেন। কিন্তু ভাগ্যের খেলা এখানেই শেষ হল না।

উণ্টুঙ্গ হালিম বিমানবন্দর থেকে আইদিতের সঙ্গে পালিয়ে গেলেন মাদিউনে। এখানে এসে দুজনে দুই পথ বেছে নিলেন। সামরিক পোশাক ত্যাগ করে উণ্টুঙ্গ সাধারণ ইন্দোনেশীয়ের সজ্জায় মধ্য-যবদ্বীপে আত্মগোপন করলেন। সামরিকবাহিনী তাঁর অনুসন্ধান করছিল, কিন্তু সন্ধানের কাজ জোরদার করে তুলতে পারে নি ; কারণ তখনও ইতস্ততঃ লড়াই চলছিল। এই সুযোগে উণ্টুঙ্গ মধ্য-যবদ্বীপের দুরগম্য জঙ্গলে আস্তানার সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

টেগাল থেকে সেমারঙ্গে যাওয়ার জন্য তিনি বাসে উঠলেন। বাসের কোন যাত্রী কল্পনাই করে উঠতে পারে নি যে তাদেরই এক সহযাত্রী হয়েছেন 'গোস্টাপু'র অন্যতম নায়ক উণ্টুঙ্গ এবং যাঁকে সামরিক কর্তৃপক্ষ সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। অন্যান্য যাত্রীদের চোখে ধুলো দিতে পারলেও দুজন যাত্রীর চোখকে ফাঁকি দিতে উণ্টুঙ্গ পারলেন না।

উন্টুঙ্গ যখন দীপোনেগোরো বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন, এই দুজন তখনও সেই সেনাবাহিনীর সামান্য সৈনিক ছিল।

এই দুই সৈনিককে তাঁর দিকে নীরব বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে উন্টুঙ্গ প্রমাদ গণলেন। কাউকে কিছু বোঝার অবকাশ না দিয়েই তিনি চলন্ত বাস থেকে লাফিয়ে পড়লেন। সৈনিক দুজনও 'উন্টুঙ্গ' 'উন্টুঙ্গ' বলে চীৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বাস থেমে পড়ল। সমস্ত যাত্রী চীৎকার করে উন্টুঙ্গের পিছু তাড়া করল। উন্টুঙ্গ বেশিদূর পালাতে পারলেন না, জনতার হাতে ধরা পড়লেন। জনতার হাতে প্রচুর নিগৃহীতও হলেন তিনি। তাঁকে সৈনিক দুজন ধরে নিয়ে গিয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করল।

পরাজিত এবং ক্লান্ত উন্টুঙ্গ গেস্টাপু আন্দোলনের দায়িত্ব স্বীকার করলেন। অত্যন্ত ক্ষোভে ও দুঃখে তিনি বলে উঠলেন—ওই সুকর্ণ-ই আমাকে ডুবিয়েছেন।

তিনি জানালেন যে সুকর্ণ এবং আইদিত তাঁকে জানিয়েছিলেন যে প্রধান সেনাপতিরা সুকর্ণের হাত থেকে শাসনক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করছেন। এই ক্ষমতা অধিকারের দিন নির্দিষ্ট হয়েছিল ৫ই অক্টোবর। এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্য তার আগেই ষড়যন্ত্রকারীদের হত্যা করে শাসনক্ষমতা অধিকার করা প্রয়োজন। উন্টুঙ্গের চক্রবী-রাওয়া বাহিনীকে সাহায্য করতে স্বীকার করেছে দানির বিমানবাহিনী এবং হারতোনোর মেরিন। পি. কে. আই তার বিভিন্ন সংস্থা নিয়ে তাঁকে সব রকমে সাহায্য করবে বলে জানিয়েছিল।

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের বিরুদ্ধে জেনারেলদের ষড়যন্ত্রের কথা উন্টুঙ্গ বিশ্বাস করেই এই গেস্টাপু আন্দোলনে সম্মত হন এবং জানান যে তিনি শুধু প্রেসিডেন্টের আদেশ পালন করেছেন, কোনও অপরাধ করেন নি।

উন্টুঙ্গকে মিলিটারি ট্রাইবুনালে বিচারের জন্য পাঠানো হল।

দীপ মুসনতারা আইদিত মাদিউনে উপস্থিত হয়েই বিমানবাহিনীর আর একটি প্লেন নিয়ে জোগিয়াকর্তায় উপস্থিত হলেন। এখানে তিনি পার্টির লোকদের সঙ্গে দেখা করে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ সফল করার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বললেন। লুকমান এবং নিয়োতোর ওপর তিনি এই সংগ্রাম চালানোর দায়িত্ব অর্পণ করে নিজে আত্মগোপন করলেন। লুকমান এবং নিয়োতোর প্রধান কাজ হবে বিদ্রোহ সফল না হওয়া পর্যন্ত সুকর্ণের সাহায্যে কমিউনিস্টদের আসন ইন্দোনেশিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা।

সামরিকবাহিনী এই বিদ্রোহের প্রকৃত নেতা আইদিতকে ধরার জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করল। সিলিওয়াঙ্গি বাহিনীর জেনারেল ইব্রাহিম আজির ওপর সুহারতো এই ভার অর্পণ করলেন। জেনারেল আজি আবার কর্ণেল সার্বো এধিকে আদেশ করলেন যে "জীবিত বা মৃত" অবস্থায় আইদিতকে ধরা চাই-ই।

কিন্তু আইদিতকে ধরা সহজ কথা নয়। প্রায় আট হাজার দ্বীপের মধ্যে কোন পার্বত্য বা অরণ্য অঞ্চলে তিনি আত্মগোপন করে আছেন—কে বুঝতে পারবে? তবে অতিরিক্ত আত্ম-প্রত্যয় মাঝে মাঝে অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। পার্টির লোকদের আনুগত্যে বিশ্বাসী আইদিত জানতেন যে তাদের আশ্রয়ে আত্মগোপন করে থাকলে কেউ তাঁর সন্ধান পাবে না। সেই ভরসায় পার্টির লোকদের কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়ার জন্য সুরাবায়ার একটি কমিউনিস্ট পত্রিকা 'জালান রাকিয়ত'-এ ৬ই অক্টোবর তিনি একটি পত্রাঘাত করলেন:

> As is well known, it is the consistent stand of the P K I to agree to measures for purification within all revolutionary instruments and guard the safety of President Sukarno and the Republic of Indonesia. As for the Dewan General, the P K I disapproves of

it and condemns *it*. I call upon all members of the P K I to continue carrying out their tasks, namely to smash the devils.

এই চিঠিটাই আইদিতের কাল হল।

এই চিঠি পড়ে কর্ণেল এধি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলেন যে আইদিত অন্ততঃ ৫ই অক্টোবর সুরাবায়াতে ছিলেন। এধির সৈন্যদল তাই সুরাবায়ার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আস্তে আস্তে কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। চারদিকে তখন নানারকম গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। কখনও নাকি আইদিতকে দেখা গেছে মাদিউনে, কখনও মালানে, কখনও বা সুরাবায়ায়। সেলেবিসের মাকাসারে এবং সুমাত্রার পালেমবাঙেও আইদিতের উপস্থিতি ঘোষিত হল। সুরাবায়ার কাছাকাছি একটা চীনা সাবমেরিনের সন্ধান পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভাইস অ্যাডমিরাল মার্তাদিনাতা সুরাবায়ার উপকূল পাহারা দেওয়ার জন্য যুদ্ধজাহাজ পাঠালেন।

সামরিকবাহিনীর গুপ্তচরেরা সন্ধান পেল যে আইদিত সোলোর দিকে পালাচ্ছেন। সোলো তখন পি. কে. আই-এর সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি। সোলো, বোয়ালালি এবং ক্লাটেন শহরগুলিতে পি. কে. আই-এর সভ্যেরা সন্ত্রাস শুরু করে দিয়েছে। একদিনে পাঁচশ'র বেশি নিরীহ নাগরিককে হত্যা করে তারা অন্যান্য নাগরিককে শহর তিনটি ছাড়তে বাধ্য করল। তাদের পরিবর্তে দলে দলে কমিউনিস্ট এসে উপস্থিত হল সেখানে।

এই সংবাদ পেয়ে কর্ণেল এধি বুঝতে পারলেন যে আইদিতের গন্তব্যস্থল হয়েছে সোলো। আইদিত অনুসন্ধানের হেডকোয়ার্টার বসালেন সোলোর বারো মাইল উত্তর-পূর্বে। এই অনুসন্ধানের দায়িত্ব

গ্রহণ করলেন মেজর সাজিদিমান। মেজর সাজিদিমান ঘোষণা করলেন —আইদিত যেমন ইতিহাসকে ফাঁকি দিতে পারবেন না, সেইরকম আমাদেরও ফাঁকি দিতে পারবেন না।

কমিউনিস্টদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে উত্যক্ত জনসাধারণ এবার সামরিক-বাহিনীর সাহায্যে নামল। হাজার হাজার ইন্দোনেশীয় বাঘ তাড়ানোর মতো বন-জঙ্গল, পাহাড়-জলা খুঁজে বেড়াতে লাগল। আইদিত সোলোতে থাকা বিপজ্জনক দেখে মেরবাবু-মেরাপি পর্বতমালার দিকে পালাতে লাগলেন, কিন্তু সেখানে তখন বিশাল এক জনতা তাঁর খোঁজ করে বেড়াচ্ছে। উপায়ান্তর না দেখে তিনি মধ্য-যবদ্বীপে প্রবেশ করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু এধি'র সেনাবাহিনীর তাড়ায় তিনি আবার পিছু ফিরলেন। আইদিতকে বন্দী করার জন্য এধি সোলোকে তিন দিক থেকে ঘিরে রেখে একদিক শুধু উন্মুক্ত রাখলেন। আইদিত এধির চাতুরী বুঝতে না পেরে সেই উন্মুক্ত পথেই সোলোতে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে সেনাবাহিনী সোলো ঘেরাও করে অগ্রসর হতে লাগল।

২২শে নভেম্বর সোলোর একদল নাগরিক এসে সেনাবাহিনীকে গোপনে সংবাদ দিয়ে গেল যে সামবেঙ্গ গ্রামের মোড়লের বাড়িতে আইদিতকে দেখা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনী মোড়লের বাড়ি ঘিরে ধরল, কিন্তু তার বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আইদিতকে পাওয়া গেল না। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসার সময় একজন সৈন্যের কেমন যেন একটা খটকা লাগল। একটা কাঠের আলমারির সামনে একজোড়া খড়ম পড়ে আছে কেন?

সে বাইরে বেরিয়ে এসে মেজর সাজিদিমানকে এই ঘটনাটুকু জানাল। সাজিদিমানের কাছে তখন ব্যাপারটা পরিস্ফুট হয়ে গেল। তিনি রিভলভার হাতে এগিয়ে গিয়ে আলমারির দরজা টেনে খুললেন। সেই আলমারি থেকে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং আইদিত। তাঁকে বন্দী করে

বিজয়-গর্বে মেজর সাজিদিমান তাঁকে নিয়ে উপস্থিত হলেন কর্ণেল সার্ন্বো এধি'র হেড কোয়ার্টারে।

গেস্টাপু বিদ্রোহের কর্ণধার এবং সেনাপতিদের হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আইদিতকে সামরিকবাহিনী কি ভাবে গ্রহণ করেছিলেন জানা যায় নি। এই বিদ্রোহে তাঁর এবং পি. কে. আই-এর ভূমিকা কতখানি তা জানার জন্য তারা তাঁর ওপর নৃশংস উৎপীড়ন নিশ্চয়ই করেছিল নয়তো আইদিত সহজে কোনরকম কথা বলতেন না। তাঁর স্বাক্ষরিত অপরাধ-স্বীকৃতি সামরিক কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহীদের বিচারে দাখিল করে। টোকিওর 'আসাহি ইভনিং নিউজ' পত্রিকা আইদিত-এর এই সুদীর্ঘ অপরাধ-স্বীকৃতির সারাংশ জনসমক্ষে প্রথম প্রকাশ করে :

> ৩০শে সেপ্টেম্বরের ঘটনার সর্বপ্রধান দায়িত্ব ছিল আমার এবং পি. কে. আই-এর অধীনস্থ সংস্থাগুলি আমাকে সর্ববিষয়ে সাহায্য করে।
>
> পি. কে. আই প্রথমে ক্ষমতা-অধিকারের জন্য ১৯৭০ সন স্থির করে, কিন্তু এই পরিকল্পনার সংবাদ বাইরে প্রকাশ পেয়ে যায় যার ফলে স্থলবাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক আর সুস্থিত থাকে না। এইজন্য পূর্বেকার পরিকল্পনা পরিবর্তন করে যত শীঘ্র শাসন-ক্ষমতা অধিকার করা যায় তার ব্যবস্থা করা হয়।
>
> আমি একটা পরিকল্পনা তৈরি করে ১৯৬৫ সনের ১লা মে তাকে কার্যকরী করার জন্য প্রস্তাব করি, কিন্তু পার্টির অন্যান্য নেতা—লুকমান, নিয়োতো, সাকিলমান ও নয়নো—এই প্রস্তাবে আপত্তি জানান। তাঁরা জানান যে ঠিকমতো প্রস্তুতি না করে এ ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক হবে এবং এই পরিকল্পনা একেবারেই ব্যর্থ হবে।
>
> ১৯৬৫ সনের জুন মাসের পর থেকেই লেফটেন্যান্ট কর্ণেল উন্টুঙ্গ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে এই বিষয়ে অনেকবার আলোচনা হয়।
>
> ১৯৬৫ সনের জুলাই মাস থেকে পেমুদা রাকিয়ত এবং গেরওয়ানির সভ্য-সভ্যাদের জাকর্তার শহরতলি হালিম বিমানবন্দরে নিয়ে গিয়ে

হাল্কা এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্রে শিক্ষা দেওয়া হতে থাকে এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রস্তুতির কাজ দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল।

অগাস্ট মাসের প্রথম দিকে আলজিয়ার্স থেকে ফেরার পথে আমি পেকিঙ-এ কিছুদিন থাকি এবং চীনা নেতাদের সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করি। জাকার্তায় ফিরে সেই মাসেরই মাঝামাঝি আমাদের একটি গোপন সভা বসে। শাসনক্ষমতা অধিকারের পরিকল্পনায় কার্যক্রম লুকমান, নিয়োতো, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সুপার্জো এবং লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল উণ্টুঙের সঙ্গে আলোচনা করা হয়।

আমরা খবর পেয়েছিলাম যে অবৈধভাবে আনীত অস্ত্রশস্ত্রের উদ্ধারে ইয়ানির আদেশে স্থলবাহিনী কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার সম্পর্কিত সমস্ত সংগঠনের অফিসে এসে হানা দেবে। পরিস্থিতি তখন এমন গুরুতর হয়ে উঠেছিল যে আমাদের পরিকল্পনার দিন এগিয়ে না দিয়ে আর উপায় ছিল না। ২৫শে সেপ্টেম্বরই একটি গোপন সভায় ৩০শে সেপ্টেম্বর বিদ্রোহের নির্দিষ্ট দিন স্থির হয়।

সেকেণ্ড ভাইস-চেয়ারম্যান নিয়োতোকে আমি সুমাত্রায় যেতে আদেশ করি এইজন্য যে আমার মনে হয়েছিল তিনি সুমাত্রাবাসীদের আমাদের চিন্তাধারায় সহজে নিয়ে আসতে পারবেন। বৈপ্লবিক সমিতির চেয়ারম্যান পদে লেঃ কর্ণেল উণ্টুঙের নাম অস্থায়ীভাবে রাখা হয়েছিল। পি. কে. আই ছাড়া আর কাউকে আমি জানাই নি যে ওই পদ আমার হবে, কারণ আমাদের পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত না হয়ে অযথা বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করা সমীচীন মনে হয় নি।

বৈপ্লবিক সমিতি প্রতিষ্ঠার দলিলে স্বাক্ষর করাতে এবং দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এই সম্পর্কে বেতার মারফৎ ভাষণ দিতে আমরা প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণকে অনুরোধ করি, কিন্তু তিনি তা করতে অস্বীকার করেন। আমরা ক্ষমতা অধিকার করলে পরেও তাঁর প্রেসিডেণ্ট-পদ অক্ষুণ্ণ থাকত, কিন্তু তাঁর কার্যকলাপ এবং নীতি আমরা সমালোচনা করে

ঠিক পথে চালিত করতাম। সামরিকবাহিনীর বর্তমান চারটি শাখা ছাড়াও আমরা পি. কে. আই-এর অধীনস্থ যুব-সংস্থা, ছাত্র-সংস্থা, শ্রমিক-সংস্থা, চাষী-সংস্থা এবং অন্যান্য সংগঠন নিয়ে একটি পঞ্চম বাহিনী গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম।

আমাদের এই ক্ষমতা অধিকারের পরিকল্পনা ব্যর্থ হল কয়েকটি কারণেঃ (১) পরিকল্পনা সময়ানুগ হয় নি, (২) পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত অনেকেই—এমন কি পি. কে. আই-এর অনেক সভ্য—এভাবে ক্ষমতা-গ্রহণের বিরোধী মনোভাবাপন্ন ছিলেন, (৩) জনসাধারণের সাহায্য আমরা কোনরকম লাভ করি নি, (৪) আমরা কমিউনিস্ট চীন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের কাছ থেকে সক্রিয় সাহায্য আশা করেছিলাম—তা আমরা লাভ করি নি এবং (৫) যদিও স্থলবাহিনীর সিকিভাগ কমিউনিস্ট সমর্থক ছিল, কিন্তু কমিউনিস্ট-বিরোধী দল এত প্রবল ছিল যে কমিউনিস্ট সমর্থকেরা কোনরকম সাহায্য করার আগেই সামরিকবাহিনী তাদের বন্দী করে রাখে।

৩০শে সেপ্টেম্বর এবং ১লা অক্টোবর জাকর্তায় থেকে শাসন-ক্ষমতা অধিকারের সর্বব্যাপারে আমি নেতৃত্ব করি। হালিম বিমানবন্দরে আমি প্রেসিডেণ্ট স্থকর্ণকে 'দেওয়ান জেনারেল' এবং তাদের ষড়যন্ত্রের কথা বলি, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন না। এই সময়ে স্থলবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ইয়ানি এবং অপর পাঁচজন সেনাপতিকে আমাদের দলের লোকরা হালিম বিমানবন্দরের আশেপাশে হত্যা করে।

মেজর জেনারেল স্থহারতোর সেনাবাহিনী জাকর্তা বেতারকেন্দ্র অধিকার করার পর একটি জরুরী সভা ডাকা হয়। এই সভায় লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল উণ্টুঙ্গ, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্থপার্জো, লুকমান ও নয়নো উপস্থিত ছিলেন। আমরা বুঝতে পারি যে জাকর্তায় আমাদের শাসম-ক্ষমতা অধিকারের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়েছে। আমি মধ্য-যবদ্বীপে চলে যাওয়া স্থির করি। সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করে

একটি বৈপ্লবিক সমিতি গঠন করে এই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

১লা অক্টোবর রাত দেড়টার সময় বিমানে করে আমি হালিম বিমান-বন্দর ত্যাগ করে রাত তিনটের সময় জোগিয়াকর্তায় উপস্থিত হই। সামরিক বিমানবন্দরের সেনাধ্যক্ষকে বলি যে জাকর্তার পরিস্থিতি ঘোরতর হয়ে ওঠায় প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ হয়তো জোগিয়াকর্তায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন, তারই ব্যবস্থা করতে আমি এসেছি।

পরদিন আমি জোগিয়াকর্তা থেকে সেমারঙ্গ এবং সেখান থেকে সোলোয় গিয়েছিলাম। প্রতি জায়গায় আমি কমিউনিস্ট সমর্থক সামরিকবাহিনী ও সরকারী কর্মচারীদের বৈপ্লবিক সমিতি গঠন করে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বলেছিলাম। মধ্য-যবদ্বীপে সোলোকেই আমি বৈপ্লবিক সমিতিগুলির প্রধান কার্যালয় করা স্থির করেছিলাম।

৩রা অক্টোবর সকালবেলায় সোলো বিমান বন্দরের অধ্যক্ষকে আমাকে একটি বিমানে করে বলীদ্বীপে কিংবা জাকর্তায় নিয়ে যেতে অনুরোধ করি, কিন্তু তিনি তা করতে অস্বীকার করেন। ফলে আমি মধ্য-যবদ্বীপেই কমিউনিস্ট-ক্ষমতা একত্রিত করার চেষ্টা করি। ২১শে অক্টোবর পর্যন্ত আমি প্রায় নিরাপদই ছিলাম।

কিন্তু ২৩শে অক্টোবর ভোরবেলা সামরিকবাহিনী সোলোয় প্রবেশ করে তা অধিকার করে নেয়।

আইদিতের এই স্বীকৃতি কতখানি স্বেচ্ছাকৃত, কতখানি নির্যাতনে বা কতটুকু সত্য বলা কঠিন। সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পি. কে. আই এবং তার দলপতি আইদিতের বিরোধ সর্বজনবিদিত। এই ব্যর্থ অভ্যুত্থানের নেতাও যে আইদিত তা-ও সামরিক কর্তৃপক্ষ জানত। ছয়জন প্রধান প্রধান সেনাপতিকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক আইদিত—এ কথা সামরিক কর্তৃপক্ষ জানত। সুতরাং তাদের পরম শত্রু আইদিতকে তাদের হাতে পেয়ে তারা কিভাবে যে তাদের গায়ের

ঝাল মিটিয়ে ছিল, সহজেই অনুমেয়। এ কথা বোঝা দরকার যে উন্টুঙ্গকে জেনারেল সুহারতোর হাতে সমর্পণ করা হলেও ষড়যন্ত্রের নেতা আইদিতকে জেনারেল সুহারতোর কাছে সমর্পণ করা হয় নি। অন্যান্য বন্দী কমিউনিস্টদের সামনে আইদিতকে হাজির করা হয়। কমিউনিস্ট-শিকারী উল্লসিত জনতা এই দৃশ্য উপভোগ করার জন্য ভিড় করে আসে। সেনাধিনায়ক দেশদ্রোহীদের চিনে রাখতে বলেন এবং কমিউনিস্টদের সমস্ত অত্যাচার কাহিনী বিবৃত করে তাদের বিচার দাবী করেন। জনতা তখন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। চারদিকে চীৎকার, চারদিক থেকে গালাগাল, অপমান ও কটূক্তি। 'রক্তের বদলে রক্ত চাই', 'চীনা-দালাল আইদিতের মুণ্ড চাই', 'কমিউনিস্টদের খুন করো' —জনতার স্লোগানে আকাশ ভরে ওঠে।

মেশিনগান নিয়ে সৈন্যরা প্রস্তুত হল। প্রথম ঝাঁকের গুলিতেই আইদিত মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। সৈন্যেরা ঝুঁকি নিতে রাজি ছিল না। আর একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে আর এক ঝাঁক গুলি তাঁকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হল। তারপর মেশিনগানের গুলি ছুটে চলল সারিবসানো কমিউনিস্ট বন্দীদের ওপর।

বিচার শেষ করে আইদিত সমেত নিহত কমিউনিস্টদের জনতার হাতে ছেঁড়ে দিয়ে সামরিকবাহিনী ফিরে এল। সেই হতভাগ্য নিহত বন্দীদের নিয়ে উল্লাস-উৎসবে মত্ত হল জনগণ।

আইদিতের মৃত্যু-সংবাদ দাবানলের মতো সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল।

সামরিক কর্তৃপক্ষ সরকারীভাবে এই সংবাদ প্রকাশ করল না কিংবা এই সংবাদ অস্বীকারও করতে চেষ্টা করল না। সুকর্ণ নিজে থেকে জানতে চাইলে তাঁকে জানানো হবে। কিন্তু সুকর্ণ এই প্রশ্ন সুহারতোর সামনে উপস্থাপন করতেও সাহস পাচ্ছিলেন না।

আইদিতের মৃত্যু-সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পরেই নিয়োতো এবং লুকমান আত্মগোপন করলেন। ওমর দানি ইন্দোনেশিয়ার বাইরে। সুবন্দ্রিয়োর আহার-নিদ্রা ঘুচে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন যে এবার সামরিক কর্তৃপক্ষের খড়্গ তাঁর ওপরে ঝুলবে। এখনও যদি সামরিকবাহিনীর শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত না করা যায় এবং তাদের শক্তির বিরুদ্ধে অপর এক শক্তিকে জাগ্রত না করা যায়, তবে তাঁদের আর নিস্তার নেই। এই ডামাডোলের বাজারে কমিউনিস্ট ছাড়া আর সকলেই তাঁদের বিরুদ্ধে। কমিউনিস্টদের যদি আবার দাঁড় করানো যায়—আত্মরক্ষার জন্য তা তারা করতে প্রস্তুতও—তবেই সুকর্ণ-সুবন্দ্রিয়ো জুটি শক্তি ফিরে পেতে পারেন। সুহারতো তাই যখন পি. কে. আই-এর কার্যকলাপ বন্ধ করার আদেশ জারি করতে সুকর্ণকে অনুরোধ করলেন, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

সামরিক কর্তৃপক্ষ পি. কে. আই-এর দলনেতাদের সম্বন্ধে জোর অনুসন্ধান চালাতে লাগল। উন্টুঙের স্বীকারোক্তিতে আইদিতের সঙ্গে নিয়োতো এবং লুকমানের নামও ছিল। আইদিতের স্বীকৃতিতেও তাঁদের নাম ছিল।

সামরিকবাহিনীর গুপ্তচরেরা জাকর্তাতেই নিয়োতোর সন্ধান পেল। একজন গুপ্তচর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আত্মগোপনকারী সামরিকবাহিনীর এক অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করে জাকর্তা থেকে পালাবার উপায় স্থির করার জন্য নিয়োতোকে নিমন্ত্রণ জানালেন। সামরিকবাহিনীর খরদৃষ্টি থেকে পলায়নের সুযোগ খুঁজছিলেন নিয়োতো। সহজেই তিনি এই টোপ গিললেন। বন্দী হলেন নিয়োতো। সামরিক কর্তৃপক্ষ তাঁকে গেস্টাপু ষড়যন্ত্র এবং লুকমান সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করল। উত্তর আদায়ের জন্য নানারকম নির্যাতনও করল কিন্তু তাঁর মুখ খোলাতে পারল না। রাগে তাঁকে সেখানেই গুলি করে হত্যা করা হয়। শুধু কমিউনিস্ট পার্টির তিন প্রধানের মধ্যে জীবিত রইলেন লুকমান।

চারদিক থেকে বিদ্রোহীদের কাছ থেকে যত অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যেতে লাগল সবই দেখা গেল চীনের তৈরি। বন্দী কমিউনিস্টরা সামরিক কর্তৃপক্ষকে লুকোনো আরো অনেক চীনা অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধান দিতে লাগল। এই সংবাদে চঞ্চল হয়ে উঠল জনসাধারণ। সামরিকবাহিনী এইবার ঘোষণা করল যে এই বিদ্রোহ শুধু চীনের বুদ্ধিতেই যে পরিচালিত হয়েছে তা নয়, সম্পূর্ণ চীনের অর্থেই সংঘটিত হয়েছে।

১৫ই অক্টোবর এক ছাত্রদল আক্রমণ করল জাকর্তার উপকণ্ঠে চীনাদের রিপাবলিকা বিশ্ববিদ্যালয়। গেস্টাপু বিদ্রোহে এই বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাঁর পাঁচশ ছাত্রছাত্রী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল বলে সকলের বিশ্বাস। দু'ঘণ্টা ধরে লাঠি, ছুরি, ভাঙা চেয়ার-টেবিল নিয়ে দু-দলে লড়াই চলল, একজন চীনা ছাত্রকে পিটিয়ে মারা হল। চীনা ছাত্রদল তারপর বন্দুক চালাতে লাগল। ক্ষেপে উঠল ইন্দোনেশীয় ছাত্রদল। দলে দলে তারা এসে জুটল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়টিতে আগুন লাগিয়ে একেবারে ভস্মীভূত করে ফেলল।

ঠিক এই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটল। বিদ্রোহের পরে জাকর্তায় আগত এক চীনা গুপ্তচর এক সামরিক কর্মচারীকে হোটেল ইন্দোনেশিয়ায় তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে দেখে সিঁড়ি দিয়ে ছুটতে ছুটতে ওপরে উঠে পনেরো তলার ওপরের ছাদ থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। সামরিক কর্তৃপক্ষ এই চীনা গুপ্তচরের আত্মহত্যার সংবাদ ভালভাবেই জনসমক্ষে প্রচার করল।

অতএব ১৬ই অক্টোবর জাকর্তায় চীনা দূতাবাস আক্রান্ত হল। হাজার হাজার ইন্দোনেশীয় মিছিল করে সেখানে এসে জমায়েত হয়ে চীনের বিরুদ্ধে নানারকম ধ্বনি দিতে লাগল। সৈন্যবাহিনী তাদের ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগল। জনতার মেজাজ তাতে আরো খারাপ হয়ে

গেল। সেখান থেকে ফিরে তারা চীনাদের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ করতে আদেশ দিল। চীনাদের কোন মোটর গাড়ি দেখলেই তারা তাতে অগ্নিসংযোগ করতে লাগল।

চীন এই প্রথম সরকারীভাবে প্রতিবাদ জানাল। বলল যে চীনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা এবং চীনের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনের ফল খুব ভাল হবে না।

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন চীনের রাষ্ট্রদূত ইআও চুঙ-মিঙ। ইন্দোনেশীয়দের বর্তমান সমাজবাদ-বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করতে তিনি অনুরোধ জানালেন। চুঙ-মিঙ সুকর্ণকে বললেন যে চীনের সঙ্গে সৌহার্দ্যের কথা স্মরণ করে তাঁর অন্তত: এ সম্বন্ধে একবার দুঃখপ্রকাশ করে বিবৃতি দেওয়া উচিত।

সুকর্ণ কোন জবাব দিতে পারলেন না।

এদিকে প্রতিদিনই ইন্দোনেশিয়ার কোথাও না কোথাও চীনা কনসালেট আক্রান্ত হচ্ছে, মিছিল করে "চীনা শয়তান চীনে যাও" "খুনী চীনের রক্ত চাই" ইত্যাদি স্লোগান দিয়ে হাজার হাজার ইন্দোনেশীয় ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রতিদিনই এক একটা অভিযোগ নিয়ে ইআও চুঙ-মিঙ সুকর্ণের কাছে ধর্না দিচ্ছেন।

জনতার দাবী এবার কমিউনিস্ট পার্টিকে বন্ধ করা এবং তাদের শাস্তি-বিধান করা। সামরিকবাহিনীও তাই চায় কিন্তু সুকর্ণ নারাজ। কমিউনিস্ট পার্টি যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে তাঁর 'নাস-আ-কোম' সরকার থাকল কোথায়? কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষ সুকর্ণের মুখের ওপর বিশেষ কিছু বলতে চাইছিল না। তারা পশ্চিম যবদ্বীপ, মালাক্কা এবং পূর্ব সুলাওয়েসিতে জোর করে সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টি বন্ধ করে দিল।

১০ই নভেম্বর ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় শহীদ দিবস।

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ জাতির উদ্দেশ্যে স্বল্প ভাষণে বললেন:

আমাদের আন্দোলন চিরকাল বামপন্থী। সেইজন্যই প্রতিক্রিয়াশীল পাশ্চাত্য শক্তি আমাদের শত্রুতাচরণ করে এসেছে। তাই এই পাশ্চাত্য-শক্তিকে আমরা 'নেকোলিম' বলি। যদি তারা আমাদের ধ্বংস না করতে চায় তো তারা 'নেকোলিম' থাকবে না।…
এশিয়া এবং আফ্রিকার অন্যান্য দেশ আমাদের নবজাগ্রত শক্তির আলোকদূত বলে কল্পনা করে এসেছে কিন্তু স্ববন্দ্রিয়ো আমাকে বলেছে আমাদের যে আলোক-বর্তিকা এতদিন ধরে সারা বিশ্বকে আলোকিত করে রেখেছিল, তার জ্যোতি বর্তমানে কমে আসছে।…
কমিউনিস্ট পার্টিকে বন্ধ করার জন্য আমাকে জোর করা হচ্ছে। ভাল কথা, আমি ভেবে দেখব। কিন্তু আমার 'নাসাকোম' সরকারে কোন না কোনরকমের "কোম" থাকতেই হবে।

সেইদিনই সামরিকবাহিনীর হয়ে জেনারেল নসুশান জাতির উদ্দেশ্যে শহীদ দিবসের ভাষণ দিলেন :

> The most important thing at present is that we fully realize the beastly gadding about the personal and political ambitions behind the coup.…
> We should destroy PKI not because we are anti-communist, but because the communists have already betrayed the State with slaughter, torture, terrorism and treason.

সুকর্ণ এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের সুর একেবারে বিপরীতধর্মী। সুকর্ণ কমিউনিস্ট পার্টিকে রাখতে চান, আর সামরিকবাহিনী তাকে চূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর। এর একটা মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং ভাষণ শেষ করে নসুশান বাপক কর্ণের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সাক্ষাতের শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের নসুশান বললেন—প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সামরিক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈষম্য এতদিন ছিল। তারই মিটমাটের জন্য বাপকের আশীর্বাদ গ্রহণ করতে গিয়েছিলাম।

কী কথা হয়েছিল কেউ জানে না, কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করতেও স্বীকৃত হলেন না, বাণী দিতেও রাজি হলেন না।

পরদিন সংবাদপত্রে এই ঘটনাটি প্রকাশিত হওয়ার পর সুবন্দ্রিয়ো ক্রোধে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলেন—বর্তমানে অনেক সংবাদ-পত্রই সি. আই. এ-র অর্থে যে পরিচালিত হচ্ছে তার প্রমাণ আছে।

সুহারতো সুবন্দ্রিয়োর কাছে তার প্রমাণ দেখতে চাইলেন। সুবন্দ্রিয়ো জানালেন যে সময়মতো প্রমাণ দেখাবেন।

সুবন্দ্রিয়োর পররাষ্ট্র-দপ্তর প্রায় পাঁচ হাজার ইন্দোনেশীয় ঘিরে ফেলে প্রমাণ দেখার দাবী জানিয়ে স্লোগান দিতে লাগল। ভয়ে আধমরা হয়ে সুবন্দ্রিয়ো বললেন—আমার ভুল হয়েছিল। আমার পূর্বেকার অভিযোগ আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি।

সুবন্দ্রিয়োর অস্ত্রেই সুবন্দ্রিয়োকে ঘায়েল করল সামরিকবাহিনী।

২৩

সারা দেশের ওপর দিয়ে এক প্রবল ঝড় বয়ে গেল।

বয়ে গেল নয়, এখনও সেই ঘূর্ণী বয়ে চলেছে। ইন্দোনেশিয়ার আট হাজার দ্বীপ এখনও ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ, বাসুকীর ফণা এখনও দুলছে। লবঙ্গবন, দারুচিনি-দ্বীপ···সমস্ত মশল্লা দ্বীপ টলমল টলমল। এমন পৈশাচিক তাণ্ডব পৃথিবীর ইতিহাসে খুবই কম দেখা যায়। ইন্দোনেশিয়া এখন রক্ত-পাগল হয়ে উঠেছে। সবুজ-মাটি তাজা রক্তে লাল, নদীর জলে রক্তের লাল স্রোত···

সমগ্র ইন্দোনেশিয়া আজ কমিউনিস্ট আর চীনাদের ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছে।

ইন্দোনেশিয়ার সামরিকবাহিনীর প্রথম সারির ছয়জন সেনাপতিকে নৃশংসভাবে হত্যার সংবাদ প্রকাশের পর থেকেই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং বিক্ষোভ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যর্থ মাদিউন বিদ্রোহের পর আবার নতুন বিদ্রোহে জবরদখল শাসন-ক্ষমতা অধিকারের অপচেষ্টায় জনসাধারণ কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে এক বিজাতীয় ঘৃণা পোষণ করছিল। নাসাকোম মন্ত্রীসভায় থেকে সরকারী শক্তিতে তারা যেভাবে জনসাধারণকে শোষণ এবং পীড়ন করেছে, যেভাবে নির্দলীয় ও বি-দলীয় দরিদ্র চাষীদের তাদের নিজেদের জমি থেকে উৎখাত করেছে, যেভাবে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে জনসাধারণের অর্থ-সম্পত্তি লুট করে দল এবং দলীয় লোকদের মধ্যে বিতরণ করেছে—সে সব কথাও কেউ ভোলে নি।

সামরিকবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত পলায়নপর কমিউনিস্ট গেরিলারা মধ্য-যবদ্বীপে একটি গ্রামের দু'শ জন অধিবাসীকে যেরকম

নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল, মাদিউনের নিকটবর্তী একটি গ্রামের আটষট্টিজনকে যেরকম জীবন্ত অবস্থায় কবর দিয়েছিল,—সেই সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর জনসাধারণকে আর আয়ত্তে রাখা গেল না। তাদের এতদিনকার পুঞ্জীভূত ক্রোধ প্রতিহিংসার আকারে ফেটে পড়ল। চারদিকে সকলের শুধু 'খোঁজ খোঁজ' আর 'মার মার' চীৎকার। সামরিকবাহিনীকে আর কমিউনিস্টদের খুঁজে বেড়াবার প্রয়োজন হল না।

এই হত্যা-যজ্ঞে আহুতি দিতে অগ্রসর হল ধর্মীয় দলগুলি। এতদিন তারাও নাসাকোম সরকারে কমিউনিস্টদের সহযোগী ছিল, কিন্তু ধর্মকে কমিউনিস্টরা যেভাবে অস্বীকার এবং পরিহাস করত তাতে তারা কমিউনিস্টদের ওপর খুশি ছিল না। তার ওপর পুলিশ এবং কমিউনিস্ট-সমর্থক সেনাবাহিনীর সহায়তায় কমিউনিস্ট পার্টি এই সব দলের হাত থেকে প্রায় জোর করে একটির পর একটি শ্রমিক সংস্থা ছাড়িয়ে নিচ্ছিল। সুকর্ণের অনুগ্রহান্বিত এই অসীম শক্তিশালী দলকে তারা ভয় করেই চলত, মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতে সাহস করত না। এখন যখন সুকর্ণের ক্ষমতা সীমিত, কমিউনিস্ট-বিরোধী সামরিক-বাহিনীই প্রবল—তখন তারা একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠল। চারদিকে তারা স্লোগান তুলল :

পি. কে. আই অ্যান্টি-তুহান
কোমুনিস অ্যান্টি-আগামা
বুরবাকন পি. কে. আই
গঞ্জাও আইদিত

কমিউনিস্টদের আত্মগোপন করে থাকা এবং গেস্টাপু-বিদ্রোহকে নিন্দা না করা তারা তাদের অপরাধ স্বীকার বলেই ধরে নিল। ধর্ম-বিদ্বেষী কমিউনিস্টরা হল 'কাফির হাবির', তাই তাদের বিরুদ্ধে নাহদাতুল উলামা 'মুজাহিদ' বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করল। দিকে দিকে দলে দলে

ধর্মান্ধ ইন্দোনেশীয় নাহদাতুল উলামার পতাকাতলে এসে দাঁড়াল। কাফিরদের হত্যা করতে হবে নৃশংসভাবে—গুলি করে এক নিমেষে মৃত্যু তাদের জন্য নয়! তাদের পিটিয়ে মারো, 'ক্রিস্' বুকে বসিয়ে দাও, 'গোলোক' দিয়ে কেটে কুচি কুচি কর; কিন্তু খবরদার হারাম হয়ো না—কাফিরদের কবর দিও না।

চারদিকে কমিউনিস্ট-নিধন যজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। প্রতি দ্বীপে, প্রতি শহরে, গ্রামে বইতে লাগল রক্তের স্রোত। কমিউনিস্টরাও তাদের বাধা দেবার চেষ্টা করল প্রথমে, কিন্তু সংখ্যাধিক্য জনতার একত্র আক্রমণে তাদের প্রতিরোধ-ক্ষমতা বিশেষ ছিল না। তাছাড়া রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তাদের অবলুপ্তিও তাদের কোমর ভেঙে দিয়েছিল। নাসাকোম সরকারের আমলে দর্শক-পুলিশের চোখের সামনে পি. কে. আই এবং তার পেমুদা রাকিয়তের রক্ত-গঙ্গা বহানোর সময়কার মতো এই মুজাহিদের সময় সামরিকবাহিনীও নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করল।

এই এক-তরফা মৃত্যু-যুদ্ধের মর্মন্তুদ সংবাদ জাকর্তায় এসে পৌঁছুতে লাগল। সুকর্ণ অস্থির হয়ে উঠলেন। একদিন তিনি সুহারতোকে বলে বসলেন—কতগুলো লোক দল বেঁধে কমিউনিস্টদের হত্যা করছে, আর সামরিকবাহিনী চুপ করে দাঁড়িয়ে তা দেখবে—এ কেমন কথা?

সুহারতো সবিনয়ে উত্তর দিলেন—আমরা তো রাজনীতি জানি না বাপক, দেখে শিখি। এর আগে কমিউনিস্টরা যখন দল বেঁধে জোর করে দরিদ্র চাষীদের জায়গাজমি ছাড়িয়ে নিত, নিরীহ লোকদের খুন করত, তখন পুলিশ চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখত। আমরাও তাই শিখেছি।

সুকর্ণ বললেন—এই নিষ্ঠুর হত্যা এখনই বন্ধ করা দরকার, তার জন্য সামরিকবাহিনী প্রয়োগ করতে হলেও—

সুহারতো উত্তর দিলেন—পি. কে. আই-কে অবৈধ ঘোষণা করে তার

কাজকর্ম বন্ধ করে দিলেই আর খুন জখম হবে না বাপক। তখন লোকে বুঝতে পারবে যে কমিউনিস্টদের বিশ্বাসঘাতকতা আর দেশে হবে না।

পি. কে. আই-এর কথা আমি ভেবে দেখব—বললেন সুকর্ণ।

তাই হবে বাপক—সায় দিলেন সুহারতো।

এবারে সুবন্দ্রিয়ো মুখ খুললেন। বললেন—তার মানে এখনও খুন চলবে, সামরিকবাহিনী কিছু করবে না?

দীর্ঘ এক মিনিট কাল জেনারেল সুহারতো সুবন্দ্রিয়োর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন—যদি আপনি আর আপনার পি. কে. আই এই বিদ্রোহে জয়লাভ করত, তবে হত্যার সংখ্যা অনেক অনেক বেশি হত এবং সেই হত্যা যে কতদূর কুৎসিত কত ঘৃণ্য উপায়ে করা হত তার প্রমাণ হয়েছে আমাদের নিহত ছয়জন সেনাপতি।

সার্বো এধিকে সুহারতো বলীদ্বীপে পাঠালেন আইন ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে। এধি অবশ্য এসেই জানালেন যে তিনি এসে পৌঁছোনোর আগেই সমস্ত খুনজখম শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা হয় নি। তখনও হত্যাকাণ্ড চলছিল। কমিউনিস্টদের বাড়িতে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দলবদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে থাকত। আগুনে পুড়ে মরার ভয়ে বাইরে বেরোনোমাত্র বাড়ির সকলকে জনতা পিটিয়ে মারত। এই হত্যাকাণ্ডের হাত থেকে বাদ গেলেন না বলীদ্বীপের রাজ্যপাল সুতেজার পরিবারবর্গও।

উত্তর সুমাত্রায় এগারো হাজার কমিউনিস্ট বন্দীকে জনতা হাত-পা বেঁধে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। মেদানে এক জনতা সমস্ত চীনা পল্লী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আগুনে ভস্মীভূত করে ফেলে এবং প্রায় দুশ' চীনাকে হত্যা করে।

ইন্দোনেশিয়ার প্রতিটি দ্বীপেই এই সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি। লোম্বক, সুমবাওয়া, ফ্লোরেস, মাকাসার, বাঞ্জারমাসিন, মালান, কালিমান্তান, তারাকান, সুলাওয়েসি, বুটোন, রিও, মালাকু, হালমাহেরা, ওবি, সুলা, সেরাম, বুরু, আম্বোন, তারনাটে, টিডোর, বান্দা, কাই, আরু, তানিম্বার, ওয়েটার, টিমোর, সুম্বা, কোমোডো প্রভৃতি হাজার হাজার দ্বীপ রক্ত-স্রোতে লাল হয়ে উঠল।

পাঁচ বছরে ভিয়েতনামের যুদ্ধে যে রক্তপাত হয় নি, এই লবঙ্গ বনে দারুচিনি দ্বীপে তিন মাসে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি রক্তস্রোত বয়ে গিয়েছে। 'পাগলামির যুগ' বয়ে গেছে সারা ইন্দোনেশিয়া জুড়ে। ইতিহাসের পাতা খুঁজলে এরকম বীভৎস ও নারকীয় হত্যাকাণ্ডের নজির অনেক পাওয়া যাবে—তৈমুর, নাদিরশা'র ভারত অভিযান, নাৎসি অত্যাচার, রাশিয়ায় স্ট্যালিনের ক্ষমতা-রক্ষায় বিপরীত দলের বিলুপ্তি, কঙ্গোর অরাজকতা, হাঙ্গারি ও চেকোস্লোভাকিয়াতে রাশিয়ার হত্যালীলা, তিব্বতে চীনের অভিযান, ভিয়েৎনামে আমেরিকার মারণ-যজ্ঞ—কিন্তু সব কিছুই ম্লান হয়ে যাবে ইন্দোনেশিয়ার এই নৃশংসতার কাছে। এক হত্যালীলাকে বন্ধ করতে যে হত্যালীলা শুরু হল—তা ইতিহাসে বিরল।

কত লোক নিহত হয়েছে? সরকারী মতে পাঁচ লাখ—কিন্তু বেসরকারী হিসাবে অনেক অনেক বেশি। মৃতদেহ গুনে হিসাব করা যাবে না—অনেক মৃতদেহ আবার মাটি চাপা দেওয়া বা জলে ভাসানো হয়েছে। তবে সকলেরই অনুমান নিহতের সংখ্যা দশ লক্ষের কম নয়। ব্যক্তিগত উচ্চাশা আর দলীয় ক্ষমতালাভের সশস্ত্র প্রচেষ্টার এই করুণ, মর্মন্তুদ এবং ভয়াবহ পরিণতি।

কী নিদারুণ দুঃস্বপ্নের মধ্যে যে দিন কেটেছে!

১৯৪৬ সনের অগাস্ট মাসের দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী আমি। ভারত-

পাকিস্তান গঠনের সময়ে লাহোরের হত্যাকাণ্ডও আমি দেখেছি, কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার এই তিন মাসের নৃশংসতার ইতিহাসের কোথাও তুলনা মেলে না। পথে না বেরিয়ে ঘরে বসে বসেই রক্তের উষ্ণ গন্ধ পাচ্ছি আর শুনছি একদিকে হত্যাকারীদের সমবেত জয়োল্লাস এবং অপরদিকে হতভাগ্য পরাজিতদের মৃত্যু-আর্তনাদ।

যে দেশের যুবক-সম্প্রদায় এতদিন উগ্র কমিউনিস্ট-সমর্থক ছিল তারা সকলেই আজ হঠাৎ কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী হয়ে গেল কি করে? এই মেটামরফিজ্‌ম্ কি করে সম্ভব? অনেক ভেবে ভেবেও তার কুলকিনারা কিছু করতে পারি নি। লোকে শক্তের ভক্ত। কমিউনিস্টরা যখন শাসনে ছিল তখন এই যুবকদল স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই কমিউনিস্ট-সমর্থক হয়ে স্বার্থসাধন করেছে এবং কমিউনিস্ট নেতারা পূর্ণমাত্রায় তাদের কাজে লাগিয়েছেন প্রতিপক্ষকে দমিয়ে রাখতে। সামরিকবাহিনীর হাতে পরাজয়ের পরে কমিউনিস্টদের অভ্রস্পর্শী ক্ষমতা যেই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই এই সুযোগসন্ধানী যুবকদল তাদের মুখোস বদলিয়ে তাদের এতদিনের গুরু কমিউনিস্ট শিকারে অতি উৎসাহী হয়ে উঠল।

জাকর্তায় কমিউনিস্টদের শায়েস্তা করেছিল সামরিকবাহিনী। বিপদ বুঝে অধিকাংশ কমিউনিস্ট জাকর্তা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল দূরে, গ্রামাঞ্চলে। তাদের বাড়িঘর পড়ে ছিল। তাই ভেঙে চুরে, লুট করে, আগুন জ্বালিয়ে লোকে মনের আশ মেটালো।

ইন্দোনেশিয়ার শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে শুধু 'কমিউনিস্ট খতম করো' রব।

এরই মধ্যে একদল আবার ডাকাত হয়ে উঠল। দল বেঁধে তারা লুটের উদ্দেশ্যেই বেরোত এবং সাধারণ লোককে তাদের উদ্দেশ্য জানতে না দিয়েই কাজে লাগাত। আর একদল এই দুর্যোগের দিনে ব্যবসা করতে নামল। উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে পলায়িত লোকদের এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে চালান দেবার ব্যবস্থা করতে লাগল।

এই হত্যালীলাও হয়তো অল্পদিনে কমে যেত, কিন্তু ইতিমধ্যে উত্তেজনার আর এক কারণ আবিষ্কৃত হল। গেস্টাপু বিদ্রোহে চীনের ষড়যন্ত্র এবং সক্রিয় সাহায্য আবিষ্কৃত হল। এখন সেখানে লুকোনো চীনা অস্ত্রের পাহাড় আবিষ্কৃত হতে লাগল। চীনা সাবমেরিনকে রাত্রির অন্ধকারে ইন্দোনেশিয়ার কূলে দেখতে পেয়েছে অনেকে। এক চীনা গুপ্তচর হঠাৎ হোটেল ইন্দোনেশিয়ার ছাদের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।

সাধারণের এবার ক্রোধ আর বিক্ষোভ ভেঙে পড়ল চীনাদের ওপর। ইন্দোনেশীয় চীনারাও বাদ পড়ল না তাদের এই রোষ-বহ্নি থেকে। তার কারণ ছিল অন্য।

চীনের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার আঁতাতের পর থেকেই ইন্দোনেশীয় চীনারা কমিউনিস্টদের শিকার হয়ে উঠেছিল। চীনারাই ছিল এ দেশের বড় ব্যবসায়ী, প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী। এইজন্য তাদের ওপর ইন্দোনেশীয় জন-সাধারণ খুব খুশি ছিল না। চৌ এন লাই ইন্দোনেশিয়ায় চীনাদের এক-জাতি-তত্ত্ব মেনে নেওয়ার পর থেকে ইন্দোনেশীয় সরকার শুধু সেই চীনাদের ব্যবসা করার অধিকার দিয়েছিল যারা ইন্দোনেশীয় হতে স্বীকার করবে। কমিউনিস্টরা মন্ত্রীসভায় ঢুকে শাসনক্ষমতা অধিকার করে পার্টি ফাণ্ড বৃদ্ধির জন্য চীনাদের কাছে দুটি প্রস্তাব রেখেছিল : হয় নিয়মিত পার্টি ফাণ্ডে টাকা দাও, নয়তো চীনে ফিরে যাও। এদেশের এই লোভনীয় ব্যবসা ফেলে সর্বস্বান্ত হওয়ার আশঙ্কায় তারা কমিউনিস্ট পার্টিতে নিয়মিত চাঁদা দিতে শুরু করল। পরিবর্তে শাসকমহলের কাছ থেকে তারা সুবিধাও পেতে লাগল।

গেস্টাপু ষড়যন্ত্রে চীন এবং কমিউনিস্ট জড়িত ছিল বলে তাই ইন্দোনেশীয় চীনারাও জনসাধারণের শিকারের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে উঠল। দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার পড়ল :

GANJANG TJINA BEPARKI

TJINA KASIF KOMMUNIS
GANTUNG TJINA
GANJANG BEPARKI

TJINA বা চীনা ব্যবসায়ীদের চূর্ণ করা, খতম করার আহ্বান দেয়ালে দেয়ালে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর চীনা-পল্লীতে জ্বলে উঠল আগুন, চীনা দোকান ভেঙে লুট হল। অনেক চীনা খুন হল, অনেকে ঘর ছাড়ল। সুমাত্রোর বিপ্লবী চেহারা আমি দেখেছিলাম তখন। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমি তাকে রুখে দাঁড়াতে দেখেছিলাম। পাড়ার কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে সে এই দলবদ্ধ গুণ্ডামির বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে নামল। কিন্তু একা তার ক্ষমতা আর কত? একই সময়ে কত জায়গায় সে আর তার দল নিয়ে দাঁড়াতে পারবে? কত দলের সঙ্গে সে লড়াই করতে পারবে? তবু সে লেগে রইল।

আপাততঃ মনে হচ্ছে আমার ফাঁড়া কেটে গেছে।

এতদিন এই মারামারি হানাহানির মধ্যে আর ভারতীয় দূতাবাস আক্রান্ত হয় নি। 'গাণ্টুঙ ইণ্ডিয়া' স্লোগানও শোনা যায় নি। ভারতীয় ব্যবসাবাণিজ্য যদিও সরকারের তত্ত্বাবধানে, তবুও সেই সব অফিসে আর কোন পোস্টার পড়ে নি। এই বিদ্রোহের ডামাডোলে ভারতের প্রতি মনোভাবও একেবারে বদলিয়ে গেছে।

সুমাত্রো যখন আবার দল গঠন করল, তখন পাড়াপ্রতিবেশী এসে ভিড় করত তার বাড়িতে। আমাকে তখন আর লুকিয়ে রাখতে পারে নি। কিন্তু আমাকে দেখে তারা বিরূপ ভাব দেখায় নি, বরং আশ্চর্য হয়েই গিয়েছিল।

তাদের সকলেরই এক কথা—কী আশ্চর্য! আপনি এতদিন এখানে ছিলেন? আমরা একেবারেই বুঝতে পারি নি।

ভগবানকে ধন্যবাদ যে তারা এ বাড়িতে আমার উপস্থিতি এর আগে আর বুঝতে পারে নি। বুঝতে পারলে এতদিনে আমি কোন নিসর্গ-লোকে বাস করতাম ভাবতেই শিউরিয়ে উঠলাম।

সুমাত্রোর বাড়ি যেন এক ধর্মশালায় পরিণত হয়েছে। চার পাঁচটা চীনা পরিবার এসে উঠেছে তাদের এই বাড়িতে। অবশ্য তার কারণ হয়েছে প্রধানতঃ সিণ্টা।

চীনাপল্লী আক্রমণের পরেই সিণ্টা কিম-এর নিরাপত্তার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিম যদিও চীনাপল্লীর বাসিন্দা নয়, জাকর্তার সবচেয়ে অভিজাত পল্লী জালান দীপোনেগোরোয় তাঁর বাড়ি—তবুও তাঁর বাড়ি আক্রান্ত হতে কতক্ষণ!

একরকম জোর করেই কিম, তাঁর স্ত্রী এবং দুই মেয়েকে সুমাত্রো আর সিণ্টা এনে তুলেছিল তাদের বাড়িতে। টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি সব নিয়ে এসেই উঠেছিল তারা। তার পরদিনই আক্রান্ত হয়েছিল কিমের বাড়ি। বাড়ির কাউকে না পেয়ে অবশিষ্ট যা পেয়েছে সব কিছু দুর্বৃত্তরা লুট করে নিয়ে গেছে। শুধু কিম-এর জন্যই তার আর দু'চারজন আত্মীয়কেও এনে আশ্রয় দিতে হয়েছে এই বাড়িতে।

বিপদ এখানেই। এত চীনা-পরিবার এই বাড়িতে তাদের সমস্ত ঐশ্বর্য-সম্পদ নিয়ে এসে উঠেছে—একথা জানাজানি হলেই দুর্বৃত্তদের দল এই বাড়ি আক্রমণ করবেই। চীনা হত্যা না করতে চাইলেও লুটপাট তারা করবেই। কারণ, এ ধরণের অনেক বাড়ি লুটপাটের সংবাদ প্রায় প্রতিদিনই শোনা যাচ্ছে।

সেই কথাই রাত্রে আলোচনা হচ্ছিল।

কিম বলছিলেন—মাতোরো, এখানে আর থাকা আমাদের পক্ষেও যেমন নিরাপদ নয়, আমাদের জন্য তোমাদের পক্ষেও ঠিক সেইরকম। আমরা যদি এখান থেকে চলে যেতে পারতাম—

কি করে সম্ভব, বাপক?—প্রশ্ন করেছিল সুমাত্রো।—আমিও বুঝতে

পারি সব কথা। তবু এখানে থাকলে আপনাদের রক্ষা করার জন্য কিছুটা লড়াই করতে পারব, কিন্তু অন্য কোথায় নিয়ে গিয়ে আপনাদের রাখব?

কিমের স্ত্রী বললেন—অনেকেই তো এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। আমরাও যদি চলে যেতে পারতাম—এমন কোথাও, যেখানে মারামারি নেই—

সুমাত্রো চুপ করে রইল।

কিম বলতে লাগলেন—এ দেশ ছেড়ে কে চলে যেতে চায়, মাতোরো? এ দেশ আমারও, এ দেশ তোমারও। আমরা এখানে আছি আজ প্রায় চারশ' বছর ধরে। আজ আর কোথায় যাব এ দেশ ছেড়ে? আমরা অন্যায় করেছি কি না ভগবান তার বিচার করবেন। সকলের মাথা ঠাণ্ডা হলে বুঝবে যে তারা অন্যায় করেছিল। তখন আবার ফিরে আসব। কিন্তু এখন যদি কোথাও—

সুমাত্রো উত্তর দিল—কিন্তু যারা যারা এদেশ ছেড়ে গেছেন, তাঁরা কি সকলেই অন্য দেশে পৌঁছোতে পেরেছেন? দল বেঁধে লুকিয়ে রাত্রির অন্ধকারে হয়তো গিয়েছে পঞ্চাশ-ষাট মাইল—তারপর হয় মাঝপথেই ধরা পড়ে সর্বস্ব হারিয়েছেন, নয়তো সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার সময় জল-দস্যুদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। লুঠ করার রাজত্ব চলেছে এখন।

কিম বললেন—তবু তো বাঁচবার আশা থাকে। এখানে বসে থাকলে অনিবার্য মৃত্যু—শুধু আমাদের নয়, তোমাদেরও। আর যারা পালাচ্ছে, সকলেই কি মারা গেছে?

সুমাত্রো বলল—আমাকে ভাবতে দিন।

এতক্ষণ সিন্টা চুপ করে ছিল। এবারে বলল—সেদিন সরজোনো বলছিল যে তারা অনেক লোককে নিয়ে সমুদ্রের ধারে পৌঁছিয়ে দিচ্ছে, আর রাতোনো একটা লঞ্চে করে তাদের অন্য দ্বীপে নিয়ে যাচ্ছে। মাথাপিছু তারা নিচ্ছে হাজার টাকা করে—

কিম বললেন—আমি দিতে রাজি আছি।

সুমাত্রো সিণ্টাকে বলল—তুমি হরাতোনোকেও চেনো, সরজোনোকেও চেনো। আর কিছুদিন আগেই এখানে গুণ্ডামি আর লুটপাট করছিল। সৈন্যদের ভয়ে হরাতোনো পালিয়েছে। সরজোনো এখনো রয়েছে—কি মতলবে বল তো? আমি যে-কোন ডাকাতকে বিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু হরাতোনো আর সরজোনোর দলকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না।

সিণ্টা বলল—হরাতোনো টাকা চায় আর সে টাকা পাবে। তবে আর কেন সে গুণ্ডামি করতে যাবে? টাকাই তো তার দরকার—

ঠিক বলেছ, টাকা তার দরকার—বলল সুমাত্রো—কিন্তু সব টাকা। আর সে যে সব টাকা ছিনিয়ে নেবে তার কোন সাক্ষী সে রাখতে চাইবে না। যারা তার ওপর ভরসা করে যাবে, হয় তাদের যাওয়ার পথে প্রথম সুযোগেই সে খুন করবে নয়তো হরাতোনোর লঞ্চে তুলে মাঝ সমুদ্রে তাদের মেরে ভাসিয়ে দেবে।

সিণ্টা বলল—এতদূর খারাপ রাতোনো হয় নি।

সুমাত্রো প্রশ্ন করল—হরাতোনো হঠাৎ একটা লঞ্চ জোগাড় করল কি করে সিণ্টা?

সিণ্টা বলল—কেন, কিনতে পারে?

এত টাকা পেল কোথায়?—প্রশ্ন করল সুমাত্রো—ওর টাকা কি রকম আছে তা তুমি আমার চেয়ে বেশি জান।

সিণ্টা চুপ করে রইল।

সুমাত্রো বলল—ডাকাতি করে ও লঞ্চটা নিয়েছে। পুলিশ আর সৈন্য-বাহিনীর হাত থেকে বাঁচবার জন্য সে এখন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে আর লোভ দেখিয়ে বিপন্ন লোকদের নিজের আওতায় এনে তাদের সর্বস্ব লুঠ করে নিচ্ছে।

কিম বললেন—কিন্তু মাতোরো—একবার চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি

কি ? এই ঘরের মধ্যে বসে থেকে মরতে ইচ্ছা করছে না। সরজোনো বা অন্য কোন দলে না গিয়ে নিজেরাও তো লুকিয়ে পালাতে পারি।

সুমাত্রো বলল—তা পারা যায়, কিন্তু ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। দেশের লোকেরা এখনও কমিউনিস্ট আর চীনাদের ওপর খড়্গ-হস্ত হয়ে আছে। তারা ঠিক স্বাভাবিক খুনে নয়, কিন্তু আপনাদের দেখলে কি যে করবে বলা কঠিন। তার চেয়ে তবু বরং এই গুণ্ডাদলের সঙ্গে যাওয়া ভাল। এরা গোপনে পালানোর পথ জানে। আর আমরা জানি যে আমাদের শত্রু কারা এবং তাদের ওপরে আমরা প্রথম থেকেই নজর রাখতে পারি। বাইরের শত্রুদের জন্য আমাদের চিন্তা নেই, সে ভাবনা গুণ্ডাদের। তাদের মুখের গ্রাস তারা অন্যের হাতে তুলে দেবে না। সেইজন্যই বলছিলাম, আমাকে একটু ভাবতে দিন।

সারারাত ধরে আমিও ভেবেছি।

যবদ্বীপ, সুমাত্রা আর বলীদ্বীপের যে অবস্থা তাতে কিম কেন যে-কোন চীনার ভয় পাবার কথা। এটা স্বাভাবিক যে তারা এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে কোন এক নিরুপদ্রব দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করবে। সেইজন্য কিমের এই ব্যাকুলতা আমাকে অত্যন্ত বিচলিত করে তুলেছিল। কিছুদিন আগে আমিও এই একই বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলাম। ভাগ্য ভাল যে সে বিপদের দিন এখন আমার কেটে গেছে। ভারতবর্ষ এখন আর আগেকার মতো ইন্দোনেশিয়ার কাছে শত্রু-রাজ্য নয়।

যদি সুমাত্রো রাজি হয়, যদি সুমাত্রো কিম এবং তাঁর দলবল নিয়ে যাত্রা করে তবে আমি কি করব—এই হল আমার ভাবনা। প্রায় সাড়ে তিন মাস আমি এই জাকর্তা নগরীতে একরকম বন্দী-জীবন যাপন করছি। কোন কাজ নেই, বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। এ রকম

অবস্থায় আর এখানে থাকতে এক মুহূর্তও ভাল লাগছিল না। অথচ দেশে ফিরে যেতেও পারছি না। ট্রেন চলছে সৈন্য সামন্ত আর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সমরসম্ভার এবং খাদ্যদ্রব্য নিয়ে। সেই সবের পর যে ক'টি গাড়ি থাকে তাতে জনতার যা ভিড় তাতে করে ট্রেনের আশা ছেড়ে দিতে হয়। বেসামরিক প্লেন চলাচলের অবস্থাও ভাল নয়। প্রথম সুযোগ ভি. আই. পি. এবং বিদেশী সাংবাদিকদের, তারপরে সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের। তাদের দাবী মেটাতেই হিমসিম। এখনও মাস তিনেক লাগবে পরিস্থিতি সহজ হতে। এতদিন এখানে একা চুপ করে বসে থাকব কি করে?

সুমাত্রো চলে গেলে আমার আর এখানে থাকার কোন অর্থ হয় না। সুমাত্রোর ভরসাতেই আমার এখানে থাকা। আমিও যদি ওদের সঙ্গে যাই, যদি এমন কোন লঞ্চ পাই যাতে করে সোজা চলে যেতে পারি সিঙ্গাপুরে—তবে সহজেই দেশে ফিরে যেতে পারব।

সকালে এ কথা আমি বুঝিয়ে বললাম সিণ্টাকে।

সিণ্টা একেবারে চমকিয়ে উঠল। বলল—তা কি করে হবে সেন? তুমি যাবে কি করে? তুমি যাবে কেন?

সিণ্টার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই প্রথম সিণ্টার মুখে 'তুমি' ডাক শুনতে পেলাম।

সিণ্টার মুখ লাল হয়ে উঠল। কোন রকমে বলে উঠল—ওদের সঙ্গে আমি আপনাকে যেতে দিতে পারি না। আপনি বুঝতে পারছেন না, ওরা মস্ত বড় বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে যাচ্ছে। ওরা শেষ পর্যন্ত যেতে পারবে কি না—

বললাম—আমার জন্য তোমার এত ভাবনা দেখে তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু সিণ্টা, আমার কথাটা তুমি একবার ভেবে দেখেছ কি? আমার অবস্থায় পড়লে তুমি কি করতে? একটা লোক যখন মরিয়া হয়ে ওঠে তখন তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। প্রায় চারমাস আমি ভয়ে ভয়ে

অন্ধকারে মুখ গুঁজে পড়ে আছি, আর আমি পারছি না। এর চেয়ে মরাও ভাল।

সিণ্টা আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল—তাই হবে সেন। কি দিয়ে আপনাকে এখানে আমি ধরে রাখব ?

সরজোনোর সঙ্গেই শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা হয়েছিল।

কথা হয়েছিল যে সে পৌঁছিয়ে দেবে উত্তর-পশ্চিম সমুদ্র উপকূলে বাতকা আরুর কাছাকাছি। সমুদ্র-যাত্রার ব্যবস্থা তার করতে হবে না। প্রথমে তাকে মাথাপিছু ত্বশ টাকা দেওয়া হবে, ওখানে নিরাপদে পৌঁছুলে পর মাথাপিছু আরো তিনশ' এবং জাকর্তায় ফিরে এসে মাথাপিছু আরো পাঁচশ' সে পাবে। প্রথমে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিল সে, কিন্তু যখন সুমাত্রো জানাল যে আর একটা দল এই সর্তে রাজি তখন সে সুমাত্রোর কথা মেনে নিল।

সুমাত্রো তাকে সাবধান করে দিল—সরজোনো, কোনোরকম চালাকি করার চেষ্টা করো না। আমি তোমাকে ভাল করে চিনি, তুমিও আমাকে ভাল করে চেনো, আমাদের কারুর কোনরকম ক্ষতির চেষ্টা করবে তো গুলি করে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। খুন কাউকে করি নি, কিন্তু তোমাকে করতে এতটুকু দ্বিধা হবে না।

সরজোনো দাঁত বার করে হেসে বলল—সব জানি, সুমাত্রো। তুমি হরাতোনোর ছেলেবেলার বন্ধু, হরাতোনো আমার গুরু। আমি তোমার ক্ষতি করতে যাব কেন ? কিন্তু তোমার কথার যেন ঠিক থাকে। মাথাপিছু হাজার টাকা—তুশ' অগ্রিম, তিনশ' বাতকা আরুতে গিয়ে এবং পাঁচশ এখানে ফিরে এসে।

সুমাত্রো বলল—আমি আমার কথা রাখি।

সরজোনো বলল—আমিও। আচ্ছা, তবে আজ রাত দশটার সময়।

সরজোনো দ্রুত পায়ে চলে গেল।

২৪

সেই রাত্রেই আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম।

দল একেবারে ছোট নয়—সরজোনো আর তার তিন সঙ্গী, কিম আর তাঁর স্ত্রী ও দুই মেয়ে, তান কু এবং তার বোন লোহারু, লিন উ তাং, তাঁর স্ত্রী ও ছোট ছেলে আর সুমাত্রো, তার প্রধান সাকরেদ আবু আদিল, সিণ্টা এবং আমি—সতের জন।

আমাকে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা সুমাত্রোর একেবারে ছিল না, এক রকম জোর করেই আমি এসেছি। সুমাত্রো আমাকে থেকে যেতেই বলেছিল। বলেছিল—এ বিপদের মাঝে আসবেন না। আপনার কোন ক্ষতি হলে আমাদের আর আপশোষের সীমা থাকবে না।

সুমাত্রোর সঙ্গে অনেক তর্ক করতে হয়েছিল, অনেক বোঝাতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত নিমরাজি হয়েছিল সুমাত্রো। কিন্তু যখন সে শুনল যে সিণ্টাও যাবে, তখন সুমাত্রো চটে উঠেছিল—তোমরা সব পেয়েছ কি, বল তো? আমরা কি পিকনিকে চলেছি?

সিণ্টা জবাব দিয়েছিল—আমার একটা দায়িত্ব আছে, মাতোরো। সেনকে আমি আমাদের বাড়িতে এনে তুলেছিলাম এই ভরসা দিয়ে যে ওঁর কোন ক্ষতি হবে না। আমি বাড়িতে বসে বসে সারা দিনরাত শুধু ভাবব—ওঁর কি হল—তা আমার দ্বারা হবে না। উনি সিঙ্গাপুরে নিরাপদে পৌঁছোতে পারবেন—এ আমি নিজের থেকে দেখে নিশ্চিন্ত হতে চাই। বাপক কিম-এর ভার তোমার, ওঁর জন্য আমার ভাবনা নেই।

এতগুলো মেয়েছেলে নিয়ে—বিরক্ত হয়ে বলে উঠল সুমাত্রো।

ফোঁস করে উঠল সিণ্টা—বলতে লজ্জা করে না তোমার সুমাত্রো?

যখন আমি ছোট ছিলাম তখন তুমি আমাকে তোমার দলে নাও নি? তখন তো মেয়েছেলে বলে মুখ বাঁকাও নি? কোন বিপদের মধ্যে তুমি কি আমাকে কখনো কোন পুরুষের চেয়ে সাহসে কম দেখেছ?

এর পর আর সুমাত্রো কোন কথা বলে নি।

রাত সাড়ে দশটায় আমাদের দল একটা বাসে করে বেরিয়ে পড়েছিল। শহর ছাড়িয়ে বনে ঢুকতে হবে, তারপর পায়ে হাঁটা পথ বন ভেদ করে, পাহাড় ডিঙিয়ে —সাধারণ লোকচক্ষুর বাইরে দিয়ে। সঙ্গে কাউকেই বেশি জিনিষপত্র নিতে দেওয়া হয় নি। সকলেরই পিঠে-বাঁধা ব্যাগ—জামাকাপড় বিশেষ কিছুই নয়, টাকাকড়ি দামী জিনিষপত্রই রয়েছে তাতে। আর আছে খাবার এবং জল। তাছাড়া সিণ্টার হাতে দেখেছি একটা 'ক্রিস্'—পাতলা ইস্পাতের সরু ছোরা, সুমাত্রোর কোমরে রিভলভার এবং আদিলের কাছে বন্দুক। আমি একটা লোহার পাইপ হাতে নিয়েছি লাঠির মতো।

আমাদের অস্ত্রশস্ত্র দেখে সরজোনো বলে উঠেছিল—যুদ্ধে চলেছেন নাকি?

সুমাত্রো জবাব দিয়েছিল—চুপ করে থাক। তোমার কাজ তুমি করে যাও, আমরা কি করি না করি সেদিকে চোখ রাখতে যেও না। আগেও বলেছি আর এখনও বলছি—তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না।

সরজোনো গম্ভীরভাবে বলেছিল—তবে আমার সঙ্গে না এলেই পারতেন।

শেষ রাত্রে আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম বনের ধারে। বাস থেকে নেমে আমরা প্রবেশ করেছিলাম বনাভ্যন্তরে। তারপর আমরা বন ভেঙে এগিয়ে চলেছি—এতটুকু দম নেবার জন্য থামি নি।

একেবারে সামনে পথ দেখিয়ে চলছে সরজোনো আর তার দলের

ইয়ুসুফ। ঠিক তার পিছনে বন্দুক হাতে আদিল আর গাছের একটা শক্ত ডাল হাতে তান কু, তার পিছনে মেয়েদের দল, তাদের পিছনে সরজোনোর দলের মাতাদিন আর সুদীপো, তার পিছনে আমি আর সিন্টা এবং সব শেষে সুমাত্রো আর কিম।

সরজোনা একবার বলেছিল—একটু বিশ্রাম করে গেলে ভাল হত।

সুমাত্রো ধমকিয়ে উঠেছিল—তুমি পথ দেখিয়ে নিয়ে চল, কখন কোথায় বিশ্রাম করতে হবে তা আমি বলব।

আমাদের সুমাত্রো বলেছিল যে প্রথম দিন শহর থেকে যত তাড়াতাড়ি যত দূর চলে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। যত দিন যাবে তত শ্রান্তিতে হাঁটার শক্তি আসবে কমে। প্রথম উৎসাহে এগিয়ে যাওয়াই ভাল। আর তাছাড়া ওদের কথামতো চললে ওরা আমাদের বিপদে ফেলতে পারে।

বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটাও কষ্টকর। পায়ে হাঁটা পথ ছেড়ে দিয়ে আমরা সকলের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য ক্রমে ক্রমেই গভীর জঙ্গলে ঢুকছি। গাছের ওপরে পাখির ডাক আর মাঝে মাঝে বানরের লাফালাফি ছাড়া আর কোন প্রাণীর সাড়া পাই নি।

বেলা বারোটা নাগাদ একটা ছোট্ট পাহাড়ের কাছে এসে আমরা বসলাম। পিঠের বোঁচকা থেকে খাবার বার করে সুমাত্রোর নির্দেশমতো অল্প খাবার খেয়ে প্রচুর পরিমাণে জল পান করে হাত-পা ছড়িয়ে দিলাম। সুমাত্রো পাহারায় রইল, আমরা সকলে চোখ বুজলাম।

সন্ধ্যার পর আবার যাত্রা। আদিল কিংবা সুমাত্রো একবার টর্চ জ্বেলে পথ দেখে নেয়, তারপর নিঃশব্দে পথ চলা—একেবারে গা ঘেঁষে। রাত বারোটায় আবার বিশ্রাম—সুমাত্রো, আদিল আর আমার পালা করে পাহারার ব্যবস্থা। ভোরবেলায় আবার হাঁটা।

এইভাবে চলল আমাদের মুক্তির সন্ধান। দিনের খেই হারিয়ে ফেলি।

পথ চলার পরিশ্রমে আমরা সবাই কাতর। সুমাত্রো বিশ্রাম করতে বললে আমরা আনন্দে অধীর হয়ে উঠি, হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে পড়ে থাকি। এতটুকু নড়তে চড়তে ইচ্ছা করে না। যাত্রার আদেশ দিলে সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি, উঠতে আর ইচ্ছা করে না। সুমাত্রো প্রায় ধমকিয়ে ওঠে, কিমের মেয়ে ছুটো ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, কিমের স্ত্রী তাদের কাছে টেনে নেন।

সরজোনা একদিন বেঁকে বসল। বলল—আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, আমার কথা মতো চলতে হবে। আমি কারুর আদেশ মানব না।

সুমাত্রো সঙ্গে সঙ্গে তার রিভলভার বার করে বলেছিল—আদেশ মানানোর অস্ত্র আমার কাছেই রয়েছে।

সরজোনো সুমাত্রোর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মিনিট খানেক তাকিয়ে ছিল, তারপর বলেছিল—বেশ, কিন্তু কারুর ভাল-মন্দের দায়িত্ব আর আমার নয়।

সিণ্টা চুপিচুপি সুমাত্রোকে জিজ্ঞাসা করেছিল—মাতোরা, আমরা ঠিক পথে যাচ্ছি তো? কম দিন তো হল না!

সুমাত্রো বলেছিল—কি করে বলব? বনের পথ আমার জানা নেই।

এই সন্দেহ আমাদের সকলকেই পেয়ে বসেছিল। সরজোনো যে শয়তান—সে কথা আমরা জেনেও তার সঙ্গে এসেছি। আমরা তার দলকে কড়া পাহারায় রেখেছি রাতদিন। একমুহূর্তের জন্যও তাদের আমরা বিশ্বাস করি নি। তারাও দৃষ্টতঃ আমাদের সঙ্গে কোনরকম চালাকি বা শত্রুতা করার চেষ্টা করে নি, কিন্তু তাদের একেবারে এতখানি ভালমানুষীও আমাদের কাছে অত্যন্ত অস্বস্তিকর লাগছিল। কী ওদের মতলব? কেন ওদের এত ভালমানুষী?

একদিন রাত্রে হঠাৎ তান কু'র চীৎকারে সকলে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলাম।

তান কু বলে উঠল—এখান থেকে কে যেন চলে গেল। আমার পিছনে

শব্দ শুনে পিছন ফেরামাত্র সামনে দিয়ে কারুর যেন ছুটে যাওয়ার শব্দ শুনলাম। সেদিকে ফেরামাত্র একটা লোককে ছুটে গাছের আড়ালে চলে যেতে দেখলাম।

সুমাত্রোর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। টর্চটা জ্বেলে সকলের ওপর একবার ফেলে সুমাত্রো ডাক দিল—সরজোনো!

সরজোনো উঠে বসে বলল—হ্যাঁ, কেন?

তুমি আছ তাহলে?—বলল সুমাত্রো।—ইয়ুসুফ!

ইয়ুসুফ জবাব দিল—এই যে!

সুদীপো!

কোন সাড়া নেই। এবারে সরজোনা হাঁক দিল—সুদীপো!

মাতাদিন জবাব দিল—এখানেই তো শুয়েছিল, কোথায় গেল?

সুমাত্রো সরজোনোকে জিজ্ঞাসা করল—সরজোনো, সুদীপো কোথায় গেল?

আমি কি করে বলব?—জবাব দিল সরজোনো। তারপর উঠে গিয়ে মাতাদিনের চুলের মুঠো ধরে এক ঝাঁকানি দিয়ে বলল—এখানে শুয়েছিল! কোথায় গেল সুদীপো?

আমি জানি না—উত্তর দিল মাতাদিন।

এক চড় কষিয়ে দিল সরজোনো, বলে উঠল—আমি জানি না! সারাদিন তোরা ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছিলি, আমি শুনি নি যেন!

মাতাদিন বলল—ওকে শিম্পিতেও নিয়ে যেতে পারে, পালিয়ে যেতেও পারে। ও বলছিল যে ওর বড় ভয় করছে। সুমাত্রো ওর দিকে তাকিয়ে শুধু রিভলভার দেখাচ্ছে—

সরজোনা বলল—সুমাত্রো, এখন ভেবে কিছু হবে না। ও শয়তানকে যদি শিম্পিতে ধরে থাকে তো ভালই হয়েছে। তা না হয়ে যদি ও পালিয়ে গিয়ে থাকে তবে এত রাত্রে ওকে খুঁজে কোন লাভ হবে না। কাল সকালে আমরা সুদীপোকে খুঁজে বার করে খুন করব।

সে রাতে আর কারুর চোখে ঘুম নেই। সকলেই এক অজানা আশঙ্কায় কেমন নিঝুম হয়ে গেলাম। সুদীপোর হঠাৎ পালিয়ে যাওয়া কোনরকম ভয় পেয়ে নয়, তাহলে সে এই রাত্রের অন্ধকারে পালাত না। নিশ্চয়ই কোন কুমতলবে সে পালিয়েছে। আগে থেকেই কি সরজোনো তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল পালিয়ে যেতে? সরজোনোর এই নির্দোষ সাজার ভঙ্গী সত্য, না নিছক অভিনয়?

তান কু শুধু বলতে লাগলেন—সব দোষ আমার, সুমাত্রো, সব দোষ আমার। আমি একটু সাবধান হলে সুদীপো পালিয়ে যেতে পারত না। যদি কোন বিপদ হয় তো আমার বোকামির জন্যই হবে।

সুমাত্রো কিছু বলল না। লিন উ তাং বললেন—এ রকম ভুল সকলেরই হতে পারত। তোমার দোষ কি তান? বিপদ আসবার হলে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

তান কু বলল—আপনি ঠিক বুঝবেন না—

সিণ্টা বলল—সরজোনোর সঙ্গে আসাই আমাদের সবচেয়ে বড় বোকামি হয়েছে। এত বড় বোকামি করেও আমরা ঠিক আছি, ছোটখাটো বোকামিতে বিশেষ ক্ষতি হবে না। আমার মনে হয়, যা ঘটে গেছে তা নিয়ে মাথা ঘামানো একেবারেই উচিত নয়। কোন বুদ্ধিমান লোক অতীতের দিকে তাকায় না।

পরদিন সকালেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হল।

শিম্পি বা কোন জন্তুই সুদীপোকে ধরে নিয়ে যায় নি। কোন জন্তু এলে কিমকে ডিঙিয়ে সুদীপোকে ধরত না। তান কু'র অন্যমনস্কতার সুযোগেই সে পালিয়েছে। তার পালানো পূর্ব-পরিকল্পিত। সময় বুঝে কেউ তানের পিছন দিকে শব্দ করে এবং এইজন্য প্রস্তুতও ছিল সুদীপো। সঙ্গে সঙ্গে সে লাফিয়ে উঠে বনের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। সরজোনো যতখানি ভালমানুষ সাজছে, ততখানি সে নয়। সুদীপো সরজোনোর নির্দেশ ছাড়া কিছুতেই পালাত না।

এখানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করাও খুব নিরাপদ নয়। সুদীপো কি মতলবে পালিয়েছে, কে বলতে পারে?

সকাল হতে না হতেই সুমাত্রো সকলকে আবার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে বলল।

সরজোনো বলল—সুমাত্রো, আমার মনে হয় সুদীপোর একবার খোঁজ করা দরকার। বেশিদূরে নিশ্চয়ই ও পালিয়ে যেতে পারে নি। ওকে আমাদের ধরা চাই-ই। আর ধরতে পারলে—

সুমাত্রো বলল—না, ওর খোঁজ করে কোন লাভ নেই। চল—

সরজোনো বলল—তুমি বুঝতে পারছ না—

খুব বুঝতে পারছি, চল—বলে উঠল সুমাত্রো। তারপর হাঁক দিল—আবু!

আদিল বলে উঠল—আমি তৈরি, সুমাত্রো।

আদিল বন্দুকটা তুলে ধরল সরজোনোর দিকে। সরজোনো একবার তাকাল আদিলের দিকে, তারপর সুমাত্রোর দিকে। তার চোখে মুখে অস্বাভাবিক ঘৃণা ফুটে উঠল। বলল—কোন কথাই ভুলব না, সুমাত্রো। আমার সঙ্গে চোরের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা আমার, অথচ আমার কথাই তোমরা শুনছ না।

সরজোনো একটা পথ ধরল। কিছুদূর যাওয়ার পর সুমাত্রো বলে উঠল—থামো! সরজোনো, এ পথ কোথায় গেছে?

কেন, বাতকা আরুর দিকে?—উত্তর দিল সরজোনো।

সুমাত্রো বলল—চালাকি করতে যেও না। তুমি আমাদের দক্ষিণে নিয়ে চলেছ।

সরজোনো উত্তর দিল—এতই যদি তোমার সন্দেহ, তবে তুমি নিজে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেই পার। একটু দক্ষিণে গিয়ে তারপর নদী পার হয়ে আবার পথ ধরতে হবে।

কিম আর সুমাত্রো কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল। তারপর

সুমাত্রো বলল—আচ্ছা, চল। কিন্তু একটু শয়তানী করলে তোমার নিস্তার নেই, মনে রেখ কিন্তু।

আরো দুদিন কেটে গেল। এখনও পর্যন্ত নতুন কোন বিপদের সম্মুখীন হই নি। এখন রাত্রে দুজন একসঙ্গে পাহারা দিচ্ছি—সরজোনো আর তার দুই সঙ্গীকে একেবারেই বিশ্বাস নেই।

তৃতীয় দিনে সকালবেলায় একটু দূর এগিয়ে যাওয়া মাত্র সরজোনো থমকিয়ে দাঁড়াল। আমরাও সকলে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সকলেই সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম,—একটা জায়গায় কতগুলো শুকনো ডালপালা জ্বলছে। একটুক্ষণ আগেই কে যেন এখানে কিছু রান্না করার চেষ্টা করেছিল, হয়তো আমাদের পায়ের শব্দে ভয় পেয়ে সে সেই আগুনে জল ঢেলে কাছেই কোথাও লুকিয়ে পড়েছে। এখনও সেই ভিজে ডালপালা থেকে হাল্কা একটা ধোঁয়া উঠছে।

সুমাত্রো কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সরজোনোর দিকে। সরজোনোও কেমন যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আদিল আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল সেই ধোঁয়ার কাছে, এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল।

হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে একজনের গলা শোনা গেল—ভয় নেই, আমি বন্ধু।

সকলেই চমকিয়ে উঠলাম। সুমাত্রো তার রিভলবার আর অদিল তার বন্দুক তুলে ধরল। আমিও বেশ শক্ত করে হাতের পাইপটা ধরলাম। বেশ মনে আছে, সিণ্টা আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতটা চেপে ধরেছিল।

একটা ঝোপের পিছন থেকে আস্তে আস্তে একটি লোক বেরিয়ে এল। পরনে শতচ্ছিন্ন সামরিক পোশাক, হাতে একটা হালকা কারবাইন বন্দুক।

সুমাত্রো জিজ্ঞাসা করল—আপনি কে?

লোকটি উত্তর দিল—আমি ক্যাপ্টেন রুসলন। পথ হারিয়ে ফেলেছি। দুমাস কিংবা আরো বেশিদিন হবে আমি পথ হারিয়ে এই বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি আর একলা থাকতে পারছি না।

তারপর ক্যাপ্টেন রুসলনের কাছ থেকে একটু একটু করে শোনা গেল। গেস্টাপু বিদ্রোহের সময় তিনি একটা ছোট বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হন। বিদ্রোহীদের সংখ্যাগুরুত্বের কাছে তাঁর দল বেশিক্ষণ লড়াই করতে পারে নি। সামান্য কয়েকজনকে নিয়ে তিনি এই বনে প্রবেশ করেন। তারপর আর পথ খুঁজে পান না। দলের সকলে একদম প্রায় না খেয়ে কিংবা বিষাক্ত ফল খেয়ে মারা গেছে। তিনি একা একা এতদিন ঘুরে বেড়িয়েছেন—পথ খুঁজে পান নি।

ক্যাপ্টেন বললেন—আমাকে আপনারা আপনাদের সঙ্গে নিন। আমি আর পারছি না।

সুমাত্রো তাঁকে একটু খাবার দিল। সিণ্টা এককাপ কফি করে দিল। একটু সুস্থ হয়ে তিনি বললেন—কিন্তু এদিকে আপনারা কোথায় চলেছেন?

সুমাত্রো বলল—এদিকে কোথায় নদী আছে, সেটা পার হয়ে—

নদী!—ক্যাপ্টেন বলে উঠলেন।—নদী তো আপনারা পিছনে ফেলে এসেছেন। নদীর কথা আপনাদের কে বলল—

সুমাত্রো বলল—ওই সরজোনো আমাদের এই পথে নিয়ে এসেছে।

সঙ্গে সঙ্গে মাতাদিন ঘুরে দাঁড়াল। তার হাতে উদ্যত রিভলভার। চকিতের মধ্যে ক্যাপ্টেনের হাতে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, হাতের কারবাইন থেকে একটা গুলি গিয়ে লাগল মাতাদিনের হাতে। যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল সে। তার হাত থেকে রিভলবারটা পড়ে গেল। ছুটে পালাতে গেল সরজোনো, কিন্তু তান কু বাঘের মতো তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তাকে মাটিতে চেপে ধরল। ইয়ুসুফের বুকের

ওপর বন্দুক তুলে ধরল আদিল। আমি তার জামাকাপড় হাতড়ে একটা রিভলবার, কিছু টোটা আর একটা ছোরা বার করে নিলাম। প্রত্যেককেই নিরস্ত্র করা হল।

সুমাত্রো কঠিন স্বরে বলল—সরজোনো, তুমি ভাল কর নি। তোমার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তোমাকে আমরা এখনই খুন করে ফেলতে পারি। কিন্তু তোমাকে আমি আর একটা সুযোগ দেব। এবারে ঠিকমতো পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। ঠিক জায়গায় পৌঁছিয়ে দিলে তোমাকে কিছু বলব না, নয়তো তোমাকে খুন করে ফেলব।

সরজোনো কোন উত্তর দিল না।

এবার আর ওদের বিশ্বাস নেই। ওদের হাত শক্ত করে পিছমোড়া দিয়ে বাঁধা হল।

সুমাত্রো ক্যাপ্টেন রুসলনকে বললেন—চলুন, ক্যাপ্টেন।

২৫

একদিকে আন্দোলন, হত্যালীলা আর অন্য দিকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা আর মূল্যবৃদ্ধি।

ব্যবসায়ীরা এই ডামাডোলের বাজারের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি রাতারাতি খোলা বাজার থেকে উধাও হয়ে কালো বাজারে দেখা দিল। একদিনেই দাম দ্বিগুণ হয়ে গেল। চালের সের দাঁড়াল সাড়ে তিন হাজার রূপিয়াতে, কিন্তু সেখানেই বা আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? পরের দিন চালের সের ছ'হাজার রূপিয়া। কোন জিনিষই আর বাজারে পাওয়া যায় না—কালো বাজারেও না—সকলেই ভাবছে জিনিষের দাম আরো বাড়বে, তখন বাজারে ছাড়লে লাভ আরো বেশি হবে। রূপিয়ার দাম আগেই কিছু ছিল না, এখন তো তার দাম বলতে আর কিছুই রইল না। এখন পঞ্চাশ হাজার রূপিয়ার বদলে এক ডলার পাওয়া যায়। সাধারণ মজুরের দিন মজুরি মাত্র পাঁচশ' রূপিয়া।

লোকের চোখে সুবন্দ্রিয়োর সম্মান হ্রাস পাওয়ার সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চেষ্টা করলেন চইরুল সালে। মন্ত্রীসভার নেতৃত্ব তিনি নিজের কাঁধে নিয়ে বিশজন মন্ত্রীকে নিয়ে জাকর্তার থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে চিপনাস নামে একটি পার্বত্য স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের এক বাঙলো-বাড়িতে পাঁচদিন ধরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সমস্যার সমাধান করতে বসলেন।

পাঁচদিন পরে ফিরে এসে সালে পেট্রোলের দাম চার রূপিয়া থেকে আড়াইশ' রূপিয়া করে দিলেন। ফলে বাস ভাড়া দশগুণ বেড়ে গেল। ছাত্ররা এই বাসভাড়া বৃদ্ধি মানতে রাজী হল না। তারা সালের বাড়ির দরজায় হানা দিয়ে সব জিনিষের দাম কমানোর দাবী জানাল।

বিপদ বুঝে চইরুল সালে তাদের আশ্বাস দিলেন এবং সেইদিনই এক কলমের খোঁচায় তিনি রুপিয়ার বাজার-মূল্য এক হাজার ভাগ কমিয়ে দিলেন। অর্থাৎ চালের দাম এখন আর ছ' হাজার রুপিয়া রইল না, হল মাত্র ছ' রুপিয়া। আজব খেল! সালে সাহেব জিনিষের দাম কমিয়ে দিয়েছেন!

কিন্তু এই ধাপ্পাবাজিতে লোকে ভুলবে কেন? যে তিন হাজার রুপিয়া উপার্জন করছিল তারও তো উপার্জন কমে হল তিন রুপিয়া।

এবার রীতিমতো সংগ্রামে অবতীর্ণ হল ইন্দোনেশিয়ার ছাত্রসমাজ। কেসাতুআন আকসি মহাশিষ্য ইন্দোনেশিয়া বা KAMI নামে তারা একটি নতুন দল গঠন করল। অল্প কয়দিনের মধ্যেই প্রায় আড়াই লক্ষ ছাত্র এই দলে যোগ দিল। এই KAMI ছাত্রদল মিছিল করে অপদার্থ মন্ত্রীদের অপসারণের দাবী জানাল। মন্ত্রীদের জনা জনা নাম করে কোন মন্ত্রীর বিদেশের কোন কোন ব্যাঙ্কে কত টাকা গচ্ছিত আছে তা জানিয়ে সেই টাকা বাজেয়াপ্ত করার দাবীও জানাল তারা। দেয়ালে দেয়ালে নতুন স্লোগান দেখা গেল:

মন্ত্রীদের দূর কর
সৈন্য চাই মন্ত্রী নয়

তাদের ক্রোধে ঘৃতাহুতি দিল আবার একটি সংবাদ। সুকর্ণের জাপানী স্ত্রী রত্নাসারি দেবী তখন ইউরোপ ও আমেরিকায় টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। দেশের আর্থিক এই চরম দুর্দশার সময় স্বয়ং প্রেসিডেন্টের স্ত্রীর এই ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা অপচয়ে ক্রোধে অন্ধ হয়ে KAMI বড় বড় পোস্টার নিয়ে বোগোর প্রাসাদে সুকর্ণের সঙ্গে দেখা করতে গেল। পোস্টারে লেখা ছিল:

ইন্দোনেশিয়ায় জাপানী পুতুলের প্রয়োজন নেই।
জাপান থেকে স্ত্রী সংগ্রহ বন্ধ কর।

ছাত্রদের সঙ্গে সম্মুখ সংঘর্ষ বাধল সুকর্ণের। এতদিন যে খেলা তিনি

শিখিয়েছেন সেই খেলাই খেলতে নামল ছাত্রদল—KAMI. পোস্টার নিয়ে মিছিল করে চীৎকার করে স্লোগান দিয়ে পথে পথে ঘুরে সুকর্ণের প্রাসাদ ঘিরে দাঁড়াত। তারপর সমস্বরে তারা চীৎকার করতে শুরু করত :

দ্রব্যমূল্য হ্রাস কর।
মন্ত্রীসভা বদল কর।
পি. কে. আই রদ কর।

দিন দিন KAMI ছাত্রদের বিক্ষোভ বাড়তে লাগল। সুকর্ণ আর বরদাস্ত করতে পারলেন না। একদিন তিনি এই বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল থেকে দশজনকে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে ডেকে পাঠালেন। ছাত্ররা তাদের তিন দফা দাবী নিয়ে হাজির হল সুকর্ণের সামনে। কিন্তু যে সুকর্ণ হাজার হাজার লোককে বাক্-চাতুর্যে সম্মোহিত করে রেখেছেন এতদিন ধরে, তাঁর সামনে এই নাবালক দশজন ছাত্র কি করতে পারে ?

দাবীপত্রের ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সুকর্ণ বলে চললেন যে মনে মনে এই দাবীর কথাই তিনি কল্পনা করেছিলেন, কারণ এইরকম দাবী নেকোলিমরা চিরকালই করে এসেছে, KAMIর ও-যে দাবী তাই হবে তা আর বিচিত্র কি! KAMI তো আর দেশের মঙ্গল চায় না, KAMI হয়েছে নেকোলিমদের দালাল। বিদেশের টাকায় KAMI চলছে। সুতরাং যে KAMI নেকোলিম তাদের দাবী তিনি মেনে নিতে পারেন না, কারণ তা মানলেই তাঁকে দেশের শত্রুতা করতে হয়। দেশের স্বাধীনতা তিনি এনেছেন, দেশকে বিদেশীর হাতে তুলে দিতে তিনি পারবেন না। এ কাজ করতে পারে KAMI. ছাত্রদল যদি সত্যিই দেশের মঙ্গল চায় তো তাদের দেশকে ভালবাসা উচিত। তিনিও দেশকে ভালবাসেন। সুতরাং ছাত্রদের উচিত হবে তাঁর কথা শোনা, অর্থাৎ ছাত্রদলের একটি 'সুকর্ণ ছাত্রদল' বা 'বেরসন সুকর্ণ' গঠন করা উচিত।

সুকর্ণের বক্তৃতার স্রোতে ছাত্রেরা ভেসে গেল। একটাও উত্তর তারা দিতে পারল না। ফিরে এসে বন্ধুদের কাছে তারা তাদের অভিজ্ঞতা জানাল। এই ব্যর্থতায় সুকর্ণের ওপরে তাদের যত না রাগ হল তার চেয়েও বেশি রাগ হল নিজেদের ওপর। সুকর্ণের কথায় তারা সম্মোহিত হয়ে গেল কেন? এ ভুল আর তারা করবে না। সুতরাং বিক্ষোভ মিছিল তারা আরও জোরদার করে তুলল।

'সুকর্ণ ছাত্রদল' গঠন কথাটা সুবন্দ্রিয়োর মনে বেশ ভালভাবে গেঁথেছিল। ভাঙা-চোরা কমিউনিস্ট ছাত্রদলকে আবার নতুন নামে একত্র করে আর একটি শক্তিতে পরিণত করার স্বপ্ন তিনি দেখতে লাগলেন। পূর্ব এবং মধ্য-যবদ্বীপে 'সুকর্ণ ছাত্রদল' গঠনে বেশ সাড়া পাওয়া গেল। কিন্তু বাদ সাধলেন সিলিওয়াঙ্গি বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল আজি। প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিনি, কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। অভিজ্ঞ-কুটনীতিকের খেলা তিনি খেললেন। একটি আদেশে জানালেন যে যেহেতু ইন্দোনেশিয়ার প্রত্যেকেই প্রেসিডেণ্টের সমর্থক সেইজন্য বিশেষ করে প্রেসিডেণ্টের সমর্থনকারী কোন দল গঠিত হতে পারবে না।

'সুকর্ণ ছাত্রদল' গঠনের কারণ জানতে জেনারেল সুহারতো সুকর্ণের কাছে এলেন। সুকর্ণ স্পষ্ট জবাব দিতে পারলেন না। তাকালেন তাঁর চিরসাথী সুবন্দ্রিয়োর দিকে, কিন্তু সুবন্দ্রিয়ো যমের মতো ভয় করতে শুরু করেছেন সুহারতোকে। তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথা বার হল না। এবার সুকর্ণকে রক্ষা করতে অগ্রসর হলেন চইরুল সালে। মন্ত্রীদের মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠার সর্ব-সুযোগ তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাঁর গণৎকারের ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হতে চলেছে।

চইরুল সালে সুহারতোকে জানালেন যে 'সুকর্ণ ছাত্রদল' সত্যকার কোন ছাত্র-সংগঠন নয়, প্রেসিডেণ্টের সেরকম কোন ইচ্ছাও নেই। প্রেসিডেণ্টই যখন দেশের মধ্যে সর্বপ্রধান তখন সমস্ত ছাত্রই প্রেসি-

ডেণ্টের অনুচর। 'সুকর্ণ ছাত্রদল' বলতে ইন্দোনেশিয়ার সমস্ত ছাত্রকেই বোঝায়।

ছাত্ররা আবার তাদের দাবী নিয়ে সুকর্ণের সম্মুখে উপস্থিত হল। এবার আর মাত্র কয়েকজন গিয়ে সুকর্ণের কাছে কথার খেলায় ঠকে আসবে না। সমস্ত ছাত্রের সামনে এসে সুকর্ণকে জবাব দিতে হবে।

সুকর্ণ ছাত্রদলের মুখোমুখি হলেন।

ছাত্ররা দাবী জানাল : দ্রব্যমূল্য হ্রাস করতে হবে।

সুকর্ণ উত্তর দিলেন : নিশ্চয়ই। তোমরাই বল কি করে দাম কমাব।

ছাত্ররা হকচকিয়ে গেল। পরস্পরের দিকে হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইল। কি করে দাম কমানো যায়—তা তারা ভেবে দেখে নি, হঠাৎ কি করে বলবে?

দ্বিতীয় দাবী : মন্ত্রীসভা বদল কর।

নিশ্চয়ই—সুকর্ণ মেনে নিলেন—তোমরা কাকে কাকে মন্ত্রী করতে চাও বল।

কি জবাব দেবে ছাত্ররা? কাকে কাকে মন্ত্রী করা যায় কখনো কি তারা এ কথা ভেবে দেখেছে?

সুকর্ণের কাছে পরাস্ত হয়ে ফিরে এল তারা।

গেস্টাপু বিদ্রোহের তিন চার মাস পরেও যখন সামরিকবাহিনী সুবন্দ্রিয়োর বিরুদ্ধে কোন লিখিত অভিযোগ পেশ করল না, তখন তিনি অনেকখানি সাহস ফিরে পেলেন। সুকর্ণও ততদিনে তাঁর হৃত-গৌরবের অনেকখানি ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর ক্ষমতা প্রকাশ করছিলেন। সুকর্ণের বলে বলীয়ান হয়ে সুবন্দ্রিয়ো শেষ পর্যন্ত এক বিবৃতি প্রকাশ করলেন। তার মোদ্দা কথা হল : প্রতিক্রিয়াশীল দল এবং লোকেরা তাঁকে ঘৃণিত করবার চেষ্টা করেছে,

পাশ্চাত্য সংবাদপত্র তাঁকে শয়তানের মতো এঁকেছে, কিন্তু তিনি তবুও প্রথম উপ-প্রধান মন্ত্রী আছেন এবং থাকবেন। কয়েকটি স্বার্থতুষ্ট দল যদিও চাইছে তবুও পি. কে. আই-কে অবৈধ ঘোষণা করা হবে না এবং মালয়সিয়ার সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার বিরোধ থাকবেই।

১৯৬৬ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ গেস্টাপু বিদ্রোহ সম্বন্ধে তাঁর প্রতিশ্রুত রাজনৈতিক সমাধান সকলকে জানালেন।

আবার নতুন করে 'নাসাকোম' মন্ত্রীসভা গঠন করা হল। আগেকার 'নাসাকোম' মন্ত্রীসভার তুজন কমিউনিস্ট মন্ত্রী—আইদিত ও নিয়োতো নিহত, তাঁদের আসন শূন্য। পাল্লা সমান রাখার জন্য সুকর্ণ জেনারেল নসুশান এবং মেজর জেনারেল এডি মার্তাদিনাতাকে মন্ত্রীসভা থেকে বাদ দিলেন। এবারে জেনারেল সুহারতো হলেন স্থলবাহিনীর মন্ত্রী। জোগিয়াকর্তার জনপ্রিয় সুলতানকে আবার সুকর্ণ মন্ত্রীসভায় ফিরিয়ে আনলেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হলেন মেজর জেনারেল সার্বিনি। 'নাসাকোম' সরকারের আরো তুজন মন্ত্রী হলেন ইমাম শাফি এবং আসমারা হাদি। আসমারা হাদির মন্ত্রী হওয়ার একমাত্র যোগ্যতা হল যে তিনি সুকর্ণের পালিতা কন্যার স্বামী। আর ইমাম শাফির নাম সারা ইন্দোনেশিয়া জানে 'কেউটে দল'-এর নেতা বলে। তাঁর এই দল খুন, জখম, ডাকাতি, রাহাজানি করে সারা দেশে এতদিন ধরে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে এসেছে এবং শাফি নিজে গেস্টাপু বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

জেনারেল নসুশানকে মন্ত্রীসভা থেকে অপসারণ করার মধ্যে সুকর্ণ এবং সুবন্দ্রিয়োর কূটনীতি ছিল। সামরিকবাহিনী থেকে সরিয়ে এনেই তাঁকে মন্ত্রী করা হয়েছিল। এখন তাঁর মন্ত্রিত্ব না থাকলে তিনি আর সামরিকবাহিনীতে ফিরে যেতে পারবেন না। ফলে তিনি যে শুধু বেকারই হয়ে পড়বেন তা নয়, সামরিকবাহিনীর ওপর তাঁর বিন্দুমাত্র প্রভাব আর থাকবে না। নসুশান এখন সাধারণ নাগরিক পর্যায়ভুক্ত হবেন।

সুকর্ণের এই চালে ক্রোধে অধীর হয়ে উঠলেন সুহারতো এবং সার্বিনি। তাঁরা দুজনে নসুশানকে গিয়ে জানালেন যে তাঁরাও এই মন্ত্রীসভায় থাকবেন না। কিন্তু নসুশান তাঁদের বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করলেন। জানালেন যে তাঁর কন্যার মৃত্যুর পর থেকে তাঁর আর দেহ-মন ভাল নেই, তিনি এখন বিশ্রাম চান।

সুহারতো মেনে নিলেন নসুশানের কথা, কিন্তু সামরিকবাহিনীকে এক বিশেষ আদেশে জানালেন যে জেনারেল নসুশান ইন্দোনেশিয়ার সামরিকবাহিনীর সর্বজনশ্রদ্ধেয় জেনারেল এবং সর্বপ্রধান। তাঁকে সমগ্র সামরিক বাহিনী প্রধান সেনাপতির সম্মান প্রদর্শন করবে এবং তিনি প্রধান সেনাপতির বেতন এবং মর্যাদা ভোগ করবেন।

এই ব্যাপারটা সামরিক কর্তৃপক্ষ এত সহজে মেনে নিলেও ছাত্রসমাজ মানতে চাইল না। সুবন্দ্রিয়ো, ওমর দানি, ইমাম শাফি, চইরুল সালে, জেনারেল আহমদীর মতো যারা 'গেস্টাপু' বিদ্রোহের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-ভাবে জড়িত ছিল তাদের মন্ত্রীসভায় রাখা হল অথচ বাদ পড়লেন নসুশান, মার্তাদিনাতা, ইবিলে গান্দামানা—যাঁরা এই বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। 'কামী' ছাত্রদল জার্কতার দেয়ালে দেয়ালে লিখে বেড়াতে লাগল :

গাণ্টুঙ সুবন্দ্রিয়ো (সুবন্দ্রিয়োকে ফাঁসি দাও)
সুবন্দ্রিয়ো কাসিফ পেকিঙ (সুবন্দ্রিয়ো পেকিঙের খাজাঞ্চী)
সুবন্দ্রিয়ো পহলাওয়ান পেকিঙ (সুবন্দ্রিয়ো পেকিঙের দালাল)
সুবন্দ্রিয়ো আঞ্জিঙ পেকিঙ (সুবন্দ্রিয়ো পেকিঙের কুকুর)

আর মিছিল করে তার মেরডেকা প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে ধ্বনি দিতে লাগল : সুবন্দ্রিয়োর রক্ত চাই, সুবন্দ্রিয়ো ডাকাতের সর্দার, সুবন্দ্রিয়োকে পুড়িয়ে মার। নাসাকোম বরবাদ।

সুকর্ণ এই বিক্ষোভে অস্থির হয়ে সাংবাদিকদের কাছে তাঁর কাজের সাফাই দিলেন :

> I had contemplated this reshuffle a long time ago but it could not be carried out because of political unrest. Its tranquility has never been restored, the reshuffle has now been made.

সুবন্দ্রিয়োর পরিচালিত সংবাদ-পত্র 'ইন্দোনেশিয়ান হেরাল্ড' সদম্ভে ঘোষণা করল :

> This new step taken by Bung Karno—one in a series which can be classified into the overall political solution—has dealt a stunning blow to the wishful thinking in Kuala Lumpur and London which had been dreaming of a "withering away" of Indonesia's confrontation against Necolim domination in South East Asia as personified by 'Malaysia.'

কিন্তু জনসাধারণ এবং বিশেষ করে ছাত্রদল আর 'নেকোলিম'-এর মিথ্যা ধাপ্পায় ভুলতে চাইল না, 'মালয়সিয়া'র সঙ্গে শত্রুতাও আর তারা ভাল চোখে দেখতে পারছিল না। দেশের সর্বনাশের কারণ যে 'নেকোলিম' নয়, দেশের সব রাজনীতিকরা—তা তারা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিল।

সুবন্দ্রিয়োর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চরম আকার ধারণ করল। সুবন্দ্রিয়ো নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন, কিন্তু আর তাঁর নিজের বাড়িতে থাকতে সাহস হল না। তিনি আবার সুকর্ণের কাছে মেরডেকা প্রাসাদে আশ্রয় নিলেন। ছাত্ররা তাঁকে সেখান পর্যন্ত ধাওয়া করল। এবারে ছাত্রদের বিক্ষোভ সুকর্ণের বিরুদ্ধেও। এই মন্ত্রীসভা ভেঙে ফেলতে হবে। গেস্টাপু-শয়তানদের তাড়াতে হবে। সুবন্দ্রিয়ো গদী ছাড়।

এরই মধ্যে সুকর্ণ নবগঠিত মন্ত্রীসভার প্রথম অধিবেশন আহ্বান করলেন। 'কামী' ছাত্রদল মেরডেকা প্রাসাদের গেট এবং সেখানে যাবার সমস্ত পথ বন্ধ করে ভিড় করে দাঁড়াল। মন্ত্রীদের বাড়ির

সামনেও ছাত্রদের ভিড়। অর্ধেক মন্ত্রী বাড়ির বাইরে আসতে সাহস পেলেন না, বাকী অর্ধেককে হেলিকপ্টারে করে মেরডেকা প্রাসাদে নিয়ে আসা হল।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুবন্দ্রিয়ো, কিন্তু তিনি সুকর্ণের পরম স্নেহভাজন বলে স্বরাষ্ট্র দপ্তরেও নাক গলালেন। নতুন মন্ত্রী হয়েই তিনি ঘোষণা করলেন যে গেস্টাপু বিদ্রোহের পর সামরিকবাহিনী যে সব আদেশ দিয়েছিল তা তুলে নেওয়া হল। এই বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা তিনি স্বয়ং নিষ্পত্তি করবেন।

তা ছাড়া 'কামী' ছাত্রদলকে শায়েস্তা করার জন্য ছিন্নভিন্ন কমিউনিস্ট ছাত্র সংস্থা, যুব সংস্থাকে সংগঠন করার দায়িত্ব তিনি দিলেন তাঁর বিশ্বস্ত জেনারেল আমির মাহমুদের ওপর। সুবন্দ্রিয়োর পরিচালনাধীন এই ছাত্র ও যুব সংস্থাগুলিকে সংগঠিত করার জন্য অর্থ প্রয়োজন। সুতরাং সুকর্ণের বিশেষ অনুমতিতে ত্রিশ কোটি রূপিয়ার নোট ছাপিয়ে অর্থ সংগৃহীত হল।

'কামী' ছাত্রদল এই সংবাদ পেয়ে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সুকর্ণ এবং সুবন্দ্রিয়োর বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভ চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠল, টীকাটিপ্পনি মারাত্মক পীড়াদায়ক হয়ে উঠল। সুবন্দ্রিয়োর পরামর্শে সুকর্ণ 'কামী' ছাত্রদলকে ঠাণ্ডা করার জন্য ১৯৬৬ সালে ২৬শে ফেব্রুয়ারি এই ছাত্রদলকে বে-আইনী ঘোষণা করলেন এবং জানালেন যে যে-কোন ছাত্র-সমাবেশ ও ছাত্র-বিক্ষোভ উপযুক্ত কঠোরতার সঙ্গে দমন করা হবে।

ফল হল বিপরীত। 'কামী' ছাত্রদল এই আদেশ না মেনে হাজারে হাজারে ভিড় করে মেরডেকা প্রাসাদ ঘিরে দাঁড়াল। বাইরের দ্বীপগুলি থেকেও ছাত্রদল জাকর্তায় এসে এই আন্দোলনে যোগ দিল।

বিক্ষোভের এখানেই শেষ হল না। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যে অগ্রসর হয়ে ফেরসাতুআন আকসি

পেরমুদা পেরলজা ইন্দোনেশিয়া (KAPPI) দল গঠন করে সুকর্ণ-সুবন্দ্রিয়ো-বিরোধী বিক্ষোভে নেমে পড়ল। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা গঠন করলেন কেরসাতুআন আকসি গুরু ইন্দোনেশিয়া (KAGI) এবং বুদ্ধিজীবিরা গঠন করলেন কেরসাতুআন আকসি সরজনা ইন্দোনেশিয়া (KASI) সকলেই ছাত্রসমাজের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

'কামী' ছাত্রদল দলে দলে এসে মেরডেকা প্রাসাদে ভিড় করল। তারা বন্ধ দরজা ঠেলে ভিতরে যাবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু তাদের বাধা দিল প্রাসাদ-রক্ষী চক্রবীরাওয়া বাহিনী। এই ধাক্কাধাক্কির সময় ভয় পেয়ে হঠাৎ একজন রক্ষী গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। ফলে আরিফ রহমান হাকিম নামে একটি ছেলে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়, আর দশ বারোজন আহত হয়। সমস্ত দোষ গিয়ে পড়ল সুকর্ণ এবং তাঁর দেহরক্ষীবাহিনী চক্রবীরাওয়ার ওপর।

ছাত্রদল তাদের মৃত সহপাঠীকে নিয়ে মৌন মিছিল করে জাকর্তার পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এই মৌন মিছিলে যোগ দিল জাকর্তার সর্বস্তরের নারী-পুরুষ। এত বড় মিছিল জাকর্তা নগরী আর এর আগে কখনো দেখে নি। নিহত জেনারেল ইয়ানির বিধবাপত্নী এই মিছিলের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। ছাত্র আন্দোলন রূপান্তরিত হল গণ-আন্দোলনে।

কিন্তু কলেজের ছাত্রদল 'কামী'র কাছ থেকে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব কেড়ে নিল স্কুলের ছাত্রদল 'কাপ্পী'। অল্পবয়সী অপরিণত-বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের সোরগোলে, মিছিলে জাকর্তা চমকিয়ে উঠল। এই বেপরোয়া ছেলেমেয়েরা আইন মানল না, যুক্তি মানল না, তর্কে গেল না। তারা একদিন সদলবলে হাজির হল জালান মেরডেকা টাইমুর রাস্তার ওপরে শিক্ষামন্ত্রীর কার্যালয়ে। তারপর জোর করে সেই বাড়িতে প্রবেশ করে তার কয়েকটি ঘর অধিকার করে নিজেদের

কার্যালয় স্থাপন করল। সুকর্ণ এবং তাঁর মন্ত্রীসভা এদের ঘাঁটাতে সাহস করলেন না।

এবার তাঁদের দৃষ্টি পড়ল সুবন্দ্রিয়োর ওপর। 'কাপ্পী'র এক বিরাট দল সুবন্দ্রিয়োর পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছে এসে হাজির হয়ে নানারকম স্লোগান দিতে লাগল। জেনারেল মাহমুদের অধীনস্থ জাকর্তা বাহিনী ছাত্র-দমনে ইতিমধ্যে খুব দুর্নাম কিনেছিল। সেই জাকর্তা বাহিনী পাহারা দিচ্ছিল সুবন্দ্রিয়োর দপ্তর। এত ছাত্র একত্রে দেখে তারা কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে লাগল। অল্পবয়সী ছাত্রেরা ভয়ে দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল। একদল সেনাবাহিনীদের ধাক্কা দিয়ে পররাষ্ট্র দপ্তরে ঢুকে পড়ল। তারপর তারা শুরু করল লণ্ডভণ্ড, বহ্ন্যুৎসব। সুবন্দ্রিয়ো সেনাবাহিনীর সাহায্যে পালিয়ে বাঁচলেন, কিন্তু অফিসের একটি চেয়ার, টেবিল, আলমারি, শেল্ফ, কাগজ-পত্র, ফাইল আস্ত রইল না। ভেঙেচুরে, ছিঁড়েখুঁড়ে, আগুন জ্বালিয়ে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে বসল ছেলেমেয়ের দল।

এই ঘটনা সম্বন্ধে সুবন্দ্রিয়ো পরিচালিত ইংরাজি দৈনিক সংবাদ-পত্র "ইন্দোনেশিয়ান হেরাল্ড" জানাল যে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ তাঁর সমস্ত কাজ ফেলে রেখে পররাষ্ট্র দপ্তরের দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখতে গিয়েছিলেন এবং

> After having seen the damages done to the building and offices of the Department of Foreign Affairs, President Sukarno stated to newsmen who were covering the occasion that it was no more the work of innocent school children, but through the use of innocent children somebody or somebodies have conducted the act of subversion.

'কাপ্পী' ছাত্রদলকে বিদেশী রাষ্ট্রের দালাল বলে সুবন্দ্রিয়োর পত্রিকা ইঙ্গিত করায় তারা আরও চটে উঠল। চীনা কন্সালের অফিস ও চীনা সংস্কৃতি কেন্দ্রে গিয়ে তারা চীনের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ জানাল।

সেখানেই তারা ক্ষান্ত হল না, চীনা সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'শিন হুয়া'র কার্যালয় ভস্মীভূত করে দিয়ে সুবন্দ্রিয়োর ঘৃণ্য ইঙ্গিতের তারা জবাব দিল।

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ সেই রাতে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের ডেকে "কাপ্পী' আন্দোলনকে নিন্দা করতে বললেন। মন্ত্রীসভার রাজনৈতিক নেতারা সুকর্ণের আদেশ মেনে নিলেন, কিন্তু সুহারতো নিন্দা করতে স্বীকৃত হলেন না। রেডিওতে এই নিন্দার কথা জানতে পেরে রাগে অন্ধ হয়ে ছাত্রদল রাজনৈতিক নেতাদের বাড়ি ঘিরে ধরে জবাব চাইল। রাজনৈতিক নেতারা বিপদ গুণে ছেলেদের খুশি করতে পাল্টা বিবৃতিতে জানালেন যে জোর করে তাঁদের কাছ থেকে ওই নিন্দাসূচক বিবৃতি আদায় করা হয়েছে, 'কাপ্পী' ছাত্রদলের কাজে নিন্দাজনক কিছুই তাঁরা দেখতে পান নি।

'কাপ্পী' ও 'কামী' ছাত্রদল জাকর্তা নগরীতে গাড়ি চলাচল একেবারে বন্ধ করে দিল। পথ ঘাট এখন তাদের অধীনে। ১১ই মার্চ মন্ত্রীসভার দ্বিতীয় অধিবেশন বসবে, ছিয়ানব্বই জনের মধ্যে একত্রিশজন মন্ত্রী তাই আগে থেকে মেরডেকা প্রাসাদে রয়ে গেলেন। আরো দশ বারো-জন কোনরকমে হেলিকপ্টারে করে আসতে পেরেছিলেন। বাদবাকী কেউ আর বাড়ির বাইরে বার হতে সাহস করেন নি।

ইতিমধ্যে বিশেষ মিলিটারি ট্রাইবুন্যাল লেফটেন্যান্ট কর্নেল উনটুঙ্গ এবং নয়নোকে গেস্টাপু বিদ্রোহের অপরাধে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিয়েছিল। এই বিচার-পত্রে স্বাক্ষরের জন্য সুকর্ণের কাছে পাঠানো হল, কিন্তু তিনি তাতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করলেন।

মন্ত্রীসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে উপস্থিত মন্ত্রীরা উনটুঙ্গ এবং নয়নোর বিচারের কথাই আলোচনা করছিলেন, এমন সময় সুকর্ণ এলেন। উপস্থিত মন্ত্রীদের মধ্যে সুহারতো এবং জোগিয়াকর্তার সুলতানকে না দেখে ভয়ে তাঁর মুখ পাংশু হয়ে গেল। এঁদের দুজনের অনুপস্থিতি তিনি

সহজ মনে মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই সে রাতের মন্ত্রীসভার আলোচনায় তিনি কিছুতেই মন দিতে পারছিলেন না।
এমন সময় পুলিশ কমিশনর সুমিরাত সেই ঘরে ঢুকে সুকর্ণের হাতে একটা কাগজ দিলেন। কাগজটা পড়েই সুকর্ণ থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। তারপর কাউকে কোন কথা না বলেই সেই কাগজটা ফেলে দিয়ে তিনি হন্তদন্ত হয়ে সেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। সকলেই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। সুবন্দ্রিয়ো আর চইরুল সালেও আর সেখানে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন না। সুকর্ণের পিছন পিছন তাঁরা দুজনেও ছুটলেন।
সুকর্ণ দৌড়ে এসে সোজা প্রাসাদের বাগানে রাখা হেলিকপ্টারে উঠে পড়লেন। সুবন্দ্রিয়ো আর চইরুল সালেও সুকর্ণের সঙ্গ ছাড়লেন না। মেরডেকা প্রাসাদ থেকে পালিয়ে তাঁরা সোজা এসে উঠলেন বোগোর প্রাসাদে।
উপস্থিত মন্ত্রীরা একটু পরেই সুকর্ণের এই ভীতির কারণ বুঝতে পারলেন। পুলিশ কমিশনর যে কাগজটা সুকর্ণের হাতে দিয়েছিলেন, তাতে লেখা ছিল : সুহারতোর সেনাবাহিনী প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে। সেই রাতেই সুহারতো জেনারেল আমির মাহমুদ, জেনারেল বাসুকী রহমৎ ও জেনারেল আণ্ডি মহম্মদ ইয়ুসুফকে পাঠালেন বোগোর প্রাসাদে। তাঁরা একটি লিখিত হুকুমনামা নিয়ে গেলেন সুকর্ণের স্বাক্ষরের জন্য। এই হুকুমনামায় দেশের সমস্ত শাসনক্ষমতা সুহারতোর হাতে সমর্পণ করার কথা ছিল। সার্ধো এধির প্যারা-কম্যাণ্ডো বাহিনী বোগোর প্রাসাদে ট্যাঙ্ক, কামান, মর্টার নিয়ে প্রস্তুত ছিল। তাই সুকর্ণ বুঝতে পারলেন যে সেই হুকুমনামা সই না করলে কি ফল হবে! দ্বিরুক্তি না করে সেই হুকুমনামায় স্বাক্ষর করে তিনি সেনাপতিদের হাতে তুলে দিলেন।
সেই রাত্রেই হঠাৎ রেডিও-মারফৎ সুহারতো ঘোষণা করলেন যে

প্রেসিডেন্টের আদেশমতো প্রেসিডেন্টের পরিবর্তে তিনিই দেশের শাসনভার গ্রহণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পি. কে. আই এবং দেশের অন্যান্য কমিউনিস্ট সংস্থাগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করলেন। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল উন্টুঙ্গ এবং নয়নোর প্রাণদণ্ডাজ্ঞার বিচার-পত্রে স্বাক্ষর করেও তিনি কারাগারে পাঠালেন। সম্পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করে সুহারতো আর এক মুহূর্ত দেরী করলেন না।

১৮ই মার্চ তিনি মন্ত্রীসভার পনের জন মন্ত্রীকে গেস্টাপু বিদ্রোহে অংশ-গ্রহণের অপরাধে গ্রেপ্তার করলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন—সুবন্দ্রিয়ো, ওমর দানি, চইরুল সালে, সুমারজো, মেজর জেনারেল আহমদী, কর্ণেল ইমাম শাফি এবং মেজর জেনারেল সুমারনো।

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের অবস্থাও বন্দীর মতো। সুহারতোর অধীনস্থ সামরিকবাহিনী এখন তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করল। তাঁর হেলিকপ্টার চালানোর ভার পড়ল বিমানবাহিনীর ওপর। কিন্তু তবু প্রত্যেকে সুকর্ণকে প্রেসিডেন্টের যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করত।

রাজ্য-চালনার জন্য মন্ত্রী দরকার। সুহারতো নসুশানকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু নসুশান মেয়ের মৃত্যুর পর থেকে কোন কাজ করতেই স্বীকৃত হচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত সকলে মিলে পরামর্শ করে স্থির হল যে সুহারতো, জোগিয়াকর্তার সুলতান এবং আদম মালিক তিন প্রধান মন্ত্রী হবেন। সুহারতো দেখবেন প্রতিরক্ষা, সুলতান দেখবেন অর্থ এবং মালিক দেখবেন পররাষ্ট্র। প্রত্যেক মন্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য প্রতি দপ্তরে ন'জন করে উপমন্ত্রী থাকবেন।

মন্ত্রীর তালিকা নিয়ে সুহারতো, সুলতান এবং মালিক বোগোর প্রাসাদে সুকর্ণের সঙ্গে দেখা করলেন। তালিকা দেখে সুকর্ণ প্রশ্ন করলেন—কি করতে হবে?

সুহারতো বিনীতভাবে উত্তর দিলেন—এখনি আপনি সই করে দিলে ভাল হয়।

সুকর্ণ একবার সুহারতোর মুখের দিকে তাকালেন, তারপর সেই তালিকায় স্বাক্ষর করে দিলেন।
ছাত্রদল আবার মিছিল করে পথে নামল। এবার আর বিক্ষোভ নয়, এবার আনন্দ-উৎসব। তাদের আন্দোলনের ফল ফলেছে। আবার তাদের স্লোগানে স্লোগানে সারা পথ মুখরিত হয়ে উঠল :

হিদুপ সুহারতো।
হিদুপ আবরি॥

২৬

রাত্রির অন্ধকার কাটতে শুরু করল।

আকাশ নির্মেঘ, গাঢ় নীল। মশল্লা দ্বীপের প্রত্যূষ এক অবর্ণনীয় শোভা চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। করিমাতা প্রণালীর গভীর সবুজ জল ছোট ছোট ঢেউ তুলে খেলে যাচ্ছে। দূরে, অনেকদূরে ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে ছড়ানো ছিটোনো গভীর অরণ্যময় কয়েকটি দ্বীপ, তারই মাঝে 'রাইফ্‌ল্‌ম্যান রক'কে স্পষ্ট খুঁজে পাওয়া যায়।

কাল সন্ধ্যারাত্রের ভয়ঙ্কর টাইফুনের এখন চিহ্নমাত্র নেই। সেই প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস কোথায় হারিয়ে গেছে, যেন কোনকালেই তা ছিল না। সমুদ্রের সেই দৈত্যের মতো উঁচু আর পরাক্রান্ত ঢেউ এখন স্বপ্নের মতো। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তা আর স্বপ্ন ছিল না। তখন সেই ঢেউ-এর সঙ্গে প্রত্যেককে তীব্র সংগ্রাম করতে হয়েছে, প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে। এই টাইফুনের আভাস আগে থেকে জানতে পারলে আর এই জীবন-মরণ সংগ্রামে আমাদের নামতে হত না, ঝড় শুধু কেটে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করলেই চলত ; কিন্তু ঝড় যখন এল তখন আমাদের এই 'প্রাহু' সমুদ্রের মধ্যে অনেকখানি এসে পড়েছে। সেই ঝড়ের মুখে হাল শক্ত করে ধরে ঢেউ বাঁচিয়ে আবার ডাঙ্গায় ফিরে আসার সেই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা কিন্তু আমাদের কাছে তখন স্বপ্ন বলে মনে হয় নি। আবু আদিল আর সুমাত্রোকে দেখেছি শক্ত হাতে হাল ধরে বসে থাকার চেষ্টা করতে, ঝড়ের প্রবল দাপটে মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে যে আর তারা হয়তো হাল ধরে বসে থাকতে পারবে না—ঝড়ের মুখে উড়ে সমুদ্রে পড়ে

যাবে। ঝড়ের ঝাপটা আমাদের ওপর দিয়েও গিয়েছে। আমরা নিজেদের 'প্রাহু'র সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রেখে কোনরকমে সেই বিপদের সঙ্গে লড়াই করেছি। ক্যাপ্টেন রুসলন, তান কু, লিন উ তাঙ, এমন কি সরজোনো, মাতাদিন আর ইয়ুসুফ পর্যন্ত দাঁড় ধরে কোন রকমে সেই মৃত্যুর মুখ থেকে সকলকে ফিরিয়ে এনেছে। এ রকম ঝড় আমি আর জীবনে কোনদিন দেখি নি। ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। আর কারুর কথা জানি না, আমি কিন্তু সেই প্রাহুর মধ্যে বসে থরথর করে কেঁপেছি।

নির্বিষ সাপের মতো চুপ করে সরজোনো আবার আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিল। ভুল পথে যে সে নিয়ে এসেছিল, তা স্পষ্ট বোঝা গেল; কেন না আবার সে পিছু পথ ধরল। যে পথ দিয়ে আমরা এসেছিলাম সেই পথেই আবার ফিরতে হল। তাদের কোমরে দড়ি বেঁধে আদিল তাদের নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, আমরা একটু তফাতে—পিছনে। সুমাত্রো এখনও আমাদের দলপতি, কিন্তু ক্যাপ্টেন রুসলন তাঁর 'কারবাইন' বন্দুক হাতে নিয়ে সকলকে আদেশ দিচ্ছিলেন। বন ভেঙে আমাদের এখন যেতে হবে করিমাতার সমুদ্র উপকূলে। সেখান থেকে একটা নৌকো সংগ্রহ করে করিমাতা প্রণালী পার হয়ে রিও দ্বীপে। রিও দ্বীপ থেকে ক্যাপ্টেন বিদায় নেবেন, আর আমরা রিও দ্বীপের উত্তর-পূর্ব উপকূল থেকে পাড়ি দেব সিঙ্গাপুরে। সেখান থেকে অনেক স্টীমার আর লঞ্চ পাওয়া যায়। পথ বিপদহীন। কিন্তু বিপদের পথ হয়েছে করিমাতা প্রণালী। এ পথে জাহাজ বা স্টীমার চলাচল নেই, পাহারার কোন ব্যবস্থা নেই। দুর্বৃত্তদের লীলাভূমি এই প্রণালী। অথচ এই প্রণালী পার হতেই হবে।

যারা যারাই ইন্দোনেশিয়া থেকে বাইরে পালাবার চেষ্টা করেছে,

তাদের যেতে হয়েছে এই পথে। কত দল পার হতে পেরেছে, কত দল সর্বস্বান্ত হয়েছে, কত দল দুর্বৃত্তদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে—তার কোন হিসাব নেই। অথচ গোপনে পালাতে গেলে এই পথ ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই।

বেশ মনে আছে, ক্যাপ্টেন রুসলনের সঙ্গে সুমাত্রোর এই ব্যাপার নিয়ে কথাও হয়েছিল।

রুসলন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—সুমাত্রো, আপনি তো বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সব জেনে শুনে আপনি সরজোনোর ভরসায় এত লোক নিয়ে পালানোর ব্যবস্থা করেছিলেন কেন ?

তাছাড়া আর উপায় কি ?—উত্তর দিয়েছিল সুমাত্রো।—আমার আর সিণ্টার এখনো পালানোর প্রয়োজন নেই। সেনও জাকর্তায় তখন বিপন্মুক্ত ছিল ; কিন্তু অন্যান্য চীনাদের তখন সে অবস্থা ছিল না। তারা আমাদের বাড়িতে বসে ভয়েই আধমরা হয়ে গিয়েছিল। আর বেশিদিন যদি আমরা তাদের আমাদের বাড়িতে রাখার চেষ্টা করতাম, হয়তো কেউ কেউ আমাদের সন্দেহও করত এবং তারপর একদিন নিজেরাই পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে মারা পড়ত। সেইজন্যই তাদের নিয়ে আসা এবং দলটাও একটু ভারী করা। সরজোনোকে আমরা বিশ্বাস করি নি কোনদিন। আমাদের নিয়ে গিয়ে বিপদে ফেললে ওদের আগে মেরে তারপর আমরা মরতাম।

অবশ্য আপনারা না এলে আমার পক্ষে ওই বনের মধ্যে পথ খুঁজে বার করা কঠিন হত—উত্তর দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন।—তবুও আমি বলব, আপনারা অত্যন্ত বেশি বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। সরজোনো বিশ্বাসঘাতকতা না-ও করে যদি করিমাতায় নিয়ে আসত, সেখান থেকে সমুদ্র পার হওয়ার সময় নিশ্চয়ই জলদস্যুর হাতে আপনাদের প্রাণ দিতে হত।

সুমাত্রো হেসে বলেছিল—ক্যাপ্টেন, আপনি একটা ব্যাপার জানতেন

না। আমার বরাবর এই কথাটা মনে ছিল যে সরজোনো হয়েছে আমাদের আগেকার এক বন্ধু এবং বর্তমানে এক দস্যু হরাতোনোর চ্যালা। সে বনের মধ্যে আমাদের কিছু করবে না, সমুদ্রের ধারে নিয়ে গিয়ে তার গুরু হরাতোনোর হাতে আমাদের সঁপে দেবে।

কথার মাঝে আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম—তবে সরজোনো আমাদের ভুল পথে নিয়ে গিয়েছিল কেন?

সুমাত্রো উত্তর দিয়েছিল—দুটি কারণ হতে পারে। এক হয়েছে যে সরজোনো হয়তো পথ ঠিক করতে পারে নি। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে যে এবং সেইটাই সঙ্গত কারণ—সে আমাদের গভীর বনে নিয়ে ফেলে অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করে, হত্যা করে সব কিছু লুট-পাট করে নিয়ে চলে যেত। সে হয়তো হরাতোনোকে লাভের বেশি অংশ দিতে চায় নি।

কি সর্বনাশ—বলেছিলাম আমি।—এখনই বা আমরা ওকে বিশ্বাস করছি কি করে?

সুমাত্রো হেসে উত্তর দিয়েছিল—কে ওদের বিশ্বাস করছে? আমি তো নয়ই। আমি ঠিক জানি যে সরজোনো এখন তার দ্বিতীয় মতলব ত্যাগ করে প্রথম মতলবই ধরেছে, অর্থাৎ এবারে সে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে ঠিক হরাতোনোর হাতে আমাদের সঁপে দেবে।

সব জেনে শুনেও সুমাত্রোর এই নিশ্চিন্ততায় আমি চুপ করে গেলাম। কিম ভয় পেয়ে বলে উঠেছিলেন—তবে কি হবে?

ভেবে আর কি করবেন?—উত্তর দিয়েছিল সুমাত্রো—সমুদ্রের ধারে আমাদের যাওয়া চাই। সেখান থেকে রিও দ্বীপেও যাওয়া চাই। আমি সে পথ জানি না—সরজোনো জানে। এখন এ সব ভেবে মন খারাপ করে কি লাভ, কিম? তার চেয়ে মনের আনন্দে চলুন। এখন আমাদের দল তো আরও ভারী হয়েছে। হরাতোনোর সঙ্গে না লড়াই

করে আমরা কিছুতেই ধরা দিচ্ছি না। তার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়ে এসেছি।

যেতে যেতে সমুদ্র উপকূলের কাছে আসামাত্রই সুমাত্রো আর সরজোনোর পথ-নির্দেশ মেনে নেয় নি। একটা গ্রাম থেকে একটা 'প্রাহু' ভাড়া করে তাতে চেপে আমরা নদী বেয়ে সমুদ্রে এসে পড়েছি এবং সমুদ্রের তীর ঘেঁষে এসেছি করিমাতায়।

এ ব্যবস্থায় সরজোনোর ঘোরতর আপত্তি ছিল। সে জানিয়েছিল যে সমুদ্রের পথ আর তার জানা নেই। সমুদ্র-পথে না গিয়ে স্থলপথেই যাওয়া উচিত, কিন্তু সুমাত্রো তার কথা শোনে নি। আমাদের সকলেরই মনে মনে একটা ভয় ছিল—সুদীপোর কথা আমরা ভেবেছি। সুদীপোর পালিয়ে যাওয়ার গূঢ় কারণ আমরা জানি। হয়তো সরজোনো বুঝতে পেরেছিল যে আমরা সকলে মিলে যেভাবে তাদের কড়া পাহারায় রেখে চলেছি তাতে তাদের চারজনের পক্ষে আমাদের ক্ষতি করা সম্ভব হবে না। তাই সে সুদীপোকে পালিয়ে যেতে আদেশ দেয় যাতে হরাতোনো তৈরি থাকে। সুদীপো যদি হরাতোনোকে খবর দিয়ে থাকে তো সে নিশ্চয়ই আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাই সুমাত্রো করিমাতার কাছাকাছি এসে আর সরজোনোর পাল্লায় পড়তে চায় নি।

সন্ধ্যার অন্ধকারে কিন্তু মাঝিরা আর সমুদ্র পাড়ি দিতে চায় নি। তাদের ভয় স্বাভাবিক। অন্ধকারে সামান্য একটা প্রাহুতে করে সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার বিপদ অনেক। অথচ অন্ধকার ছাড়া আমাদের যাবারও উপায় নেই। দিনের আলোয় শত্রুদের কাছে আমরা স্পষ্ট ধরা পড়ে যাব, রাতের অন্ধকারে দূর থেকে আমাদের দেখতে পাওয়া কঠিন। মাঝিমাল্লাদের যখন কিছুতেই রাজি করানো গেল না তখন গাঁয়ের

জোরেই নৌকো দখল করতে হয়েছিল আমাদের। মাঝিদের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নৌকো ফেরৎ দেওয়ার ভরসা দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই এসে পড়েছিল টাইফুন।

সেই প্রলয়ঙ্কর সামুদ্রিক ঝড়ের হাত থেকে আমরা আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলাম। তীরের কাছাকাছি এসে পড়লে দৈত্যাকার ঢেউ আমাদের নৌকো সমেত একেবারে মাটিতে আছড়িয়ে ফেলে ভেঙে চুরে দিয়ে যেত। কিন্তু সুমাত্রো আর আবু তীরের কাছাকাছি এসে আবার মাঝ সমুদ্রের দিকে মুখ ঘুরিয়ে পাড়ি দেবার চেষ্টা করেছিল বলে আমরা বেঁচে গিয়েছিলাম।

ঘণ্টাখানেক বাদে টাইফুন থেমে গিয়েছিল, কিন্তু জোর বাতাস কমে নি। সমুদ্রের জলও ফেঁপে উঠেছিল। আমাদের লক্ষ্যস্থান থেকে ঝড়ের তোড়ে অনেক দূরে এসে পড়েছিলাম। সেই দূর সমুদ্র-পথ ভেঙে আবার আমাদের যাত্রা।

এই সুন্দর প্রত্যূষ আমি চোখ মেলে প্রাণ দিয়ে উপভোগ করার চেষ্টা করছিলাম। আলো ফুটলে যে শত্রুদের সহজ শিকার আমরা হতে পারি, এ কথাটা আমার একবারও মনে হয় নি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পূব আকাশের হালকা রঙের আলপনা মুছে গেল, একবার সাদা হয়ে উঠল আকাশটা—তারপর শুধু গাঢ় নীল। হঠাৎ আকাশে প্রকাণ্ড এক থালার মতো টকটকে লাল সূর্য সমুদ্রের মাঝখান থেকে যেন লাফিয়ে উঠল। আমাদের নৌকো আর সূর্যের মাঝের সুদূরপ্রসারী সমুদ্রে তখন শুধু লাল রঙের ফোয়ারা খেলে যাচ্ছে। সেই ছোট ছোট লাল ঢেউ ভেঙে আমাদের নৌকো আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে।

সমুদ্রের ওপরে সূর্য যেন একেবারে মই নিয়ে আকাশে উঠে পড়ে।

একটু আগেই ছিল দিগন্তে, এখন আকাশের অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। সাড়ে সাতটা নাগাদ বেশ চড়চড়ে রোদ, বাইরে বসে থাকতেও কষ্ট হয়। তবে কালকের রাত্রির ঝড়বৃষ্টির জল এই রৌদ্দুরে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যেতে লাগল। কাল রাতের ঝড়ঝাপটার হাত থেকে এখনও পর্যন্ত কেউ সহজ হয়ে উঠতে পারে নি। সকলেই কাঠের ছই-এর ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে চুপ করে বসে আছে।

সারা দুপুর একরকম নির্ঝঞ্ঝাটে কেটে গেছে। একটা মোটর লঞ্চ একবার দূর দিয়ে চলে যেতে যেতে কিছুক্ষণের জন্য থেমেছিল; কিন্তু আমাদের কাছ থেকে কোনরকম সাড়া না পেয়ে আবার চলে গেছে। বিকেলের দিকে আমরা মিলো পোলু পার হয়ে গেছি। সারারাত চলতে পারলে আমরা হয়তো পরদিন সকালে রিও দ্বীপে এসে পৌঁছোতে পারব।

সন্ধ্যার পরেই কিন্তু আমরা প্রথম বিপদের সঙ্কেত দেখতে পেলাম। দূরে আবার একটা মোটর লঞ্চ দেখা গেল। খুব ধীরগতিতে সেটি চলেছে। আসছিল রিও দ্বীপের কাছ থেকে, চারদিকে সার্চ-লাইট ফেলছে--যেন কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার সার্চ-লাইটের বাইরে আমরা, সেইজন্য তারা আমাদের তখনও দেখতে পায় নি, কিন্তু আমরা তার আলোয় তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

তার গতিটাই কেমন যেন সন্দেহজনক। সুমাত্রো, আদিল আর ক্যাপ্টেন রুসলন সেই লঞ্চের দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে চাপাস্বরে কথা বলতে লাগলেন। তাদের কথাবার্তা শুনে সরজোনোকে আমি বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখলাম। সে-ও মাতাদিন আর ইয়ুসুফকে ফিস্‌ফিস্‌ করে কি যেন বলতে লাগল।

লঞ্চটি ধীরগতিতে এগিয়ে আসতে লাগল। এবার সুমাত্রো সকলকে দাঁড় তুলে নিতে বলল। সরজোনা, মাতাদিন আর ইয়ুসুফের হাতের বাঁধনও খুলে দেওয়া হল। সকলে মিলে জোরে জোরে দাঁড় টানতে

লাগল, হাল ধরল সুমাত্রো। লঞ্চ আমাদের দেখতে পাওয়ার আগেই কাছের ছোট্ট দ্বীপটার আড়ালে আমরা চলে যেতে চাই।

কিন্তু লঞ্চটি আমাদের দেখে ফেলল ঠিকই। ভোঁ ভোঁ করে দু'বার ডাক ছাড়ল। লঞ্চের ডেকে তখন অনেক লোকের ভিড়। তার সার্চ-লাইটের আলোর শেষপ্রান্তে আমাদের নৌকো। সেই আলোর বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু লঞ্চ আমাদের দেখতে পেয়ে তীব্রগতিতে ছুটে আসছিল। সেই আলোয় দূর থেকে আমরা তাদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

হঠাৎ সরজোনোরা তিনজন প্রাণপণে চীৎকার করে উঠল—রাতোনো —ও—ও—

ক্যাপ্টেন রুসলন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দাঁড় তুলে সরজোনোর মাথায় সজোরে এক ঘা মারলেন। সরজোনো নৌকোর ওপরে লুটিয়ে পড়ল। মাতাদিন আর ইয়ুসুফ তাদের দাঁড় নিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিম আদিলের বন্দুকটা তুলে নিয়ে তাদের লক্ষ্য করে দাঁড়ালেন।

রুসলন আমাকে বললেন—সেন, আপনি সরজোনোর দাঁড়টা ধরুন।

আমি, সিণ্টা আর লোহারু তিনজনে সরজোনো, মাতাদিন আর ইয়ুসুফের জায়গায় দাঁড় নিয়ে বসে পড়লাম। ততক্ষণে দ্বীপটার অনেক কাছাকাছি আমরা এসে পড়েছি। একটা বাঁক ফিরতে পারলেই আমরা সার্চলাইটের বাইরে চলে যাব।

সঙ্গে সঙ্গে লঞ্চ থেকে বন্দুক গর্জে উঠল। একটা গুলি আমাদের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। আর একটা এসে লাগল সুমাত্রোর বাঁ কাঁধে। একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল সে। ক্যাপ্টেন রুসলন উঠে তার সাহায্যে যাওয়ার চেষ্টা করতেই সুমাত্রো বলে উঠল—ঠিক আছে ক্যাপ্টেন, আপনি দাঁড় বেয়ে যান।

তখন আর ভাববার সময় ছিল না। আমাদের গতি একটু শিথিল হলে

গুলির ঘায়ে আরো অনেকে আহত হতে পারে। আমরা প্রাণপণে দাঁড় বেয়ে যেতে লাগলাম।

দ্বীপের বাঁকটা কাটিয়ে একটু দূর এগিয়ে যাওয়ামাত্র একটা খাঁড়ি মতন দেখে সুমাত্রো নৌকোটাকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েই বলে উঠল— সকলে তাড়াতাড়ি নেমে ছুটে চল।

সরজোনাকে সেখানে ফেলে যেতে হল। তাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো সময় নেই। সকলেই নিজের নিজের জিনিসপত্র নিয়ে ছুটে দ্বীপে উঠলাম। তারপর গাছপালা ভেঙে একটা একটু বড় রকমের গর্ত দেখে তার মধ্যে আমরা আশ্রয় নিলাম।

এটিকে দ্বীপ ঠিক বলা যায় না। এত ছোট দ্বীপ আমি কোনদিন দেখি নি। দু'শ আড়াইশ' গজ লম্বা, একশ' দেড়শ' গজ চওড়া। আমরা যে খাঁড়ির ভিতর দিয়ে ঢুকেছি সেটি সমুদ্রেরই কীর্তি। দ্বীপটাকে যেন মাঝামাঝি কেটে দিয়ে গেছে।

গর্তটার মধ্যে আশ্রয় নেওয়ার পর এবারে আমরা সুমাত্রোর দিকে তাকালাম। বাঁদিকের পিঠটা রক্তে একেবারে ভিজে গিয়েছে। বেশ অবসন্ন হয়ে পড়েছে সে।

রুসলন জিজ্ঞাসা করলেন—খুব কষ্ট হচ্ছে কি ?

সুমাত্রো উত্তর দিল—না, গুলিটা ভিতরে রয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন, এবারে দলের নেতৃত্ব আপনাকে নিতে হবে। আমি আর পারছি না।

রুসলন বললেন—যতক্ষণ আপনি আছেন ততক্ষণ নয়। আপনি বসে থেকে আদেশ দিয়ে যান।

সিন্টা সুমাত্রোর কাছে গিয়ে বসল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে নিজের সারঙ ছিঁড়ে একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বাঁ হাতটাকে সুমাত্রোর গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে দিল।

লঞ্চটা দ্বীপের কাছে এসে এদিক ওদিক আলো ফেলে দেখছে তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছিল।

মাতাদিন হঠাৎ বলে উঠল—সুমাত্রো, আমাদের একটা কথা আছে।
সুমাত্রো কড়াভাবে জবাব দিল—এখন কোন কথা নয়।
মাতাদিন তবু থামল না। বলে চলল—আমাদের দুজনকে ছেড়ে দিলে আমরা চলে যাব, হরাতোনোর সঙ্গে—
সুমাত্রো চাপা গলায় হাঁক দিল—আবু!
সঙ্গে সঙ্গে আবু সজোরে এক চড় কষিয়ে দিল মাতাদিনের গালে।
অনেকক্ষণ চুপচাপ। লঞ্চের একটা শব্দ শোনা গেল, তারপর তার সার্চলাইটটা ঘুরে বিপরীত দিকে পড়ল। একটু পরে সব অন্ধকার। লঞ্চের শব্দও আর শোনা গেল না।
রুসলন বললেন—লঞ্চ চলে যায় নি নিশ্চয়ই। ইঞ্জিন বন্ধ করে স্রোতে ভেসে হয়তো আমাদের খুঁজে দেখবার চেষ্টা করছে। কোন্‌দিকে গেল বুঝতে পারলে হত। একটু দূরে গেলে আমরা নৌকো নিয়ে পালিয়ে যেতে পারতাম।
সুমাত্রো বলল—হ্যাঁ, এখানে লুকিয়ে থাকবার জায়গা কোথায়? ওরা দ্বীপে একবার নামতে পারলে আমাদের বাঁচবার আশা খুব কম।
সিন্টা প্রশ্ন করল—তবে ওরা নামছে না কেন?
সুমাত্রো উত্তর দিল—হয়তো ওরা বুঝে উঠতে পারছে না যে আমরা চলে গিয়েছি না এই দ্বীপেই আছি। যতক্ষণ না ওরা নিঃসন্দেহ হতে পারছে ততক্ষণ নামতে সাহস করছে না।
হঠাৎ আবার সার্চলাইট জ্বলে উঠল, এবার অনেক কাছে। আলোটা আমাদের আশ্রয়ের ওপর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। আমরা সকলে গর্তের মধ্যে নীচু হয়ে মাথা গুঁজে পড়ে রইলাম। আলোটা আবার সরে গিয়ে সমস্ত দ্বীপটাকে তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াতে লাগল। আবার আলোটা ফিরে আসতে লাগল।
সুমাত্রো বলল—ক্যাপ্টেন!
রুসলন বলে উঠলেন—ঠিক আছে।

"কারবাইন'টা হাতে তুলে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তিনি একটা গুলি ছুঁড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে আলোটা নিভে গেল। বিনা আয়াসে এরকম লক্ষ্যভেদ এর আগে আমি আর দেখি নি।

আদিল বলল—আলো নিভল বটে, কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম। ওরা স্পষ্ট বুঝতে পারল যে আমরা এই দ্বীপেই আছি, আর কোথায় আছি তা-ও গুলির দিক দেখে বুঝতে পেরে গেছে।

সত্যিই তাই। আদিল একটা গাছের ডালে উঠে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল—লঞ্চ থেকে একটা ছোট নৌকো নামিয়েছে। দুজনে নৌকোয় করে আসছে।

ক্যাপ্টেন রুসলন উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—তান কু, আমার সঙ্গে আসুন তো!

তান কু আর রুসলন গর্ত থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে গর্তের ভিতরে খস্‌খস্ একটা শব্দ এবং কারা যেন গর্ত থেকে ছুটে পালাল। কিন্তু পালাতে পারল না। দম্ দম্ করে দুটো শব্দ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেনের গলা শোনা গেল—আমি জানতাম যে ওরা পালাবার চেষ্টা করবে। যাক্, এখন কিছুক্ষণের জন্য আমরা নিশ্চিন্ত।

মাতাদিন আর ইয়ুসুফ অন্ধকারের সুযোগে পালিয়ে গিয়ে হরাতোনোর দলে ভেড়বার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু রুসলনের সতর্কতার জন্য আর তা সফল হল না।

আদিল গাছের ওপর থেকে লক্ষ্য করতে লাগল। বলতে লাগল—নৌকোটা দ্বীপে এসে লেগেছে। নৌকোটাকে বেঁধে দুটো লোক বন্দুক হাতে এগিয়ে আসছে।...না, আর তাদের দেখা যাচ্ছে না।

একটু পরে রুসলন আর তান কু ফিরে এলেন। বললেন—ওদের ব্যবস্থা করে এসেছি। আদিল, আর নৌকো নামছে কি?

আদিল উত্তর দিল—না। হরাতোনো বোধহয় ওদের সঙ্কেতের অপেক্ষা করছে।

সমস্ত দ্বীপেই এক গভীর নিস্তব্ধতা। প্রতিটি মিনিট এক একটি সুদীর্ঘ যুগের মতো মনে হচ্ছিল। জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে এই সংশয় এই নীরব প্রতীক্ষা আমাদের অধৈর্য করে তুলেছিল। প্রত্যেকেই মনে মনে ছটফট করছিলাম।

হঠাৎ আদিল বলে উঠল—একারে আর দুটো নৌকো নামাচ্ছে। বোধহয় দু'দিকে যাবে—

সুমাত্রো ডাকল—ক্যাপ্টেন!

রুসলন উত্তর দিলেন—বলুন। যতক্ষণ আমার হাতে বন্দুক আছে ততক্ষণ আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

এবার উঠে দাঁড়াল সিণ্টা। বলল—এভাবে আমি নিজেও মরতে চাই না, কাউকে মরতেও দেব না। এর চেয়ে সোজা লড়াই করে মরা ভাল। আমি নিজে একবার চেষ্টা করে দেখি। চেষ্টা করলে আমি হয়তো হরাতোনোকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারব। হরাতোনো আমাকে ফেরাতে পারবে না। আমার কথা শুনবেই—

সুমাত্রো বলে উঠল—সিণ্টা, কোথায় যাচ্ছ?

সিণ্টা উত্তর দিল—হরাতোনোর কাছে।

আমি বললাম—পাগল হলে নাকি?

সিণ্টা হাসল। বলল—সেন! এখানে আর একটু থাকলে পাগল হয়ে যেতাম। আপনার দায়িত্ব ছিল আমার ওপরে, আর সকলের দায়িত্ব নিয়েছিল মাতোরো। সেন, আমি বেঁচে থাকতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আপনি দেশে ফিরে যেতে পারবেন। তার চেষ্টাই করতে যাচ্ছি—

সুমাত্রো বলল—সিণ্টা! সিণ্টা! হরাতোনো তোমাকে খুন করে ফেলবে —সিণ্টা হেসে উঠল—তুমি হরাতোনোকেও চেনো না, আমাকেও চেনো না। হরাতোনো আমাকে কিছু করবে না, যদি কিছু করি তো আমিই করব—

সিণ্টা ঝুঁকে পড়ে একটা ব্যাগ তুলে নিয়েই দৌড়োতে লাগল। রুসলন তার পিছু নিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সুমাত্রো বাধা দিল। বলল,—থাক্, ওকে যেতে দিন। সিণ্টাকে আমরা হারাব, কিন্তু আমরা সকলে হয়তো বেঁচে যাব। ক্যাপ্টেন, আমাকে একটু দাঁড় করিয়ে ধরে থাকুন। আমি একটু দেখতে চাই।

আমরা সকলেই উঠে দাঁড়ালাম। নৌকো দুটো তখনও ছাড়ে নি।

সিণ্টা ছুটতে ছুটতে সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে লাগল—রাতোনো! রাতোনো! আমি সিণ্টা—সিণ্টা—আমি জানি ওরা কোথায়—আমি জানি—আমি যাচ্ছি—

লঞ্চের ডেক ভিড়ে ভরে গেল। হরাতোনোর গলা শোনা গেল—কে? সিণ্টা?

হ্যাঁ রাতোনো—চীৎকার করে জবাব দিল সিণ্টা,—আমি যাচ্ছি—

হরাতোনোর লোকদের ফেলে যাওয়া নৌকোর বাঁধন খুলে সিণ্টা নৌকোটা বেয়ে নিয়ে গেল লঞ্চের কাছে। হরাতোনো হাত বাড়িয়ে সিণ্টাকে লঞ্চের ওপর তুলে নিল। সিণ্টা কি যেন বলতে বলতে হাতের ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে হরাতোনোর সঙ্গে লঞ্চের ভিতরে ঢুকে গেল। আর তাকে দেখা গেল না।

হঠাৎ প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ। প্রায় সত্তর আশি ফুট দূর থেকেও সেই বিস্ফোরণের শব্দে আমাদের কানে যেন তালা লেগে গেল। পর মুহূর্তে লঞ্চের ভিতরে একটা কালো ধোঁয়ার পাহাড় ভেঙে পড়ল এবং একটু পরেই লেলিহান শিখা আকাশের দিকে ফুঁসে উঠতে লাগল।

এই আকস্মিক বিস্ফোরণে আমরা হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। শুধু সুমাত্রোর ভাঙা গলায় অস্ফুট কথা শুনতে পেলাম—সিণ্টা, লক্ষ্মী বোন আমার—

আমরা ফিরে তাকালাম সুমাত্রোর দিকে। সেই অন্ধকারের মধ্যেও সুমাত্রোর চোখের জল হীরের মত জ্বল্‌জ্বল্ করছিল।

আমি প্রশ্ন করলাম—মাতোরো, তবে কি সিণ্টা—

হ্যাঁ,—সুমাত্রো উত্তর দিল—নিজের প্রাণ দিয়ে আমাদের সকলকে বাঁচিয়েছে। আমার ব্যাগে কিছু বোমা ছিল, আমার ব্যাগটাই ও যাবার সময় নিয়ে গিয়েছিল—

মেয়েরা সকলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আমি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত লঞ্চটিকে দেখতে লাগলাম। আমার কানের কাছে বাজতে লাগল সিণ্টার ভাসা ভাসা কথা—আপনাদের দেশে আমার যেতে বড় ইচ্ছা করে সেন। আপনার সঙ্গে আমার যেতে ইচ্ছা করে।···এখানে আমি আপনাকে কি দিয়ে ধরে রাখব ?···আমি কথা দিচ্ছি, আমি বেঁচে থাকতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না।···দেবতার সামনে কি প্রার্থনা করলেন বলুন তো ? আমি—আমার প্রার্থনার কথা কাউকে বলতে পারব না···

মনে পড়তে লাগল সিণ্টার সঙ্গে সিগলাপ সমুদ্রতীরে আর তাঞ্জঙ প্রিয়কের সমুদ্রবেলায় কাটানো দুটি রাত্রির কথা। তার চোখে মুখে কিসের প্রত্যাশা—তা আমি জানতে পেরেছিলাম, তার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার কথাও আমার অজানা ছিল না। আমি জানতাম যে আমি তার যোগ্য নই। সিণ্টা যে কত বড়, তার কাছে আমি কত—কত ছোট।

এখন সামনে আমাদের অবারিত নীল সমুদ্র। এই সমুদ্র দিয়ে দেশে ফিরে যাওয়ায় আমার আর কোন বাধা নেই। এই সমুদ্র ভেঙে লবঙ্গ বন, দারুচিনি দ্বীপ পিছনে রেখে সহজেই ফিরে যেতে পারব দেশে। লবঙ্গ বনের ঝড় আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তার ঝাপটা আমার বুকে এসে লেগেছে। এ ঝড় থেমে যাবে, আবার মশলার সুরভিতে ইন্দোনেশিয়া মৌ মৌ করে উঠবে। পুরাতন অনেকেই সেই সুরভিতে আবার সেখানে ফিরে যাবে, নতুন অনেকে ভিড় করবে। কিন্তু আমি আর কোনদিন—কোনদিন ফিরে যেতে পারব না।

অথচ আমার হৃদয় রেখে এসেছি এই লবঙ্গ বনে।

পরিশিষ্ট

ইন্দোনেশিয়ার একটি রক্তক্ষয়ী যুগের অবসান ঘটল। এই দিন 'পেমিম্পিন বেসর রেভোলুসি' বা আন্দোলনের মহান্ নেতা স্নুকর্ণ মারা গেলেন।

এখন আর তিনি প্রেসিডেন্ট ন'ন, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। ১৯৬৬ সনের ২৫শে মার্চ জেনারেল স্নুহারতো স্নুকর্ণের আজীবন প্রেসিডেন্টের পদ নাকচ করে দিয়েছিলেন। গেস্টাপু বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত বলে দেশের জনসাধারণ তাঁর বিচারের দাবীও করেছিল। কিন্তু স্নুহারতো ১৯৬৮ সনে তাঁকে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে অপসারিত করেন শুধু, আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে দেন নি।

মৃত্যুর পর কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষ স্নুকর্ণকে বীরশ্রেষ্ঠের পূর্ণ মর্যাদা প্রদর্শন করেন। তার মধ্যে এতটুকু খাদ ছিল না। যে সামরিক-বাহিনীর তিনি শত্রুতাচরণ করেছিলেন, সেই সামরিকবাহিনী মৃত স্নুকর্ণের প্রতি নীচতা বা অবজ্ঞা প্রকাশ করে নি।

২৫শে মার্চ, ১৯৬৬ আর ২০শে জুন, ১৯৭০—এই চার বছরের মধ্যে অনেক জল ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্র বুকে বয়ে গিয়েছে।

মালয়সিয়ার সঙ্গে কন্‌ফ্রন্টাসি শেষ হয়ে গেছে, শেষ হয়েছে চীনের সঙ্গে আবেগ-বহুল প্রেম। 'কোনেফো' ডাকিনীর মায়া ত্যাগ করে ঘরের ছেলে ইন্দোনেশিয়া আবার রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঘরে ফিরে এসেছে। নতুন আইন করে ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিজম্ এবং মার্ক্স-লেনিনবাদ প্রচার করা বা তার উজ্জীবনের চেষ্টা রহিত করে দেওয়া হয়েছে। গেস্টাপু বিদ্রোহের মাত্র কয়েকদিন আগে স্নুকর্ণ আইদিতকে যে

'মহু পুতেরা' (মহৎ সন্তান) উপাধি ভূষিত করেন, তাও কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

বিদ্রোহীদের বিচার আরম্ভ হলে গেস্টাপু-আন্দোলনের চিত্র আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই বিদ্রোহের সঙ্গে সুকর্ণের সংস্রব প্রকাশ পায় এবং তাঁকে প্রেসিডেণ্ট পদ থেকে অপসারিত করে ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেণ্ট জেনারেল সুহারতোকে অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট থেকে প্রেসিডেণ্ট পদে মনোনীত করে। সুহারতো ইন্দোনেশিয়ার দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের সময় স্থির করেন ১৯৭১ সনে।

গেস্টাপু বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত এবং সেই সম্পর্কে সন্দেহভাজন কোন ব্যক্তিই এই সামরিক শাসনে রেহাই পান নি। কমিউনিস্ট পার্টিকে ইন্দোনেশিয়া থেকে একেবারে নির্মূল করা হয়েছে, কমিউনিস্ট বা তাদের সমর্থক প্রত্যেকেরই বিচারে হয় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত, নয় কারাগারে নিক্ষিপ্ত। এখনও চলেছে কমিউনিস্ট-সমর্থক শিকার।

লুকমানকে জাকর্তার উপকণ্ঠে কেবাজোরানে ১৯৬৬ সনের জুন মাসে খুঁজে পাওয়া যায় এবং কোনরকম জবাব দিতে স্বীকৃত না হওয়াতে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারা হয়। চইরুল সালেকে গ্রেপ্তার করা হয় সেই বছরের ১৫ই মার্চ। ১৯৬৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে কারাগারে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। কাম্বোডিয়া থেকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল জেনারেল ওমর দানিকে। গেস্টাপু বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্য তাঁর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়।

কিন্তু সুবন্দ্রিয়োর গ্রেফতার এবং বিচার জনসাধারণের মধ্যে যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল, তা বলার নয়। সুকর্ণকে বিচার করতে না পারায় সুকর্ণের পরমপ্রিয় সুবন্দ্রিয়োকে বিচার করে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার চেষ্টা করেছিল সামরিক কর্তৃপক্ষ। সুবন্দ্রিয়ো ছিলেন সুকর্ণের শিষ্য, সখা এবং উপদেষ্টা। সুবন্দ্রিয়োকে ছাড়া সুকর্ণের এক মুহূর্তও চলত না। অধিক রাত্রে সুকর্ণের ঘুম না এলে সুকর্ণ ডেকে পাঠাতেন

সুবান্দ্রিয়োকে। তাঁর আত্মকাহিনীতে সুকর্ণ লিখেছেন :

> Sometimes, late at night, I phone Subandrio, and I say, "Bandrio, come and sit with me, keep me company, talk to me of silly things, tell me a joke, say anything as long as it's not political. And if I fall asleep, please forgive me.

সুকর্ণের বহু বিনিদ্র রজনী যিনি সুকর্ণের পাশে বসে থেকে গল্প করে সুকর্ণকে ঘুম পাড়িয়েছেন, সেই সুবান্দ্রিয়োর বিচার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল আলি সইদের নেতৃত্বে গঠিত ন'জনের মিলিটারি ট্রাইবুনালে তিন মাস সাক্ষী, জেরা ও সওয়ালের পর ১৯৬৬ সনের নভেম্বরে শেষ হল। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির মধ্যে ছিল—কমিউনিস্ট বিদ্রোহে যোগদান, বিদ্রোহের পরে দেশের শাসন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার চেষ্টা এবং সরকারের এক কোটি টাকা আত্মসাৎ করা।

অভিযুক্ত অন্যান্য ব্যক্তির মতো তিনি কিন্তু সুকর্ণকে বিদ্রোহের অংশীদার বলে স্বীকার করেন নি। তবে একথা তিনি স্বীকার করেছেন যে সুকর্ণের আদেশমতো সরকারী কাজ পরিচালনার জন্য সব কিছু তিনি করেছেন। ট্রাইবুনাল তাঁর যুক্তি মেনে নেয় নি। বিচারের রায় দিতে গিয়ে লেঃ কর্ণেল আলি সইদ মন্তব্য করেন :

> His actions have marred the Indonesian revolution. The court sees nothing in his favour, no cause for leniency. His testimony was a series of lies.

তারপর টেবিলের ওপর তিনবার হাতুড়ি ঠুকে দণ্ড ঘোষণা করলেন : গুলি করে মৃত্যু।

সুবান্দ্রিয়ো প্রাণদণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্টের কাছে তাঁর আবেদন জানালেন। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ সুবান্দ্রিয়োকে সাহায্য করার জন্য উন্মুখ, কিন্তু তিনি একেবারে নিরুপায়। সুবান্দ্রিয়োর এই আবেদন তিনি

পাঠিয়ে দিলেন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট জেনারেল সুহারতোর কাছে। প্রেসিডেন্টের মুখ চেয়ে সুহারতো সুবন্দ্রিয়োর প্রাণদণ্ড মকুব করলেন, সুবন্দ্রিয়োর হল যাবজ্জীবন কারাবাস।

১৯৬৬ সনেই কিন্তু বিদ্রোহ-সংক্রান্ত বিচারের শেষ হল না। সামরিক কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস যে আরো অনেকে এই বিদ্রোহে জড়িত ছিল, কিন্তু পরবর্তী আচরণে তাদের আর ধরতে পারা যাচ্ছে না। এর একমাত্র উত্তর দিতে পারেন সুকর্ণ নিজে। তাই সমস্ত কথা আদায়ের জন্য সুকর্ণের ওপর চাপ দেওয়া হতে লাগল। বোগোর প্রাসাদের বাইরে যাওয়া সুকর্ণের একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দেওয়া হত ন'মাসে ছ'মাসে একবার। বাইরের কোন লোকের সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দেওয়া হত না।

এতদিনের মধ্যে মাত্র দু'বার তিনি বাইরের লোক দেখতে পেয়েছিলেন। প্রথমবার তাঁর ছোট মেয়ে শুকমাবতীর বিয়ের সময়, ১৯৬৯ সনের নভেম্বরে এবং শেষবার তাঁর ছেলের বিয়ের সময়—১৯৭০ সনের এপ্রিলে। তা-ও তাঁকে ঘিরে রেখেছিল রক্ষীদল, যাতে তিনি কারুর সঙ্গে রাজনীতির আলোচনা না করতে পারেন।

নিয়মিত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত সামরিকবাহিনীর লোক। নানাভাবে তাঁকে জেরা করে যেত। কিন্তু গেস্টাপু-বিদ্রোহের সমস্ত দায়িত্ব তিনি এড়িয়ে যেতেন। কিন্তু মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে।

ছোট মেয়ের বিয়ের রাত্রে সুকর্ণের সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেল। বিয়ের শেষে তিনি যখন বাড়ি ফিরে যাবার জন্য গাড়িতে উঠতে যাবেন তখন উপস্থিত লোকদের দেখে তাঁর বিগত দিনের কথা মনে পড়ে গেল। তাদের দিকে তাকিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর দেহরক্ষীরা বুঝতে

পেরেছিল যে এবার তিনি বক্তৃতা দেবার চেষ্টা করবেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা তাঁকে সকলের সামনে জোর করে ধরে গাড়িতে বসিয়ে দিল। গাড়িতে বসে উপস্থিত লোকদের বিদায় জানানোর জন্য হাত তোলামাত্র একজন দেহরক্ষী থাবড়া মেরে তাঁর হাত নামিয়ে দিল। জনসমক্ষে এই অপমান সুকর্ণের মন একেবারে ভেঙে দিল। আর সামরিক কর্তৃপক্ষের জেরায় তিনি অবিচল থাকতে পারলেন না। তিনি শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলেন যে ১৯৬৫ সনে কয়েকজন সেনাপতি একটি বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করেন। এই বিদ্রোহের কথা ইতিপূর্বে সুকর্ণের পূর্ব-দেহরক্ষী দলের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার মহম্মদ সবুর তাঁর বিচারের সময় উল্লেখ করেছিলেন।

সুকর্ণের স্বীকারোক্তি থেকে জানা গেল গেস্টাপু ষড়যন্ত্রের আদি কথা। পি. কে. আই-এর সঙ্গে সমরবাহিনীর বিরোধ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পি. কে. আই-এর হাতের মুঠোয় চলে গিয়েছিলেন সুকর্ণ। পি. কে. আই-এর পরামর্শমতো চলতে গিয়ে পাশ্চাত্য শক্তির সঙ্গে বিরোধে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি হারিয়েছিলেন, সেই খ্যাতি রক্ষার একমাত্র উপায় ছিল রাশিয়া এবং চীনের সঙ্গে সখ্যতা রেখে। কিন্তু চীন-রুশ বিরোধে পি. কে. আই চীনপন্থী হয়ে যাওয়ায় সুকর্ণকেও বাধ্য হয়ে রাশিয়াকে ত্যাগ করে চীনের ওপর ভরসা রাখতে হয়।

পি. কে. আই তখন সুকর্ণকে হাতের মুঠোয় পেয়ে দাবী জানাল যে নাসাকোম মন্ত্রীসভা থেকে অন্যান্য মন্ত্রীদের সরিয়ে দিয়ে শুধু পি. কে. আই-কে নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করতে হবে। সুকর্ণের প্রথমে সাহস হয় নি, কারণ এই ব্যবস্থা সামরিকবাহিনী মেনে নেবে না। সুতরাং ১৯৬৫ সনের সেপ্টেম্বরের একেবারে গোড়ার দিকে বলীদ্বীপে প্রেসিডেন্টের শৈলাবাস তাম্পকসিরিঙ্গে সুকর্ণ তাঁর অনুগত কয়েকজন সেনাপতিকে আহ্বান করেছিলেন।

পাঁচজন সেনাপতি উপস্থিত হয়েছিলেন : জেনারেল সুদীর্ঘো, জেনারেল

মুরসজিদ, ব্রিগেডিয়ার সুতারদিয়ো, ব্রিগেডিয়ার সুনার্য এবং ব্রিগেডিয়ার সবুর। এইখানেই আলোচনায় স্থির হয় যে সামরিকবাহিনীর নেতৃস্থানীয় সেনাপতিদের বন্দী করে সুকর্ণের অনুগত নেতৃত্বের অধীনে সামরিকবাহিনীকে আনা হবে। পি. কে. আই এই ব্যাপারে সর্বরকম সাহায্য করবে।

পি. কে. আই সুকর্ণের প্রস্তাবে সম্মত হয় কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা ষড়যন্ত্র করে যে সামরিকবাহিনীর আভ্যন্তরীন বিভেদের সুযোগ তারা সম্পূর্ণ গ্রহণ করবে। আইদিত তখন উনটুঙ্গের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করেন এবং ওমর দানিকেও দলে নেন। সুবন্দ্রিয়ো জানতেন শুধু সুকর্ণ পরিচালিত সামরিক অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র এবং তিনিই তার ব্যবস্থা করছিলেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর আইদিত কাউকে কিছু বোঝবার সুযোগ না দিয়েই তাঁর নিজের বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। সুকর্ণপন্থী সেনাপতিরা এই বিদ্রোহের কিছু জানতেন না বলে ব্যাপারটা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত চুপ করে রইলেন। সুকর্ণ এই বিদ্রোহে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। সুবন্দ্রিয়ো সুমাত্রায় থেকে ধরে নিয়েছিলেন যে সুকর্ণপন্থী সেনাপতিরাই বিদ্রোহ করেছেন।

যখন সুকর্ণপন্থী সেনাপতিরা দেখলেন যে আইদিত তাঁর এবং তাঁর দলের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এই বিদ্রোহ করেছেন এবং সেনাপতিদের বন্দী করার পরিবর্তে হত্যা করেছেন, তখন তাঁরা এই বিদ্রোহে যোগ না দিয়ে নসুশান ও সুহারতোর পক্ষে এসে দাঁড়ালেন। আইদিতের বিদ্রোহ একেবারে ব্যর্থ হল।

এই পাঁচজন সেনাপতিকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। সুহারতো-সরকারের সবচেয়ে বড় ভাবনা: ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আর কে কোথায় লুকিয়ে আছে।

লবঙ্গ বনে ঝড় থেমে গেছে।